ম. গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

পৃথিবীর পাঠশালায়

М. Горький

নামে গোর্কির ট্রিলজির তৃতীয় খণ্ড। প্রতিটী খণ্ডই এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী।

'আমি এই মানুষদের জন্য ভয় পাই, এদের জন্য ব্যথিত হয় আমার হৃদয়, এদের জন্য আমি লজ্জা পাই, কিন্তু তবুও এদের চরিত্রগত উৎকর্ষ এবং তার বিজয়ের উপর আমার আস্থা কখনো টলে না। এর কারণ কী? কারণ, এই মানুষদের আমি চিনি, তাদের অনেককে আমি দেখেছি—দেখেছি ভালো ও মন্দদের, দেখেছি হাস্যকর আর দুঃখীদের, দেখেছি অধঃপতিত ও মহানুভবদের—দেখেছি সব রকম সম্ভাব্য অবস্থায়, আনন্দ ও বেদনার মধ্যে। কিন্তু অবশেষে, তাদের কাছ থেকে আমি যা কিছু শিখেছি সেটা আমার হৃদয়ে তাদের প্রতি গভীর ও আন্তরিক সমবেদনা রেখে গেছে।'

এক নবীন সাহিত্যিককে লেখা গোর্কির পত্র থেকে উদ্ধৃত।

'পৃথিবীর পাঠশালায়' বিখ্যাত প্রলেটারীয় লেখক আলেক্সেই মাক্সিমভিচ গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) তাঁর যৌবনের বছরগুলির কথা বর্ণনা করেছেন।

নানা স্থানে ভ্রমণ করার পর ১৬ বছরের বালক আলেক্সেই নিঝ্নি-নভ্গরোদ থেকে কাজানে যান কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সরল ও আগ্রহপূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে। এই কাহিনীতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে—কাজানে আলেক্সেই যে কঠোর 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন' যাপন করেছিলেন, কাজান বস্তির দরিদ্র লোকদের জীবন এবং বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে-সব নতুন মানুষের সঙ্গে এই তরুণ স্বপ্নবিলাসীর সাক্ষাৎ হয়েছিলো তাদের কথা।

'পৃথিবীর পাঠশালায়' (১৯২৩) হোলো 'আমার ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পথে' ও 'পৃথিবীর পাঠশালায়'

সোভিয়েত সাহিত্যের সংগ্রহ

М. Горький

М. ГОРЬКИЙ

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

ম. গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

অনুবাদ: রথীন্দ্র সরকার

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: কোগান

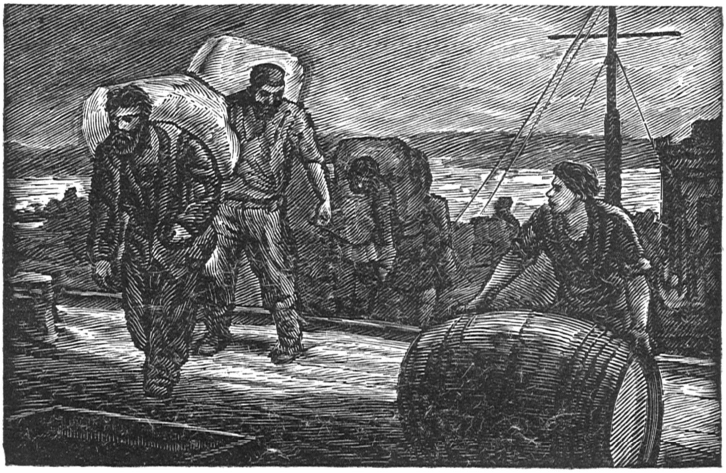

তাহলে আমি কাজান শহরে চলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে— কম কথা নয়!

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকিয়েছিল নিকোলাই ইয়েভরেইনভ নামে ইস্কুলের এক ছাত্র। ইয়েভরেইনভ প্রিয়দর্শন তরুণ, কমনীয় স্বভাব, মেয়েদের মতো কোমল তার চোখদুটো। আমার সঙ্গে একই বাড়ির চিলে-কোঠায় থেকেছে সে। প্রায়ই আমার বগলে এক-আধখানা বই দেখত বলে আমার সম্পর্কে ওর এত আগ্রহ জন্মায় যে শেষ পর্যন্ত আলাপ পরিচয়ও করে নেয়। তারপর দু-দিন না যেতেই সে আমায় উঠে পড়ে বোঝাতে থাকে আমার নাকি 'অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনা' রয়েছে।

সজোর সুললিত ভঙ্গিতে মাথার লম্বা চুলগুলো ঝাঁকনি দিয়ে পিছনে সরিয়ে সে বলত, 'জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবার জন্যই প্রকৃতি তোমায় সৃষ্টি করেছে'।

খরগোশ হিসেবেও কেউ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবা করতে পারে সে বোধ তখনও আমার জন্মায়নি, এদিকে ইয়েভরেইনভ কিন্তু আমায় জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি ঠিক আমার মতো ছেলেদেরই প্রয়োজন। পণ্ডিত মিখাইল লমনোসভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটাও সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরল সে। কাজানে ইয়েভরেইনভের সঙ্গেই আমি থাকব; শরৎ আর শীতের সময়টা ইস্কুলের পাঠ একেবারে সড়গড় করে ফেলব—এই হল তার মত। তারপর 'দু-চারটে' পরীক্ষা দিতে হবে—'দু-চারটে', কথাটা সে ওইভাবেই বলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তখন আমায় বৃত্তি দেবে, আর পাঁচ কি ছ-বছরের মধ্যেই আমি একজন 'বিদ্বান ব্যক্তি' হয়ে যাব। ব্যস্, জলবৎ তরলং। তা হবে না কেন, ইয়েভরেইনভের বয়েস হল উনিশ আর মনটাও দরাজ।

পরীক্ষায় পাশ করে ইয়েভরেইনভ চলে গেল। হপ্তা দুয়েক বাদে আমিও রওনা হলাম।

যাবার সময় দিদিমা বললেন:

'লোকের সঙ্গে রাগারাগি করিস্‌নে। সবসময়ই তো রাগারাগি করিস্। গোঁয়ার হতে চলেছিস্, আর বদমেজাজী। তোর দাদামশাইয়ের গুণগুলোই পেয়েছিস্ কিনা। আর—তোর দাদামশাইকেই দ্যাখ্ না, কী ছিল সে? এত বছর বেঁচে রইল, অথচ কোথায় গিয়ে শেষ হল বেচারি বুড়ো। একটা-কথা কিন্তু মনে রাখিস্: মানুষের পাপপুণ্যির

বিচার ভগবানে করে না। ও হল শয়তানের লীলা। আচ্ছা, আয় তবে…’

তারপর ঝুলে-পড়া কাল্‌চে গালদুটোর ওপর থেকে এক-আধফোঁটা জল মুছে নিয়ে বললেন:

‘আর তো দেখা হবে না। তুই এখন ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকবি, অস্থির মন তোর। আর আমি বসে ওপারের দিন গুণব…’

ইদানীং আমার আদরের দিদিমার কাছ থেকে একটু দূরে-দূরেই থাকতাম। খুব কম দেখা-সাক্ষাৎ হত, কিন্তু এখন যেন হঠাৎ একটা বেদনা অনুভব করলাম এই কথা ভেবে যে আমার এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না।

জাহাজের গলুই থেকে আমি চেয়ে ছিলাম ঘাটসিঁড়ির কিনারায় যেখানে দিদিমা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইদিকে। এক হাতে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, আরেক হাতে তাঁর পুরনো জীর্ণ শালের খুঁটটা দিয়ে গাল আর কালো চোখদুটো মুছে নিচ্ছিলেন তিনি—তাঁর সে চোখজোড়া যেন মানুষের প্রতি অনির্বাণ ভালোবাসায় উজ্জ্বল।

তারপর আমি এলাম এই আধা-তাতার শহরটায়, একটা একতলা বাড়ির ছোট কুঠরিতে। এই ছোট বাড়িটা গরিব পাড়ার সরু গলির শেষপ্রান্তে একটা নিচু টিলার ওপর একলা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির একটা দিকে খোলা জমি পড়ে রয়েছে, ঘন আগাছায় ভরা—এক সময় এখানে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, দৃশ্যটায় তারই সাক্ষ্য। সোমরাজ, আগ্‌রিমনি আর টক-পালঙের নিবিড় জঙ্গলের ভিতর এল্‌ডার-ঝোপে ঘেরা একটা ইটের পোড়োবাড়ি মাথা জাগিয়ে রয়েছে, ভগ্নস্তূপের নিচে একটা খুপরি, তার মধ্যে রাস্তার কুকুরগুলো এসে আড্ডা গাড়ে,

মরে। ওই খুপরিটার কথা আমার বেশ ভালোই মনে আছে: যতো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পাঠ নিয়েছি তার মধ্যে ওই একটা।

মা আর দুই ছেলে নিয়ে ইয়েভরেইনভ পারবার। যৎসামান্য ভাতায় ওরা দিন চালাতো। এ বাড়িতে আসার প্রথম দিন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম ছোটখাটো ক্লান্ত চেহারার বিধবা মানুষটি বাজার থেকে ফিরে কী করুণ অবসাদেই না সওদাগুলো রান্নাঘরের টেবিলের ওপর বিছিয়ে বসতেন আর মাথা ঘামাতেন কঠিন এক সমস্যা নিয়ে: ছোট কয়েক টুকরো রদ্দি মাংস থেকে কেমন করে তিনটি জোয়ান ছেলের উপযুক্ত ভালো খাবার তৈরী করা যেতে পারে—তার নিজের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।

খুব কম কথার মানুষ। খাটিয়ে ঘোড়ার সব শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলে যে বিনীত অথচ নৈরাশ্য-ভরা জিদ তাকে পেয়ে বসে তারই চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে বিধবাটির ধূসর চোখদুটোর মধ্যে। চড়াই পথে গাড়িটা আপ্রাণ টেনে নিয়ে চলে বেচারি ঘোড়া, অথচ জানে কোনোদিনই চূড়োয় গিয়ে সে পৌঁছতে পারবে না, তবু সে বোঝাটা টেনে চলে।

এখানে আসার তিন-চারদিন বাদে একদিন সকালে আমি রান্নাঘরে গিয়ে তাঁকে তরিতরকারি কুটতে সাহায্য করছিলাম। ছেলেরা তখনও ঘুমিয়ে। সাবধানে চাপা গলায় উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন:

'এ শহরে এসেছ কেন?'

'পড়তে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব।'

আস্তে আস্তে তাঁর ভুরুজোড়া উঁচু হয়ে কপালটার ফ্যাকাশে হলদে চামড়াটা কুঁচকে গেল। হাতের ছুরিটা পিছলে যেতেই আঙুলটা গেল কেটে। জখম জায়গাটা চুষতে চুষতে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাফ দিয়ে উঠে বললেন: 'উঃ, হতচ্ছাড়া!…'

রুমাল দিয়ে আঙুলটা বেঁধে নেবার পর তারিফ করে বললেন:

'আলুর খোসা তো বেশ ভালোই ছাড়াতে পারো।'

ও কাজটা ভালো পারতাম বলেই আমার ধারণা! জাহাজের রসুইখানায় কাজ করেছিলাম সে-কথা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। উনি প্রশ্ন করলেন:

'বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পক্ষে ওই জ্ঞানটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করো নাকি?'

সে সময়ে ঠাট্টা-তামাশা বোঝার মতো ক্ষমতা তেমন ছিল না আমার। ওঁর প্রশ্নটাকে আমি বেশ গম্ভীরভাবেই নিয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁকে বোঝালাম কোন্ কোন্ স্তরগুলো পর্যায়ক্রমে পার হবার পর তবে বিদ্যার মন্দিরে আমি প্রবেশাধিকার পাব।

উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন:

'আঃ, নিকোলাই… নিকোলাই!'

ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে হাতমুখ ধুতে ঢুকল নিকোলাই—চোখে তার তখনো ঘুমের ঘোর, চুলগুলো এলোমেলো, আর বরাবরের মতোই খোশমেজাজে আছে।

'মাংসের পিঠে হলে চমৎকার হতো মা,' বলল সে।

'হ্যাঁ, তা হতো।' ওর মা আপত্তি করলেন না।

রন্ধন বিদ্যায় আমার ব্যুৎপত্তি আছে সেটুকু দেখাবার লোভ সামলাতে না পেরে আমি মন্তব্য করলাম, ‘মাংসের পিঠে বানাবার মতো অতো ভালো নয় মাংসটা, তা ছাড়া পরিমাণেও কম হবে’।

কথাটা শুনে ভারভারা ইভানোভ্‌না ভয়ানক চটে গেলেন। এমন কতকগুলো কড়া কড়া কথা আমায় শুনিয়ে দিলেন যে আমার কানদুটো অবধি লাল হয়ে উঠল, যেন খানিকটা লম্বাও হয়ে গেল। গাজরের আঁটিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। চোখ টিপে নিকোলাই আমায় বুঝিয়ে দিল:

‘মেজাজে আছে।…’

বেঞ্চির ওপর আরাম করে বসে এবার সে আমায় শুনিয়ে দিল, মেয়েমানুষগুলো সাধারণত পুরুষের চেয়ে বেশি ভাবপ্রবণ হয়, নারী-চরিত্রই নাকি ওইরকম, একজন নামজাদা বিজ্ঞানী তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন—যদ্দূর আমার মনে পড়ছে সুইজারল্যাণ্ডের লোক তিনি। জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ নামে কোন্‌ এক ইংরেজও নাকি এ বিষয়ে এই রকম মতই প্রকাশ করেছেন।

আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে বড়ো আনন্দ পেত নিকোলাই। সুযোগ পেলেই সে আমার মাথায় এটা-ওটা অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় কিছু ঢুকিয়ে দিতে ছাড়ত না। সে-সব না জানা থাকলে নাকি জীবনই বৃথা হয়ে যাবে। আমি আগ্রহভরে ওর প্রত্যেকটা কথা যেন গিলতাম। তারপর কিছুদিন বাদে আমার মগজের ভেতর ফুকো আর দ্যলা রশেফুকো আর দ্যলা রশেজাকলঁ্যা—সব তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। তখন আর চেষ্টা করেও মনে করতে পারতাম না লাভয়সিয়েরই দুমুরিয়ের মাথা কেটেছিল, না তার উল্টোটা। দিলদরিয়া ছেলেটা

সত্যিসত্যিই স্থির করে রেখেছিল যে সে আমাকে 'কেউকেটা' কিছু বানাবেই। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে প্রতিজ্ঞাও করেছিল, কিন্তু—একে তার সময়ের হল অভাব, তার ওপর নিয়মিতভাবে আমার পড়াশোনায় সাহায্য করার মতো প্রয়োজনীয় অবস্থাও ছিলো না তার। যৌবনের আত্মসর্বস্বতা আর চিন্তাহীনতায় আচ্ছন্ন থাকার দরুণ কোনোদিন সে লক্ষ্য করেও দেখেনি তার মাকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করে, জোড়াতালি দিয়ে সংসারটা চালাতে হয়। আর ওর চেয়েও কম নজর দিতো ওর ছোট ভাইটি। সে ইস্কুলের ছাত্র, অলস, কথাবার্তা বলে কম। কিন্তু আমি তো বহুকাল ধরে রসুইঘরের রসায়ন আর অর্থনীতির জটিল ভোজবাজিতে পাকাপোক্ত, আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম দিনের পর দিন ছেলেপুলেদের দুধের সাধ পিটুলি-গোলা দিয়ে মেটাতে, আর ন্যক্কারজনক চেহারার অতি অভদ্র একটি বাইরের ছোকরার পেট ভরাবার জন্য কী বেপরোয়া পরিশ্রমই না করতে হত মহিলাটিকে। স্বভাবতই, এখানকার অন্নের প্রতিটি গ্রাস আমার বিবেকের ওপর যেন গুরুভার বোঝার মতো চেপে বসত। আমি তাই কাজের চেষ্টায় রইলাম। খুব ভোর থাকতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে-বাইরেই কাটাতাম যতোক্ষণ না ওদের দুপুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হোতো। আর বর্ষা-বাদলার দিনে পোড়ো বাড়ির সেই খুপরিটার মধ্যে ঢুকে সময় কাটিয়ে দিতাম। সেখানে মরা কুকুর আর বেড়ালগুলোর মাঝখানে বসে পচা দুর্গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি আর বাতাসের কান্না শুনতে শুনতে অল্প দিনের মধ্যেই বুঝলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় নেহাৎই এক অলীক স্বপ্ন, বুঝলাম এর চেয়ে বরং পারস্যে পালিয়ে যাওয়া অনেক বুদ্ধির কাজ হত।

তখন আমি কল্পনা করতে শুরু করেছি যে আমি একজন পাকা-দাড়িওয়ালা জাদুকর, ইচ্ছে করলে মন্তর দিয়ে আপেলের মতো বড়ো বড়ো দানাওয়ালা গম আর রাই বানাতে পারি, এমন আলু ফলাতে পারি যার একেকখানার ওজন আঠারো সের করে। তাছাড়া এই পৃথিবীটার আরো কতো যে অসংখ্য উপকার করতে পারি সে আর নাইবা বললাম। এই পৃথিবীতে জীবনটা সত্যিই বড়ো বিশ্রীরকম দুর্বিষহ, দুর্বিষহ শুধু আমার পক্ষে নয়, অনেকের পক্ষেই।

আশ্চর্য সব অসমসাহসিক অভিযান আর তাজ্জব ক্রিয়াকাণ্ডের স্বপ্ন দেখা ইতিমধ্যেই আমার ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল। জীবনের কঠিন দিনগুলোয় এই ছিল আমার মস্তবড়ো আশ্রয়। কারণ এই দিনগুলো সংখ্যায় ছিলো অনেক। এইসব আকাশ-কুসুম রচনায় আমি ক্রমে ক্রমে বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছি তখন। বাইরের সাহায্য আশা করি না। ভাগ্য বা কপালের ফেরের ওপর ভরসা রাখি না। কিন্তু মনের দিক থেকে ক্রমশই অদম্য একটা অনমনীয়তা আমি তখন গড়ে তুলতে শুরু করেছি, জীবন যতোই জটিল হয়ে আসছে নিজেকে ততোই সবলতর, এমন কি বিজ্ঞতরও মনে হচ্ছে। জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই আমার এই বোধ জন্মেছিল যে পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ভেতর দিয়েই মানুষ হয়ে ওঠে।

যাতে উপোস করে না মরতে হয় তাই ভল্‌গার ধারে যেতাম মুটের জেটিগুলোয়—পনের থেকে কুড়ি কোপেক অবধি অনায়াসেই সেখানে রোজগার করা যায়। মুটে, বাউণ্ডুলে আর চোর-জোচ্চোরদের ভেতরে গিয়ে নিজেকে আমার মনে হত জ্বলন্ত কয়লার ভেতর ঢুকিয়ে-দেওয়া একখণ্ড লোহার শিকের মতো, প্রখর জ্বালাময় অভিজ্ঞতায়

আমার প্রতিটি দিন থাকত পরিপূর্ণ হয়ে। এখানে দেখতাম এমন এক চরকি-পাকখাওয়া পৃথিবী যেখানে মানুষের স্বাভাকি প্রবৃত্তিগুলো স্থূল; উলঙ্গ আর কণ্ঠাহীন তাদের লোভ। জীবনের প্রতি এই মানুষগুলোর তিক্ততা দেখে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আকৃষ্ট হয়েছিলাম পৃথিবীর সব কিছুর বিরুদ্ধে এদের সব্যঙ্গ প্রতিকূলতা আর নিজেদের সম্পর্কে উদাসীর অবহেলা দেখে। নিজের জীবনে আমি যতোকিছু দেখেছি আর শুনেছি তারই তাগিদ আমায় টেনে এনেছিল এদের কাছে, এদের তিক্ত বিস্বাদ পৃথিবীতে নিজেকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেবার বাসনা জেগে উঠেছিল আমার মনে। এদের এই পৃথিবীটার আকর্ষণ আমার কাছে আরো দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল ব্রেত্ হার্তের গল্প এবং আরো অসংখ্য শস্তা উপন্যাস পড়ে।

একজন ছিল বাশ্কিন। পেশাদার চোর, শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র—ক্ষয়রোগে ভুগত। মাঝে মাঝেই সাঙ্ঘাতিক রকম মুষড়ে পড়ত সে। ওজস্বিনী ভাষায় সে আমাব উপদেশ দিত:

‘ভয়-কাতুরে মেয়েদের মতো লজ্জা কিসের রে তোর? সতীত্ব হারাবার ভয়? আরে—মেয়েদের সতীত্ব খোয়ালে সবই গেল। কিন্তু তোর পক্ষে ও সব সাধুগিরি কাঁধের জোয়ালের সামিল। বলদও সাধু, কিন্তু শুধু বিচালি হলেই তার পেট ভরে।’

বাশ্কিন বেঁটেখাটো, লাল চুলো মানুষ—অভিনেতাদের মতো পরিষ্কার করে কামানো থাকত ওর দাড়িগোঁপ। ওর মৃদু নিঃশব্দ চলাফেরার ভঙ্গি দেখে আমার বেড়ালের বাচ্চার কথা মনে পড়ত। আমার প্রতি ওর আচরণটা ছিল উপদেশপূর্ণ আর আগ্লে-আগ্লে রাখার, ও যে মনপ্রাণ দিয়ে আমার সুখ আর কল্যাণ কামনা করে

সেট আমি দেখতে পেতাম। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ অনেক ভালো ভালো বইও পড়েছিল—'কাউণ্ট্ অব মণ্টিক্রিস্টো'টাই নাকি ওর সবচেয়ে ভালো লাগত। বলত:

'বইটার মধ্যে প্রাণ আছে, একটা উদ্দেশ্যও আছে।'

মেয়েদের সম্পর্কে অনুরাগ ছিল বাশ্কিনের, উচ্ছ্বসিত হয়ে যখন তাদের কথা বলত আর লালসা-ভরা সাগ্রহ ঠোঁটে চুমকুড়ি কাটত, তখন ওর জীর্ণ শরীরটার ভেতর দিয়ে যেন একটা কাঁপুনি খেলে যেত। ওর এই খিঁচুনিটার মধ্যে এমন অরুচিকর কিছু ছিল যা আমার গা বমি করত। কিন্তু তবু ওর কথাগুলো আমি আগ্রহ-ভরে শুনতাম, কারণ এক ধরণের সৌন্দর্য খুঁজে পেতাম তাতে।

'মেয়েমানুষ, আঃ!' গুন্গুন্ করে ও যখন কথাগুলো, ফ্যাকাশে গালদুটো ওর লাল হয়ে উঠত আর কালো চোখজোড়া উৎসাহে চক্চক্ করত। 'একটি মেয়ের জন্য আমি সব করতে রাজি। শয়তানের মতোই মেয়েমানুষরাও পাপ কাকে বলে জানে না। যতোদিন বাঁচবে ভালোবেসে যাও—ওর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছু আবিষ্কার হয়নি হে।'

গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লোকটার। আর প্রায় বিনা চেষ্টাতেই ছোট ছোট মন-গলানো ছড়া বানাত বারবনিতাদের নিয়ে। তাদের প্রত্যাখ্যাত প্রেম আর অভিমানের জ্বালা নিয়ে। ভল্গার পারে সমস্ত শহরগুলোয় ওর ওইসব গান চলত। অনেক গানই সে বানিয়েছিল; তার মধ্যে একটা খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ে:

মেয়ে যখন গরিব সাধারণ
পরনে নেই ফ্যাশনদার জামা

করবে কে যে এখানে তাকে বিয়ে
এমন মানুষ কোথাও তো নেই জানা…

আমার আরেকজন হিতাকাঙ্খী ছিল ক্রসভ্—সন্দেহজনক চরিত্রের লোক। দেখতে শুনতে চমৎকার। পোশাকে-আশাকে ফুলবাবুটি, আর হাতের আঙুলগুলো ছিল বাজিয়েদের মতো পেলব। আদ্‌মিরাল্‌তি পাড়ায় তার একটা ছোট দোকান ছিল। সাইনবোর্ডে লেখা: ‘ঘড়ি মেরামতী’, কিন্তু আসলে ক্রসভের ব্যবসা ছিল চোরাই-মালের বিক্রি।

প্রায় পাক-ধরা দাড়িটায় হাত বুলিয়ে, নির্লজ্জ আর ধূর্ত চোখদুটো আধ-বোজা করে আমার দিকে ঘুরিয়ে সে বলত, ‘জোচ্চোরদের মতো ফন্দি-ফিকির করতে যেও না কিন্তু, মাক্সিমিচ। ও তোমার রাস্তা নয়, সে আমি দেখেই বুঝেছি। তুমি হলে ভাবালু গোছের লোক।’

‘ভাবালু মানে? কী বলতে চাও?’

‘মানে, যাদের কক্‌খোনো কোনোটাতে চোখ টাটায় না খালি জানতে চায়…’

এটা কিন্তু আমার সঠিক বর্ণনা হল না। অনেক সময়ই আমার হিংসে হত, নানান্ ব্যাপারে। যেমন, বাশ্‌কিনের ভাষার দখল দেখে, তার ওই অদ্ভুত কবিতার মতো কথা বলার কায়দা, অপ্রত্যাশিত অলঙ্কার আর ভাষার মারপ্যাঁচ দেখে আমার বিলক্ষণ ঈর্ষা হত। এখনও আমার মনে পড়ে ওর একটা প্রেমের গল্পের শুরুর দিকটা:

‘একদিন মেঘ-কাজল রাতে গুটিশুটি মেরে বসে আছি জরাজীর্ণ স্‌ভিয়াজস্ক শহরের এক সরাইখানায়—গাছের ফোকরে প্যাঁচা যেমন চুপটি করে বসে থাকে তেমনি। হেমন্তের দিন, অক্টোবর মাস। অলস ধারায় এক পশলা বৃষ্টি নেমে এসেছে, শোঁ শোঁ করে বাতাসের

কান্না—যেন কোনো দুঃখী তাতার মনে বড়ো আঘাত পেয়ে গান ধরেছে —একটানা উ-উ-উ…

'…এমন সময় এল মেয়েটি, ভোরের আকাশের পাতলা মেঘের মতো হাল্‌কা আর গোলাপী, চোখে তার নিষ্পাপ মনের ছবি—মাকাল-ফলের ফাঁকি। আমায় বলে, "ওগো আমার মনের মানুষ, তোমায় কখনো ঠকাইনি"। ওর গলার আওয়াজটুকু সাঁচ্চা, তবে আমি জানতুম ওর কথাগুলো সব মিছে। কিন্তু তবু—বিশ্বাস করলুম তাকে। আমার মন জানতো ঠিকই, তবে আমার অন্তর বিশ্বাস করতে চায়নি যে সে মিথ্যে বলেছে।'

চোখদুটো আধ-বোজা করে, শরীরটা তালে তালে দুলিয়ে সে বলে যেত কথাগুলো, আর তার হাতখানা বারে বারে একইরকম ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে উঠে ছুঁয়ে যেত তার বুকটা, হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরটায়।

গলার স্বর একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু ওর প্রত্যেকটা শব্দ জীবন্ত—যেন নাইটিঙ্গেলের প্রাণের স্পন্দন ওর কথার ভাঁজে।

ক্রুসভ্‌কেও হিংসে হত আমার। সাইবেরিয়া, খিভা আর বুখারা নিয়ে মন-মাতানো সব গল্প বলত সে। ধর্মযাজকদের জীবনযাত্রা নিয়ে বেশ মজার মজার কথা বলত, কিন্তু বড়ো সাঙ্ঘাতিক ঝাঁঝ থাকত তাতে। জার তৃতীয় আলেক্সান্দারের সম্পর্কে একদিন রহস্য করে মন্তব্য করল:

'এই জারটি কিন্তু নিজের কারবার ভালোই বোঝে।'

আমি ভাবতাম, ক্রুসভ্‌ নিশ্চয় সেই জাতের 'বদমায়েশ' যারা গল্প-উপন্যাসের শেষদিকে পাঠকদের অবাক করে দিয়ে হঠাৎ মহানুভব নায়কে পরিণত হয়।

গুমোট রাতে মাঝে মাঝে এরা সবাই ছোট্ট কাজান্‌কা নদী পার হয়ে যেত মেঠো জমিটায় চড়ুইভাতি করতে। সেখানে ঝোপঝাড়গুলোর আড়ালে বসে চলত পান, ভোজন, গল্প—নিজেদের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, আরো বেশি আলোচনা হত জীবনের নানা জটিলতা নিয়ে, মানুষ মানুষে সম্পর্কের অদ্ভুত বিশৃঙ্খলতা নিয়ে। নারী-সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ হত সবচেয়ে বেশি, কখনো বিদ্বেষের জ্বালা কখনো বিষাদ থাকত ওদের কথায়—মাঝে মাঝে বেশ নাড়াও দিত মনটায়, আর বলতে গেলে সবসময়ই যেন ওরা শঙ্কা-কুটিল অজানা রহস্যঘেরা একটা অন্ধকারের দিকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখত। মিটমিটে তারায় ভরা সেই কালো আকাশের নিচে আমি ওদের সঙ্গে দু-তিন রাত কাটিয়েছি। উইলো ঝোপে ঢাকা একটা ছোট ঢালু জায়গায় গুমোট গরমের মধ্যে আমরা শুয়ে থাকতাম। ভল্‌গা খুব কাছেই, তাই অন্ধকারটা সেঁৎসেঁতে, আর সেই অন্ধকারে সোনালি মাকড়সার মতো পা মেলে মেলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত নৌকোর আলোগুলো, নদীর নিথর কালো খাড়া পাড়—বরাবর জ্বল্‌জ্বল্‌ করত অসংখ্য আগুনের বিন্দু আর রেখা—বর্ধিষ্ণু উস্লোন গ্রামের সরাইখানা আর বাড়ির জানলাগুলো। ছব্‌ছব্‌ করে স্টীমবোটের চাকার ভোঁতা আওয়াজ উঠত জলে। একসার বজরা হয়তো চলেছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে খালাসীরা, নেকড়ের ডাকের মতো ওদের ভাঙা গলার আওয়াজ। কোথাও হয়তো একটা হাতুড়ির ঘা পড়ছে লোহার ওপর। জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে একটা বিলাপ-দীর্ণ গান—কার প্রাণ বুঝি বা দগ্ধে-দগ্ধে সারা হয়ে যাচ্ছে। সে গান মনকে ছেয়ে দেয় বিবর্ণ বিষণ্নতায়।

আমার সঙ্গীদের মৃদু স্বচ্ছন্দ আলাপের দিকে কান পাতলে কিন্তু এর চেয়েও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মনটা। জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে ওরা যে যার একান্ত নিজের মনের জানাটুকুই শুধু বলে যায়—আরেকজন কী বলল ভালো করে শোনেও না। ঝোপের ছায়ায় বসে কিংবা শুয়ে, চুরুট টেনে আর মাঝে মাঝে ভদকা কিংবা বীয়ারের পাত্রে নির্লোভ চুমুক দিয়ে ওরা অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি মন্থন করে চলে।

একজন হয়ত রাতের অন্ধকারে মাটির ওপর ঢলে পড়ে বলবে, 'তাহলে শোনো আমার জীবনের এই ঘটনাটা'।

তারপর সে যখন শেষ করবে তার বৃত্তান্ত, অন্যরা বিড়বিড় করে সমর্থন জানাবে:

'হ্যাঁ, এমন ব্যাপারও ঘটে বৈকি। সব কিছুই ঘটতে পারে···।'

'ঘটল', 'ঘটে', 'ঘটত'—কথাগুলো আমার কানে এমনভাবে বাজত যে শেষ পর্যন্ত আমার মনে হত বুঝি আজকের রাতটিতেই এদের জীবনের অন্তিম প্রহর ঘনিয়ে আসছে। সবকিছুই যেন আগে ঘটে গেছে, ভবিষ্যতে আর কখনো কিছু ঘটবে না।

এই অনুভূতিটাই আমাকে বাশ্‌কিন আর ত্রুসভের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। কিন্তু তবু ওদের ওপর একটা টান ছিল আমার, আমার সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার যুক্তি ধরে ওদের পথটাই বেছে নেওয়া আমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হত। বিশেষ করে, জীবনের উচ্চতর সোপানে ওঠার আর লেখাপড়া শেখার সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছিল বলে আমার দারুণ একটা ঝোঁক আসত ওদের রাস্তায় চলার। অনাহার, ঈর্ষা আর নৈরাশ্যের চরম মুহূর্তগুলোয় আমার

মনে হত যে-কোনো অপরাধ করবার জন্য আমি সম্পূর্ণ তৈরি — 'সম্পত্তির পবিত্র অধিকারে' হাত বাড়ানোটা তো সামান্য কথা। যে পথ আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে সে পথ ছেড়ে আমি যেতে পারিনি যৌবনের ভাবপ্রবণতার বশে। মানব-দরদী ব্রেত্ হার্তের লেখা এবং আরো নানা শস্তা উপন্যাস ছাড়াও বেশ কটা বই আমার এর মধ্যে পড়া হয়ে গিয়েছিল যেগুলো মোটেই হাল্কা নয়। এসব বই পড়ে আমার মনে জাগত অন্য কিছু পাবার বাসনা — এমন কিছু যার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও আশে-পাশে যা দেখতাম তার চেয়ে মূল্য তার অনেক বেশি।

এই সময়ে আমি নতুন এক ধরণের সাহচর্য পেতে শুরু করেছিলাম, নতুন নতুন বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল। ইয়েভরেইনভদের বাড়ির পাশে পোড়ো জমিটায় ইস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই এতে জুটত গরোদ্‌কি* খেলতে, ওদের মধ্যে একজনকে আমার খুবই ভালো লাগত — গুরি প্লেৎনিয়ভ্। কালো দেখতে জোয়ান ছেলে, জাপানীদের মতো নীলচে-কালো চুল, আর মুখটা ছোট-ছোট কালো তিলে ভরা — যেন চামড়ায় কেউ বারুদ রগড়ে দিয়েছে। অদম্য ফূর্তিবাজ, খেলাধূলায় পটু আর আলাপ-রসিক এই ছেলেটার ছিল নানা দিকে বিচিত্র মেধা। আর প্রতিভাশালী রুশদের সাধারণত যেমনটি হয়ে থাকে সে-ও তেমনি প্রকৃতিদত্ত দানটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকত, নিজের ক্ষমতাকে বাড়াতেও চেষ্টা করত না, একাগ্রও করতে চাইত না। গান বাজনা

---

* গরোদ্‌কি — জনপ্রিয় খেলা। জমির উপর আঁকা আয়তক্ষেত্রের (গোরদ) উপরকার ছোট-ছোট গোলাকার কাঠের টুকরোকে বড় এক লাঠি দিয়ে ছিটকে ফেলা।

ভালোবাসতো,—যেমন সমঝদার মন তেমনি সজাগ ছিল তার কান, নিজেও বেশ চমৎকার বাজাত গুস্‌লি,* বালালাইকা** আর অ্যাকর্ডিয়ন—কিন্তু এর চেয়ে সূক্ষ্ম আর জটিল যন্ত্রগুলো সে কোনোদিন আয়ত্ত করার চেষ্টাই করেনি। গরিব ছেলে, পোশাক-আশাকে দৈন্য, কিন্তু ওর বেপরোয়া মেজাজ, ভ্রূক্ষেপহীন ভাবভঙ্গী ছটফটে চলাফেরা আর ছিপছিপে গড়নের সঙ্গে ওর এই ছেঁড়া কোঁচকানো শার্ট, তালি-দেওয়া পাৎলুন আর গোড়ালি-বসে-যাওয়া বুটজুতো বেশ ভালোই মানিয়ে যেত।

অনেকদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পর সবে যেন সেরে উঠেছে, কিংবা কালই জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে এমনি এক কয়েদীর মতো ছিল ওর চেহারাটা। জীবনের যা-কিছু অভিজ্ঞতা সবই যেন ওর কাছে নতুন আর আনন্দময়। সবকিছুতেই কলরব-মুখর উল্লাস ওর। গুন্‌-গুন্‌-করা লাটিমের মতো পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে এ সংসারে।

আমাকে যে কত কঠিন আর অনিশ্চিত এক জীবন কাটাতে হচ্ছে তা জানতে পেরে ও একদিন আমায় বলল, আমি যেন ওর আস্তানায় গিয়ে উঠি আর পড়াশোনা করি গ্রামের ইস্কুল-মাস্টার হবার জন্য। শেষ অবধি গিয়েও হাজির হলাম 'মারুসভ্‌কা' নামে সেই অদ্ভুত, হল্লাবাজ বস্তি বাড়িটায়—বোধহয় কয়েক পুরুষ ধরেই কাজানের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত ও বাড়ি: রিব্‌নরিয়াদ্‌স্কায়ার ওপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া প্রকাণ্ড বাড়িখানার চেহারা দেখলেই মনে হয় বুঝি জোর

* গুস্‌লি—প্রাচীন তারের বাদ্যযন্ত্র।

** বালালাইকা—জনপ্রিয় তিনটি তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

করে মালিকদের হাত থেকে ওটা দখল করে নিয়েছে এক দঙ্গল আধা-উপোসী ছাত্র, গণিকা আর নানা বিচিত্র মানবীয় চরিত্রের ভগ্নাবশেষ—এমন সব জীব যাদের মনে হত যেন বড় বেশী দিন ধরে বেঁচে আছে। চিলে-কোঠার সিঁড়ির নিচে ফাঁকা দরদালানটায় থাকত প্লেৎনিয়ভ্। সিঁড়ের নিচে ছিল তার শোবার খাট, আর দরদালানের এক প্রান্তে জানলার পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। ব্যস্, আর কিছু নয়। তিনটে কামরায় ঢোকার রাস্তা এই দরদালানটার ভেতর দিয়ে—দুটোতে থাকত গণিকারা আর তৃতীয়টায় একজন ক্ষয়রোগী গণিতজ্ঞ। সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্র—লম্বা, রোগা, চেহারাটা প্রায় ভয়ানক গোছের। সারা মুখে ঝাঁকড়া রুক্ষ লালচে লোম পরনে এমন নোংরা ধুকড়ি যে তাতে শরীরটা প্রায় ঢাকাই পড়ত না। ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে দেখা যেত তার বীভৎস নীলচে চামড়া আর পাঁজরার হাড়গুলো।

নিজের নখগুলো ছাড়া আর কিছু সে খেত বলে মনে হয় না — একেবারে গোড়া অবধি দাঁতে কেটে রাখত। দিন রাত বসে-বসে কী যেন সব খসড়া আর হিসেব-নিকেশ করত আর অনবরত কাশত—কাশিটা কেমন ভোঁতা আর গুম্‌গুমে ধরণের। বেশ্যাগুলো ভয় করত লোকটাকে, ভাবত পাগল, কিন্তু দয়াপরবশ হয়ে আবার রুটি, চা, চিনি ইত্যাদি রেখেও যেত ওর দরজার বাইরে। কামরার বাইরে এসে মোড়কগুলো তুলে নিত সে, হাঁপিয়ে-ওঠা ঘোড়ার মতো ফোঁস্ ফোঁস্ করত। যদি কোনো কারণে ওরা জিনিসগুলো দিতে না পারত কিংবা ভুলে যেত তাহলে তার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে ভাঙা গলায় চীৎকার করে বলত:

‘খাবার!’

লোকটার কালো কোটরে-বসা চোখদুটো যেন পাগলের মতো অহঙ্কারে চক্‌চক্‌ করত, নিজের গৌরবের ধারণায় তার নিজেরই মহা আনন্দ। অনেক দিন বাদে-বাদে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত একটি খুদে কুঁজো দো-পেয়ে আজব প্রাণী—পাকা-চুলওয়ালা জীবটির ফুলো নাকের ওপর বসানো একজোড়া পুরু চশমা, হিজড়ের মতো ফ্যাকাশে মুখখানা, তাতে লেগে রয়েছে ধূর্ত হাসি। শক্ত করে দরজা এঁটে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকত ঘরে। একটা অদ্ভুত ধরণের নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ত কামরাটা থেকে। একবার অবশ্য গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গণিতজ্ঞের ভাঙা গলার আওয়াজে। ভয়ানক গাঁক গাঁক করছিল সে:

‘আমি বলছি, কয়েদখানা! জ্যামিতিটা একটা খাঁচা বিশেষ, তা ছাড়া আর কিছু নয়! হ্যাঁ, এ একটা ইঁদুর ধরা কল! কয়েদখানা!’

কুঁজো জানোয়ারটা তখন তীক্ষ্ণ সরু গলায় ফ্যাঁচ্‌ ফ্যাঁচ্‌ করে হাসতে লাগল আর বার বার করে একটা অদ্ভুত কথা বলতে লাগল। তখন হঠাৎ সেই গণিতজ্ঞ তারস্বরে চীৎকার করে উঠল:

‘চুলোয় যাও, হতভাগা! বেরিয়ে যাও এখান থেকে!’

বাইরের লোকটা যখন রাগে হিস্‌ হিস্‌ আর আর্তনাদ করতে করতে তাড়াতাড়ি ঢোলা জোব্‌বাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দরদালানের ভেতর দিয়ে সরে পড়তে যাচ্ছে, গণিতজ্ঞ দরজার গোড়াতেই শুঁটকো ভয়ঙ্কর চেহারাটা নিয়ে দাঁড়াল। মুঠো করে তার এলোমেলো চুলের গোছাটা ধরে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বলল:

‘ইউক্লিডটা গাধা! আস্ত গাধা··· আমি প্রমাণ করে দেবো ওই নির্বোধ গ্রীকটার চেয়ে ঈশ্বরের মগজে অনেক বেশি বুদ্ধি।’

তারপর দরজাটা এমন জোরে দড়াম করে বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল যে ঘরে কী-যেন একটা জিনিস ঝন্‌ঝন্‌ করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরেই আবিষ্কার করেছিলাম, এই লোকটা নাকি উচ্চতর গণিতের সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে। অবশ্য ফল লাভ করার আগেই সে ইহলোক থেকে বিদায় নেয়।

প্লেৎনিয়ভ্‌ কাজ করত এক ছাপাখানায় রাত করে খবরের কাগজের প্রুফ দেখত। প্রতি রাত্রে এগারো কোপেক করে পেত। যেদিন আমার কিছু রোজগার হত না সেদিন চার পাউণ্ড রুটি, দু-কোপেকের চা আর তিন কোপেকের চিনি খেয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিতে হত। ওদিকে টাকা রোজগার করার মতো সময়ও আমি বেশি পেতাম না, কারণ আমায় পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তবে আমার বিদ্যার চর্চা। বিশেষ করে কষ্ট হত ব্যাকরণ শাস্ত্রটা নিয়ে, রুশ ভাষার মতো এমন একটা জীবন্ত, এমন জটিল আর খামখেয়ালী বহুমুখী ভাষাকে ওই রকম বিশ্রী সংকীর্ণ কাটখোট্টা কাঠামোর মধ্যে ফেলে দুরস্ত করতে আমি একেবারেই পারিনি। কিছুদিন পরেই অবশ্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এই কথা জেনে যে আমি নাকি পড়া শুরু করেছি 'বড়ো বেশি আগে'—গ্রামের ইস্কুল মাস্টারির পরীক্ষায় যদি-বা পাশ করি, তবু চাকরি পাব না, কারণ আমার বয়স বড়ো কম।

গুরি প্লেৎনিয়ভ আর আমি একই খাটে শুতাম—ও দিনে, আমি রাতে। খুব ভোর থাকতে ও বাড়ি ফিরে আসত রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে, মুখটা ওর স্বাভাবিকের চেয়েও কালো আর চোখগুলো

ভারি-ভারি হয়ে থাকত। ও আসামাত্র আমি ছুটতাম সরাইখানায় গরম জল আনতে—আমাদের তো আর সামোভার ছিল না। তারপর জানলার পাশের টেবিলটায় বসে আমরা চা রুটি দিয়ে প্রাতরাশ করতাম। সকালের খবরের কাগজের খবরগুলো গুরি বলে যেত আর 'লাল ডমিণো' ছদ্মনামের এক মাতাল সাময়িকী-কলম-লেখকের সর্বসাম্প্রতিক হাসির কবিতাগুলো আবৃত্তি করত। জীবন সম্পর্কে গুরির এত হাল্কা মনোভাব দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। আমার যেন মনে হত চাঁদ-মুখো ওই গাল্কিনা স্ত্রীলোকটার সম্পর্কে ওর যা আচরণ জীবনের ব্যাপারেও ওর চালচলন অনেকটা সেই ধরণেরই। গাল্কিনা ছিল কুটনী, মেয়েদের পুরনো পোশাক-আশাকের ব্যবসাও করত।

সিঁড়ির নিচের এই ছোট্ট খোঁদলটুকু গুরি ওই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকেই পেয়েছিল। 'কামরা'র ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই বলে টাকার বদলে ও হাসি-তামাশা, অ্যাকর্ডিয়ন বাজনা আর মন-গলানো গানেই সেলামী দিত—গানগুলো গাইত সে হাল্কা পুরুষালি, চোখে বিদ্রূপের ঝল্কানি খেলিয়ে। জোয়ান বয়েসে গাল্কিনা অপেরার গাইয়েদের দলে ছিল, তাই সুরের কদর বুঝত সে। মাঝে মাঝে তো তার নির্লজ্জ চোখ দিয়ে হু-হু করে ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ত তার পেটুক ও মাতালের মতো ফুলো-ফুলো বেগ্নী রঙের গাল-দুটো বেয়ে। মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে সে চোখের জল মুছত, তারপর একটা নোংরা রুমালে সযত্নে আঙুলগুলো পরিষ্কার করে নিত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'আঃ, গুরি, আপনি ভাই সত্যিকারের পেশাদার গায়ক! হ্যাঁ, আট্টু যদি সোন্দর হইতে তাইলে তোমার একটা হিল্লে করতাম। যতো ভালো-ভালো জুয়ান ছোকরাগুলোদের তো

ঝুইল্যে দিছি মাগীগুলোর সঙ্গে যেগুলোর কিনা একা-একা থেকে একবারে মুইষ্‌ড়ে পড়েছিল!'

এই 'ছোকরাগুলোদের' মধ্যে একজন থাকত আমাদের ঠিক ওপরতলার চিলে-কোঠায়। এক লোমজ বস্ত্রের ব্যবসায়ীর ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাঝামাঝি গড়নের চওড়া-বুকওয়ালা এই জোয়ান ছেলেটির উরুগুলো ছিল অস্বাভাবিক রকমের সরু। চূড়োর ওপর দাঁড়-করানো একটা ত্রিভুজের মতো চেহারা, অথচ চূড়োর ঠিক ডগাটিই যেন কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর পাগুলো ছিল মেয়েদের মতো ছোট-ছোট। কাঁধের ভেতর অনেকখানি বসে-যাওয়া মাথাটাও ছিল খুদে, উজ্জ্বল লাল চুলগুলো লোমশ একটা টুপির মতো। ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখখানার ওপর ঠেলে-বেরিয়ে-আসা সব্‌জে চোখদুটোয় লেগে থাকত একটা বিষণ্ন দীপ্ত।

ঘর-ছাড়া কুকুরের মতো অনাহারে থেকে, অশেষ কষ্ট স্বীকার করে, তবে সে ইস্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোতে পেরেছিল—বাপের অমত সত্ত্বেও। তারপর অবশ্য যখন টের পেল ওর গলার আওয়াজটা গাঢ় আর মখমলের মতো মোলায়েম, তখন ওর শখ হল গান করতে শিখবে।

এটাকেই টোপ হিসাবে ধরে গাল্‌কিনা ওকে পাকড়ে ফেলল তার এক মক্কেলের জন্য: মক্কেলটি ব্যবসাদার শ্রেণীর এক ধনবতী মহিলা, বয়েস প্রায় চল্লিশ, এক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে পড়ে, আর একটি মেয়ে ইস্কুলের শেষ ধাপে। মহিলাটি রোগা আর তার চেহারাটা কাঠের তক্তার মতো সমতল, সেপাইয়ের মতো সোজা হয়ে থাকেন, সন্ন্যাসিনীদের মতো ভাবাবেগহীন মুখখানা। বড়ো-বড়ো ধূসর চোখদুটো

যেন অন্ধকার কোটরের মধ্যে বসা। ভদ্রমহিলা সবসময় কালো পোশাক পরতেন, মাথায় সাবেকী ধরণের সিল্কের রুমাল আর কানে উজ্জ্বল সবুজ পাথর বসানো কানপাশা।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের সময় কিংবা খুব ভোরে এসে এই ভদ্রমহিলাটি তাঁর ছাত্রের খোঁজ করতেন। প্রায়ই তাঁকে দেখতাম যেন লাফ মেরে ফটক দিয়ে ঢুকে দৃঢ়ভাবে পা ফেলে-ফেলে আঙিনাটা পেরিয়ে আসতে। মুখখানার মধ্যে যেন ভয়ানক একটা কিছু ছিল, ঠোঁটদুটো এত চাপা যে প্রায় নজরেই পড়ে না, চোখদুটোর মধ্যে একটা নৈরাশ্য, হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব, সোজা সামনে তাকিয়ে থাকতেন চোখদুটো বড়ো বড়ো করে, তবু মনে হত যেন দৃষ্টিহীন। ভদ্রমহিলাকে কুৎসিত বলা চলত না মোটেই। ওঁর ওই অতি-প্রকট কাঠিন্যই ওঁর চেহারাটাকে বিকৃত করে দিয়েছিল, মনে হত যেন ওঁর সব আকৃতিটাকে করেছিল লম্বা আর সমস্ত মুখটাকে নির্মমভাবে দিয়েছিল দুমড়ে মুচড়ে।

প্লেৎনিয়ভ বলত, 'ভদ্রমহিলা ঠিক বদ্ধ পাগলের মতো!'

ওঁকে ওঁর ছাত্র ভয়ানক ঘৃণা করত আর এড়িয়ে চলত, উনি কিন্তু গোয়েন্দার মতো তার পেছনে লেগে থাকতেন, নাছোড়বান্দা পাওনাদার যেমন করে তেমনি।

নেশা-টেশা করলে ছাত্রটি প্রায়ই বিলাপ করত, 'অপমানিত মানুষ আমি, এইসব গান-টান শিখে আমার লাভ কী? কোনোকালেও তো ওরা আমার এই চেহারা আর এই মুখ নিয়ে স্টেজের কাছে ঘেঁষতে দেবে না। কোনোকালেও না!'

প্লেৎনিয়ভ উপদেশ দিত, 'ছেড়ে দাও এসব কারবার'।

'সে তো জানি। কিন্তু ওঁর জন্য দুঃখ হয়। হ্যাঁ, ওঁকে যেমন

বরদাস্ত করতে পারিনে ঠিকই, তেমনি আবার দুঃখও হয় ওঁর জন্য! যদি জানতে উনি কতো…।'

জানতাম আমরা। রাতে শুনতে পেতাম—চিলে-কোঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উনি ভোঁতা কাঁপা-কাঁপা গলায় আবেদন জানাচ্ছেন:

'ভগবানের দোহাই… ওগো আমার প্রাণ, ভগবানের দোহাই!'

বড়ো একটা কারখানার মালিক ছিলেন উনি। নিজের বাড়ি আর ঘোড়াগুলো ছিল। একটা ধাত্রী-বিদ্যালয় চালাবার জন্য হাজার হাজার টাকা খয়রাৎও করতেন। অথচ উনিই কিনা কাঙালের মতো ভালোবাসার প্রার্থী।

প্রাতরাশের পর প্লেৎনিয়ভ ঘুমোতে যেত আর আমি বেরুতাম কাজের খোঁজে, ফিরতাম সেই সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবার বহুক্ষণ পর, যখন ওর ছাপাখানায় যাবার সময় হত। যদি খাবার কিছু আনতাম—রুটি, সসেজ কিংবা সেদ্ধ' নাড়িভুঁড়ি'—তাহলে ও আর আমি সেগুলো ভাগাভাগ করে নিতাম, ওর ভাগটা সঙ্গে করে ও নিয়ে যেত আপিসে।

প্লেৎনিয়ভ চলে যাবার পর আমি 'মারুসভ্কার' দরদলান আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতাম এখানকার নতুন—অন্তত আমার কাছে নতুন—আর অপরিচিত মানুষগুলোর জীবনযাত্রা। গোটা বাড়িটায় গাদাগাদি করে লোক থাকত—পিঁপড়ের ঢিবির মতো। চারিদিক ভরে থাকত টক আর ঝাঁঝালো গন্ধে—গন্ধগুলো যে কোথা থেকে আসে ধরা যায় না; আর প্রত্যেকটা কোণে যেন ওৎ পেতে আছে ঘন অন্ধকার—মানুষের দুশমনের মতো। সকাল থেকে অনেক রাত অবধি জীবনের চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া যেত: দর্জি-বউদের সেলাই-কলের একটানা ঝিক্‌ঝিক্‌ শব্দ, গীতিনাটিকার গাইয়ে-

মেয়েদের কাঁপা-কাঁপা গলা, চিলে-কোঠার ছাত্রটির মোলায়েম পুরুষালি গলায় সুর ভাঁজা, সুরা-জর্জরিত আধ-পাগল এক অভিনেতার ঝঙ্কারময় প্রলাপোক্তি, বেশ্যাগুলোর উন্মত্ত মাতাল চীৎকার। আর আমার মনে তখন জাগত একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন, স্বাভাবিক অথচ কোনো জবাব নেই তার:

'এ সবের কী মানে হয়?'

এ বাড়িতে একটি লোক ছিল, উপোসী যুবকদের দলেই সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াত: ক্রমবর্ধমান টাকের চারদিক ঘিরে তার লাল চুল, ভুঁড়ো পেট, সরু সরু ঠ্যাং, উঁচু চোয়াল আর প্রকাণ্ড মুখের হাঁ, তাতে ঘোড়ার মতো দাঁত। দাঁতগুলোর জন্যই ওর নাম হয়ে গিয়েছিল 'লাল ঘোড়া'। সিম্‌বির্স্কে ওর কয়েকজন ব্যবসাদার আত্মীয় ছিল, তাদের সঙ্গে ও একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল—সে মামলার আজ তিন বছর হতে চলল। সকলকেই ও শুনিয়ে-শুনিয়ে বলত:

'হয়তো মরে যাব। কিন্তু শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খসিয়ে ওদের পথে বসিয়ে যাব! ভিখিরি বানিয়ে ছাড়ব ওদের, অন্যের খয়রাতীর ওপর বেঁচে থাকবে। তারপর যখন এইভাবে ওদের তিনটে বছর কাটবে—তখন সব ফিরিয়ে দেব, মামলায় যা কিছু জিতেছি সব! ফিরিয়ে দিয়ে বলব, "নে, চুলোয় যা! এখন কেমন বুঝিস?" ব্যস্ এই আমি করব।'

'তোমার জীবনের কি ওইটেই লক্ষ্য, ঘোড়া?' জিজ্ঞেস করত লোকে।

ও জবাব দিত, 'আমি যে একেবারে স্থির করে ফেলেছি, আমার সমস্ত মনপ্রাণ আমি এতেই সঁপে দিয়েছি। এছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারি না এখন!'

জেলা-আদালতে, উঁচু-আদালতে কিংবা উকিলের আপিসেই ও সারাদিন কাটিয়ে দিত। কোনো-কোনোদিন আবার সন্ধ্যে নাগাদ ঘোড়ার-গাড়ি করে বাড়ি ফিরত লটবহর, পুলিন্দা, বোতল নিয়ে; তারপর তার নোংরা ঘরটায় ঝুলে-পড়া ছাদের নিচে বাঁকা মেঝের ওপর হৈ-হল্লা পান-ভোজনের বন্দোবস্ত করত। ছাত্র, দর্জি-বউ— যারাই দুয়েক ফোঁটা পানীয়ের সঙ্গে একটু ভরপেট খেতে চায় তাদের নেমন্তন্ন করত সে। 'লাল ঘোড়া' নিজে কিন্তু রাম্ ছাড়া কিছুই স্পর্শ করত না। টেবিল-ঢাকা কাপড়, নিজের পোশাক-আশাক, এমন কি মেঝেটার ওপর অবধি ওর সেই শরাবের কাল্‌চে-লাল দাগ বসে যেত স্থায়ীভাবে। কয়েক ঢোঁক গিলেই ও বিলাপ করতে শুরু করত:

'পাখির ছানা! আমার আদরের ছোট পাখিরা সব! তোমাদের আমি ভালোবাসি! তোমরা খাঁটি সাঁচ্চা মানুষ। আর আমি, আমি একটা ঘোড়েল বদমায়েশ, একটা কু-কু-ক্-কু-মির্-র্! আমি আমার আত্মীয়গুলোকে ডোবাতে চাইছি, আর ডোবাবোও নিশ্চয়, ভগবানের দিব্যি, ডোবাবোই। মরে যাবো হয়তো, কিন্তু…'

পিট্‌পিটে করুণ চোখদুটো থেকে মত্ততার দরুণ জল গড়িয়ে পড়ত কিম্ভূত, কৎসিত মুখটার ওপর দিয়ে। হাতের তেলো দিয়ে গালের জলটা মুছে সেই হাতটা আবার ঘষে নিত হাঁটুতে। ওর পাৎলুনে সব-সময়ই লেগে থাকত তেল্‌চিটে দাগ।

'এই তো তোমাদের জীবন?' চেঁচাত সে, 'পেটে খিদে, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছ, গায়ে শতছিন্ন নেকড়া এটা কি ঠিক? এভাবে বেঁচে থেকে তোমরা কি শিখবে বলত? উঃ, ওই জারটা যদি জানত তোমরা কী ভাবে থাক…'

পকেট থেকে এক মুঠো বিচিত্রবর্ণ নোট বের করে সে চেঁচিয়ে উপহার দিত:

'কার টাকার দরকার? এই নাও, ভাই, এই যে!'

গাইয়ে-মেয়েরা আর দর্জি-বউরা লোভীর মতো টানাটানি করত, ওর লোমশ হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করত নোটগুলো। হৈ-হৈ করে ও আপত্তি জানাত:

'না, না, তোমরা নয়! এ টাকাগুলো ছাত্রদের জন্য।'

কিন্তু ছাত্ররা কখনো ওর টাকা নেয়নি।

'চুলোয় যাক্ টাকা!' চটে গিয়ে লোমজ বস্ত্রের ব্যবসায়ীর ছেলেটা গর্‌গর্ করত।

ভয়ানক মাতাল হয়ে একদিন ও নিজেই একমুঠো দশ-রুবলের নোট নিয়ে এল দুমড়ে মুচড়ে দলা-পাকানো অবস্থায়, প্লেৎনিয়ভের টেবিলের ওপর টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

'এই নাও! চাও টাকা? আমার দরকার নেই।'

আমাদের তক্তপোষে শুয়ে সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে আর হাউ হাউ করে এমন কাঁদতে লাগল যে ওর মাথায় জল ঢালতে হল আমাদের, তারপর জোর করে জল খাওয়াতেও হল। ও ঘুমিয়ে পড়ার পর প্লেৎনিয়ভ নোটগুলো সোজা করতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে এক অসম্ভব কাজ। এমনভাবে গায়ে-গায়ে এঁটে গিয়েছিল নোটগুলো যে খুব ভাল করে জলে না ভিজিয়ে ওগুলো আলাদাই করা গেল না।

নোংরা, ধোঁয়া-ভরা ঘর। খোলা জানলার ওপাশে পাশের বাড়ির ইটের দেয়াল। ভীড়ঠাসা, গুমোট, আর হল্লা, বুক-চাপা স্বপ্নের মতো। তার মধ্যে গলা ফাটিয়ে সকলের চেয়ে বেশি চেঁচাচ্ছে 'ঘোড়া'। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি:

‘তুমি এ বাড়িতে কেন থাক? একটা হোটেলে থাকলেই পার?’

‘ওরে মাণিক, আমার মনটার জন্য! আমার মনটা বড়ো আরাম পায় তোমাদের মধ্যে থাকলে …’

একমত হয় লোমজ বস্ত্রের ব্যবসায়ীর ছেলে।

‘ঠিক বলেছ, ঘোড়া! আমারও। অন্য জায়গায় গেলে আমি মরেই যাব …’

প্লেৎনিয়ভকে সাধাসাধি করে ‘ঘোড়া’:

‘কিছু বাজাও না! একটা গান শোনাও।’

গুস্‌লিটা হাঁটুর ওপর রেখে গুরি তখন গান ধরে:

ওঠো ওঠো উজ্জ্বল সূর্য,
লালে লালে ভরে দাও এ আকাশ …

ওর নরম গলার সুরটা যেন সোজা বুকে গিয়ে বেঁধে।

ঘরে একটা নিস্তব্ধতা। করুণ আবেদনে ভরা গানটার প্রত্যেকটা শব্দ আর গুস্‌লির তারের চাপা স্পন্দন যেন সকলে একসঙ্গে মিলে অনুভব করে যায়।

‘বেশ গায় কিন্তু হতচ্ছাড়া!’ ব্যবসাদার মহিলার হতভাগ্য সান্ত্বনাদাতাটি এবার গর গর করে ওঠে।

গুরি প্লেৎনিয়ভের ছিল সেই জাতের জ্ঞান যার আসল কথাটি হল আনন্দ-মুখরতা। পুরনো এই বাড়িটার আজব বাসিন্দাদের ভেতর ওর ভূমিকাটা ছিল অনেকটা রূপকথার গল্পের পরোপকারী দৈত্যের মতো। যৌবনের নানা রঙে রঙীন হয়ে-ওঠা এর ভরা প্রাণের ছোঁয়া লেগে উচ্ছল উজ্জ্বল হয়ে উঠত এদের অস্তিত্ব—ওর অতুলনীয় রসিকতার

অফুরন্ত আতসবাজিতে, চমৎকার মনমাতানো গানে, মানুষের রীতিনীতি চালচলন নিয়ে সুচতুর পরিহাসে আর জীবনের স্থূল অবিচারগুলো সম্পর্কে ওর স্পষ্টভাষিতায়। সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে প্লেৎনিয়ভ, দেখতে নেহাৎই বাচ্চা, কিন্তু তবু এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ কঠিন কোনো সমস্যায় পড়লে ওর সুবিজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন মনে করে, ও যে কোনো-না-কোনোভাবে তাদের সাহায্য করতে পারবেই এ ধারণা তাদের আছে। যারা ভালো লোক তারা ওকে ভালোবাসত, আর পাজিগুলো ভয় করত ওকে। এমন পুকি লম্বশের লোক বুড়ো নিকীফরীচটা পর্যন্ত গুরির সঙ্গে দেখা হলেই মিটমিটিয়ে হাসত তার ওই ধূর্ত শয়তানি হাসি।

'মারুসভ্‌কা'-বাড়ির আঙিনাটা ক্রমে উঁচু হয়ে দুটো রাস্তার মুখে গিয়ে মিশেছে। রিব্‌নোরিয়াদ্‌স্কায়া, আর একটুখানি ওপরের দিকে স্তারো-গ্‌রশেচ্‌নায়া। দ্বিতীয় রাস্তাটায়, আমাদের ফটক থেকে খানিকটা দূরেই একটা ছোট দেয়াল-খুপরির ভেতর নিকীফরীচের গুম্‌টি-ঘর।

আমাদের এ তল্লাটের একজন প্রবীণ পুলিশ নিকীফরীচ—লম্বা চিম্‌ড়ে এই বুড়োলোকটার বুকের ওপর এক সার ঝল্‌মলে মেডেল ঝুলত। চালাক চতুর চেহারা, মুখে মিষ্টি মন-গলানো হাসি আর চোখদুটো ছিল ধূর্ত।

অতীত আর ভবিষ্যতের মানুষদের নিয়ে আমাদের এই কলরবমুখর উপনিবেশটি সম্পর্কে নিকীফরীচের কৌতূহল ছিল অসামান্য। সারাদিনের মধ্যে অনেকবারই তার ওই ছিমছাম মূর্তিটা দেখা দিত ফটকের সামনে। ধীরেসুস্থে আঙিনাটা পেরিয়ে এসে প্রত্যেকটা জানলায় সে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখত, অনেকটা ঠিক চিড়িয়াখানার রক্ষকের মতো—

যেন খাঁচাগুলোর সামনে টহল দিয়ে যাচ্ছে। শীতের সময় আমাদের বাড়ির দুজন বাসিন্দা গ্রেপ্তার হল: স্মির্নভ নামে একজন এক-হাত-কাটা অফিসার, আর মুরাতভ, একজন সাধারণ সৈনিক। দুজনেই একসময় সেনাপতি স্কবেলেভের আখাল-তেকিনস্ক অভিযানে যোগ দিয়েছিল, সেণ্ট-জর্জ পদকও পেয়েছিল। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ওরা নাকি জব্‌নিন, অভসিয়ান্‌কিন, গ্রিগরিয়েভ, ক্রীলোভ, ইত্যাদি আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে মিলে একটা গোপন ছাপাখানা বসাবার ফিকিরে ছিল, সেই উদ্দেশ্যে নাকি এক রবিবারের দিন প্রকাশ্য দিবালোকে মুরাতভ আর স্মির্নভ শহরের একটা জনবহুল রাস্তায় ক্লিউচ্‌নিকভের ছাপাখানা থেকে কিছু টাইপ চুরি করতে চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলেই ওরা ধরা পড়ে। আরেক রাতে পুলিশরা এসে 'মারুসভ্‌কা' থেকে একটি রোগা গোমড়া-মুখো লোককে ধরে নিয়ে গেল—লোকটার নাম আমি দিয়েছিলাম 'চলমান ঘণ্টা-ঘর'। পরদিন সকালে খবরটা শুনে গুরি তার কালো চুলগুলো উত্তেজিতভাবে খিম্‌চে ধরে বলল:

'দেখছ তো মাক্সিমিচ, সাঁই-তিরিশটি হতভাগা! যতো তাড়াতাড়ি পারো ছুটে যাও…'

তারপর কোথায় ছুটে যেতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে ও আরও বলল:

'শুধু সাবধান! কাছে-পিঠে টিকটিকি থাকতে পারে সেখানে।'

রহস্যজনক একটা কাজের ভার হাতে পেয়ে দারুণ আনন্দ হচ্ছিল আমার, তখনই তীরের বেগে ছুটে গেলাম আদ্‌মিরাল্‌তি পাড়ায়। এখানে এক তামা-মিস্ত্রির অন্ধকার দোকানঘরে একটি যুবকের সঙ্গে দেখা করলাম—যুবকটির মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখদুটো অদ্ভুত নীল। একটা

তামার গামলা নিয়ে কী যেন করছিল সে, কিন্তু তার চেহারাটা মজুরের মতো নয়। একেবারে কোণের দিকে সাঁড়াসী যন্ত্রের কাছে দাঁড়িয়ে একটি ছোটখাটো বুড়ো লোক একখানা চুঙ্গি নিয়ে কিছু একটা করছিল। মাথার সাদা চুলগুলো সে একফালি চামড়া দিয়ে পেছনে বেঁধে রেখেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম:

'এখানে কোনো কাজ খালি আছে?'

বুড়ো তামা-মিস্ত্রি কড়া গলায় জবাব দিল:

'আমাদের জন্য কাজ তো অনেক। কিন্তু তোমার দ্বারা হবে না!'

যুবকটি চট্ করে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়েই মাথা নিচু করে আবার কাজ করতে লাগল। লুকিয়ে ওর পায়ে আমার পা দিয়ে একটা ধাক্কা দিলাম। ভয়ানক চটে আর অবাক হয়ে সে তার নীল চোখজোড়া ঘুরিয়ে একবার দেখল আমায়, গামলার হাতলটা এমন করে বাগিয়ে ধরল যেন এখনই ছুঁড়ে মারবে। আমার চোখের ইশারাটা লক্ষ্য করে অবশ্য শান্ত গলায় বলল:

'যাও, যাও, বেরোও...'

আবার চোখ টিপে দোকান ছেড়ে বেরুলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। চুল-কোঁকড়া মিস্ত্রিটা তখন উঠে খিল ধরা হাত-পাগুলো একবার টান করে নিয়ে আমার পেছন-পেছন বেরিয়ে এল। সিগারেট জ্বালতে সে আমাকে দেখতে লাগল নীরব প্রতীক্ষায়।

'আপনি কি তিখন?'

'হ্যাঁ!'

'পিওতর গ্রেপ্তার হয়েছে।'

রাগে কুঁচকে গেল ওর ভুরুজোড়া। আমাকে খুঁটিয়ে দেখল তার চোখদুটো।

‘কী সব বলছ? কোন্ পিওতর?’

‘রোগা পাতলা লোকটা। পাদ্রিদের মতো চেহারা।’

‘ও, তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ, এইটুকুই খবর।’

‘কিন্তু তোমার ও সব পিওতর, পাদ্রি, অমুক-তমুক আজেবাজে ব্যাপারের আমি কী জানি?’ জিজ্ঞেস করল মিস্ত্রিটা। আমি কিন্তু ওর প্রশ্ন করার ধরণ দেখেই বুঝলাম ও সাধারণ কোনো মজুর নয়। গুরির কাজের ভার নিয়ে বেশ ভালোভাবেই সেটা করতে পেরেছি, তাই সগর্বে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। ‘ষড়যন্ত্র-ঘটিত’ ব্যাপারে এই আমার প্রথম হাতে-খড়ি।

এইসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ছিল গুরি প্লেৎনিয়ভ, আমিও দীক্ষা নেবার জন্য সাধাসাধি করলে সে শুধু জবাবে বলত:

‘তুমি ভাই এখনও বাচ্চা। এখন কেবল পড়াশোনা করে যাও…’

এরপর ইয়েভরেইনভ একদিন আমাকে এক রহস্যময় গোছের লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর এই পরিচয়টা ঘটানো হয়েছিল চারদিক থেকে এমন আটঘাট বেঁধে সাবধান হয়ে যে আমি আশা করে ছিলাম সত্যিসত্যি কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখব। এই কাজটা করবার জন্য ইয়েভরেইনভ আমাকে শহরের চৌহদ্দির বাইরে একটা খোলা মাঠে নিয়ে গিয়েছিল—জায়গাটার নাম আরস্কোয়ে মাঠ। গোটা রাস্তাটায় ও খালি আমায় সাবধান করেছে যে এখন যে সাক্ষাৎ ঘটতে যাচ্ছে সেটার জন্য আমার তরফ থেকে দারুণ রকম

সতর্ক থাকা দরকার; ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। অবশেষে খানিক দূরে ফাঁকা মাঠটার মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি-করা একটি খুদে ধূসর মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকটায় একটু নজর বুলিয়ে ও আমায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'ওই উনি। পেছুন-পেছুন চলে যাও, উনি থামলে এগিয়ে গিয়ে বলবেঃ—"শহরতলি থেকে এসেছি"।'

রহস্য জিনিসটা চিরদিনই মানুষকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এবার যেন আমার মনে হল নেহাৎই হাস্যকর একটা ব্যাপার: রোদ ঝল্‌মলে গরমের দিন, আর মাঠের ভেতর পাঁশুটে একটা ঘাসের ডাঁটির মতো একা-একা দুলছে ওই মানুষের মূর্তিটা—ব্যস্‌ আর কিছু নয়। কবরখানার ফটকের কাছে এসে আমি ভদ্রলোককে ধরে ফেললাম, দেখি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি তরুণ যুবক, কঙ্কালসার ছোট্ট চেহারা, কঠিন চোখদুটো পাখির মতো গোল-গোল। ইস্কুলের ছাত্রদের ধূসর উর্দি-কোট গায়ে, তবে ধাতুর চক্‌চকে বোতামের জায়গায় কালো হাড়ের বোতাম বসানো রয়েছে। মাথার জীর্ণ টুপিটাতেও একটা কালো দাগ—এক কালে সেখানে ইস্কুলের প্রতীকচিহ্নটা ছিল। মোটের ওপর, চেহারাটার মধ্যে একটা অকালে বুড়িয়ে-যাওয়া ভাব—যেন বয়েস যে ওর সত্যিই বেড়েছে সেটা নিজেকে অন্তত বোঝাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে।

কবরগুলোর পাশে ঘন ঝোপের ছায়ায় গিয়ে বসলাম আমরা। লোকটার কথা বলার ধরণটা নিস্পৃহ, কাজের কথা ছাড়া অন্য কিছু বলে না। লোকটাকে আদৌ পছন্দ হল না আমার, কোনোদিক থেকেই নয়। কী কী বই পড়েছি সেটা গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে

জেনে নেবার পর সে আমায় বলল তারই হাতে গড়ে ওঠা একটা পাঠ-চক্রে যোগ দেবার জন্য। আমি রাজি হলাম। তারপর বিদায় দিলাম পরস্পরের কাছ থেকে। ফাঁকা মাঠটার দিকে একবার সাবধানে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেই লোকটিই সরে পড়ল প্রথম।

পাঠ-চক্রে আমরা ছিলাম মাত্র চারজন কি পাঁচজন। আমিই সকলের ছোট, আর জন স্টুয়ার্ট মিলের বই এবং তাঁর সম্পর্কে চের্নিশেভস্কির টীকা-টিপ্পনী পড়বার মতো প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও আমার একেবারে ছিল না। মিলভ্স্কি নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমাদের বৈঠক বসত—মিলভ্স্কি শিক্ষক বিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে ইয়েলিয়ন্স্কি ছদ্মনাম দিয়ে অনেক গল্প লিখেছিল। প্রায় পাঁচ খণ্ড মতো লেখার পর সে আত্মহত্যা করে। আমার চেনা-জানা কতো মানুষই যে এইভাবে স্বেচ্ছায় জীবনের মায়া ত্যাগ করেছে!

মিলভ্স্কি ছিল কম-কথার মানুষ, তার প্রকৃতিতে ছিল দৃঢ়তার অভাব আর কথাবার্তায় সাবধানী। একটা নোংরা বাড়ির তলার কুঠরিতে থাকত, কাজ করত ছুতোরের 'দেহ আর মনের সমতা বজায় রাখার জন্য'। ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বিশেষ আরাম হত না। স্টুয়ার্ট মিলের বইয়েও মন বসাতে পারিনি। অর্থনীতির গোড়ার সূত্রগুলো ক-দিন বাদেই আমার কাছে বড্ডো বেশি মামুলি মনে হতে লাগল। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আমি আয়ত্ত করেছি সে-সব, আমার দেহের ওপর তাদের স্বাক্ষর বহন করে চলেছি। আমার মনে হত কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে ঠাসা এই সব বড়ো বড়ো বই লেখার কোনো প্রয়োজনই নেই। যে-কোনো মানুষ খাটে যাতে 'অন্যরা' বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারে—তাদের কাছে সব বইয়ের বক্তব্য জলের মতো পরিষ্কার। দু-তিন ঘণ্টা

একটানা এই তলা-কুঠরির খোপে বসে ছুতোর-ঘরের আঠার গন্ধ শোঁকা আর নোংরা দেয়ালে কেঠো-উকুনের নড়াচড়া দেখা আমার পক্ষে একটা দারুণ কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

একদিন আমাদের শিক্ষক ঠিক সময়মতো হাজির হতে পারলেন না। ভাবলাম উনি বুঝি আজ আর আসবেনই না। তাই চাঁদা করে একটা ছোটখাট ভোজের ব্যবস্থা করলাম আমরা: এক বোতল ভদ্‌কা, কিছু রুটি আর শসা। এমনি সময় হঠাৎ জানলার পাশ দিয়ে দেখা গেল তাঁর ছাই-রঙা পটি লাগানো পা-দুটোকে সাঁৎ করে সরে যেতে। ভদ্‌কাটা টেবিলের নিচে চালান করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই উনি এসে হাজির হলেন। চের্নিশেভ্‌স্কির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা দিতে উনি যখন ব্যস্ত আমরা তখন বোকার মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি, নড়বার সাহস নেই, কেবলই ভয়ে ভয়ে ভাবছি এই বুঝি কারুর পায়ে ধাক্কা লেগে বোতলটা উল্টে পড়ে। শেষে অবশ্য শিক্ষকমশাই নিজেই উল্টে দিলেন। বোতল গড়িয়ে পড়ার আওয়াজটা কানে যেতেই উনি টেবিলের নিচে উঁকি দিলেন, কিন্তু একটি কথাও আর বললেন না। উঃ, এর চেয়ে বরং উনি যদি আমাদের তুড়ে গালাগালি দিতেন তাহলে অনেক বেশি স্বস্তি পেতাম।

ভদ্রলোকের কঠোর চেহারা, নির্বাক গাম্ভীর্য, কুঁচকে-যাওয়া চোখদুটোতে গভীর আঘাতের বেদনা দেখে আমি ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সঙ্গীদের লজ্জায় লাল হয়ে-ওঠা মুখগুলোর দিকে চোরা চাউনি দিয়ে দেখলাম, মনে হল শিক্ষকমশাইয়ের প্রতি দারুণ একটা অপরাধ করে ফেলেছি, ওঁর জন্য সত্যিসত্যি বড়ো দুঃখ হতে লাগল—যদিও অবশ্য ভদ্‌কা কেনার বুদ্ধিটা আমার মাথায় গজায়নি।

এখানকার এই পড়াশোনায় হাঁপিয়ে উঠছিলাম আমি। কেবলই চাইতাম এখান থেকে দূরে সরে গিয়ে তাতারদের পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াতে। যেখানে খোশমেজাজী আর দিলদরিয়া মানুষরা থাকে। কেমন এক নিজস্ব ধরণের বিচিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন ওদের। লোকগুলো ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় বেশ মজা করে কথা বলত। সন্ধ্যের সময় উঁচু মিনারের চূড়োগুলো থেকে মুয়েজ্জিনদের অদ্ভুত আজানের সুর ওদের ডাকত নামাজের জন্য। আমার মনে হত তাতারদের গোটা জীবনটাই যেন অন্য ছাঁদে অজানা এক কাঠামোয় ঢালা, আমি যে-জীবনটাকে জানি, যে-জীবনের ওপর আমার ভক্তি নেই, তার সঙ্গে যেন কোনো মিলই খুঁজে পেতাম না ওদের এই জীবনযাত্রার।

ভল্‌গাও টানত আমাকে—টানত তার ছন্দোময় মেহনতের গান দিয়ে। আজ পর্যন্ত সে গান আমার বুকটাকে ভরে দেয় আশ্চর্য সুন্দর একটা নেশায়, পরিষ্কার মনে পড়ে সেই সময়টার কথা যখন আমি প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলাম মেহনতের মহাকাব্য-গাথার।

পারস্যের সওদা বোঝাই একটা বড়ো বজরা চড়ায় আটকে গিয়েছিল—কাজান থেকে খানিকটা ভাঁটির দিকে। বজরার তলাটা গিয়েছিল জখম হয়ে। মালগুলো খালাস করার জন্য মুটেদের যে দলটাকে ভাড়া করা হয়েছিল আমিও ছিলাম তাতে। সেপ্টেম্বর মাস, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বৃষ্টির পেছু পেছু স্রোতের দিকে হু-হু করে ছুটেছে বাতাস। ধোঁয়াটে নদী-বরাবর শুরু হয়েছে কুঁদুলে ঢেউয়ের লাফানি আর বাতাস ওদের ঝুঁটিগুলো ধরে ভয়ানকভাবে আছড়ে দিচ্ছে। জনা-পঞ্চাশেক লোক নিয়ে আমাদের দলটা আশ্রয় নিয়েছে একটা খালি

বজরার পাটাতনে, মুখ ভার করে সবাই গাদাগাদি হয়ে বসেছে তেরপল্ আর বস্তাগুলোর নিচে, ছোট্ট একটা গাধা-বোট ফোঁস্ ফোঁস্ করে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে ভাঁটির দিকে—বৃষ্টির মধ্যে লাল আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে-আসা সিসের মতো জোলো আকাশটা নদীর বুকের ওপর নিচু হয়ে নেমে এসেছে। মুটেরা গজরাতে লাগল, গালাগালি করে নিকুচি করতে লাগল বৃষ্টির, বাতাসের আর নিজেদের জীবনের। ডেকের ওপর কুঁড়ের মতো গুঁড়ি মেরে-মেরে খুঁজতে লাগল ঠাণ্ডা আর ভিজে-হাওয়া থেকে মাথা বাঁচাবার কায়দা। আমার ধারণা হয়েছিল সামনে যে কাজ আছে তা করার মতো যোগ্যতা এই ঝিমুনো জীবগুলোর নিশ্চয়ই নেই। ডুবন্ত মালকে বাঁচাতে এরা কখনোই পারবে না।

মাঝ-রাতের দিকে আমরা চড়াটার কাছে হাজির হয়ে হুড়মূড় করে ছুটলাম ভাঙা বজরার দিকে। মুটেদের সর্দারটি বিদ্রূপ-ভরা বুড়ো শয়তান, মুখে বসন্তের দাগ, যেমন ধূর্ত তেমনি খিস্তিবাজ, বাজপাখির মতো চোখ আর বাঁকা নাকটা। টেকো মাথার চাঁদি থেকে ভিজে টুপিটা খুলে নিয়ে সে মেয়েদের মতো সরু গলায় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল:

'এবার একটু ভগবানের নাম নাও তো স্যাঙাৎরা!'

মুটেরা ডেকের ওপর গাদাগাদি হয়ে বসল অন্ধকারে একটা একটা কালো ঢিবির মতো, তারপর শুরু করল ভালুকের মতো বিড়বিড়ানি। বাকি সকলের আগেই সর্দার তার প্রার্থনা শেষ করে সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'লণ্ঠনগুলো নাও! হ্যাঁ এবার দেখিয়ে তো, দাও জোয়ানরা, তোমরা কি করতে পার! ফাঁকি নয়, বাছারা, সত্যিকারের খেল্ চাই— ঈশ্বরের নামে লেগে যাও!'

তারপর বৃষ্টিতে চুপ্‌সে-যাওয়া এই অলস, মন্থরগতি প্রাণীগুলো দেখাতে শুরু করল 'তারা কি করতে পারে'। যেন লড়াইয়ে নেমেছে এমনিভাবে তারা হৈ-হৈ করে, চেঁচিয়ে, তামাশা করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডুবন্ত বজরাটার ডেকের ওপর, খোলের ভেতর। ধানের বস্তা, কিস্‌মিস্ আর কারাকুলের গাঁটগুলো যেন হাল্‌কা তুলোর মতো শূন্যে উড়ে-উড়ে আসতে লাগল আমার আশপাশ দিয়ে। গাঁট্টাগোঁট্টা মূর্তিগুলো ছুটে বেড়াতে লাগল আর একজন আরেকজনকে চেঁচিয়ে, শিস্ দিয়ে, তীব্র গালিগালাজ করে কাজে ঠেলে দিতে লাগল। যারা এই একটু আগেও মেজাজ খারাপ করে দুষছিল তাদের ভাগ্যকে, শ্রাদ্ধ করছিল বৃষ্টির আর ঠাণ্ডার অলস, মুখগোমড়া সেই প্রাণীগুলোই যে এত উল্লাসের সঙ্গে অনায়াসে আর চট্‌পটে-হাতে কাজ করে যাবে তা বিশ্বাস করাই কঠিন। বৃষ্টি ক্রমেই চেপে এল কন্‌কনে ঠাণ্ডা হয়ে। হাওয়াটা জোরালো হয়ে উঠে আমাদের গায়ের কোর্তাগুলো অবধি টেনে উড়িয়ে নিতে চাইল, মাথার ওপর জামা উঠে গিয়ে সকলের পেট বেরিয়ে গেল। সেঁৎসেঁতে অন্ধকারে ছ-টা টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় কালো কালো মূর্তিগুলো ছুটোছুটি করছে, বজরার ডেকে ধুপ্‌ধাপ্ করে ভোঁতা আওয়াজ উঠছে ওদের পায়ের। এমনভাবে খাটছে যেন এতক্ষণ ওরা কাজের অভাবে হন্যে হয়ে উঠেছিল, যেন অনেকক্ষণ থেকেই আশায় আশায় বসেছিল কখন হাতে-হাতে তিন-মণী বস্তাগুলো ছুঁড়ে দেবার আনন্দটা পাবে, কখন কাঁধে সওদার গাঁটরিগুলো নিয়ে

প্রাণপণ ছুটবে। কাজ করছে না তো যেন খেলছে, বাচ্চাদের মতো সোল্লাসে উৎসাহে খেলছে, কাজ করছে মেহনতের সেই নেশা-ধরানো আবেগ নিয়ে তার চেয়ে মধুরতর হতে পারে একমাত্র নারীর প্রেমালিঙ্গনই।

লম্বাঝুলওয়ালা কোট গায়ে একটি বিরাট, দাড়িওয়ালা লোক, তার পোশাক ভিজে আর পিছল, বোধহয় বজরাটার মালিকই হবে সে, কিংবা মালিকের লোক, হঠাৎ উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠল:

'হেই, সাথীরা! এক জালা ভদ্‌কা রেখেছি তোমাদের জন্য! হেই বোম্বেটে ভাইরা! দু'জালা! কাজটা খতম কর!'

অন্ধকারের ভেতর চারদিক থেকে শোনা গেল গাঁক-গাঁক করে পাল্টা জবাব:

'তিন জালার কম নয়!'

'আচ্ছা তিনই, ব্যস্! কাজটা খতম কর!'

আবার নতুন উদ্যমে উত্তাল হয়ে উঠল কর্মচাঞ্চল্যের ঘর্ণি-ঝড়।

আমিও বস্তাগুলো ধরে টেনে এনে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম, ছুটে গিয়ে আবার ধরছিলাম সেগুলো। আর মনে হচ্ছিল বুঝি আমাকে নিয়েই আমার আশেপাশের সবকিছু একটা উদ্দাম উন্মত্ত নাচে মেতে উঠেছে। মনে হচ্ছিল এই মানুষগুলো বুঝি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এমনিধারার অদম্য অফুরন্ত উৎসাহে চালিয়ে যেতে পারে এদের উল্লাসমুখর বিশাল কর্মকাণ্ড, এরা যদি গির্জার ঘণ্টা-ঘর আর মসজিদের মিনারে হাত বাড়ায় তাহলে নিজের খুশিমতো গোটা শহরটাকেই পারে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে।

সে রাতে আমি এমন এক আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিলাম যা আগে কোনে দিন পাইনি। শ্রমের এমনি এক অর্ধোন্মাদ তূরীয়ানন্দে সারা জীবনটা কেটে যাক এই ইচ্ছাই শিখায়িত হয়ে উঠেছিল আমার

অন্তরে। নিচে, জলের বুকে তখন ঢেউয়ের নাচন লেগেছে। ডেকের ওপর তখনও ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ছাঁট, নদীর ওপর ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে বাতাস। ভোরের মেঘলা আবছা আলোয় জল-সপ্সপে আধা-উলঙ্গ লোকগুলো সমানে খেটে চলেছে ক্ষিপ্র আর অক্লান্ত গতিতে, নিজেদের কর্মক্ষমতায় দৃপ্ত মানুষগুলো সমানে চেঁচাচ্ছে আর হাসছে। আর তারপরেই—তারপরেই হাওয়ার টানে দু'ভাগ হয়ে ছিঁড়ে গেল থমথমে সিসের মতো মেঘ, একটা লাল টক্‌টকে সূর্যের আলো ফুটে উঠল আকাশের উজ্জ্বল নীল ফালিটুকুর ভেতর দিয়ে। ফূর্তিবাজ জানোয়ারগুলো ওদের ভিজে চুলদাড়ির পশম-ঘেরা দেঁতো-হাসিভরা মুখগুলো নেড়ে মহা হৈ-চৈ করে আবাহন জানাল ভোরের সর্যকে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল চুম্বন করি ওদের, জড়িয়ে ধরি এই দো-পেয়ে জন্তুগুলোকে,—এত কুশলী আর এত নিপুণ এরা, এত গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেতে পারে এরা নিজেদের কাজে।

উল্লসিত ক্ষিপ্ত এই কর্মশক্তির অভিযানে বাধা দেবার ক্ষমতা যে কোনো কিছুরই নেই তা আমি মনে প্রাণে বুঝেছিলাম। পৃথিবীর বুকে ভোজবাজির খেল্ দেখিয়ে দিতে পারে এ শক্তি। ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ জাদুকরের গল্প যে আজব দুনিয়ার কথা বলে তেমনি করে সারাদেশটায় রাতারাতি গড়ে তুলতে পারে আশ্চর্য সব শহর আর প্রাসাদ। মাত্র দু-এক মুহূর্তের জন্য সূর্যের আলো চোখ মেলে চেয়ে দেখেছিল মানুষের এই মেহনত, তারপরেই, অতো প্রকাণ্ড সব মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তলিয়ে গেল ওদেরই অতলে—সমুদ্রের কোলে ছোট শিশুর মতো। এবারে ঝম্‌ঝম্ করে নেমে এল বৃষ্টি।

একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ব্যস্ ক্ষান্তি দাও!' কিন্তু খুব কড়া ধমক খেয়ে গেল সে:

‘কে বলল ও কথাটা?’

তারপর সেই বিকেল দুটোয় শেষ মালটা সরানোর সময় অবধি তুমুল বৃষ্টি আর কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে আধা-উলঙ্গঅবস্থায় একনাগাড়ে কাজ করে চলল লোকগুলো। আমাদের মানুষের এই পৃথিবীটা যে কী বিপুল বলে বলীয়ান্, আমার মনে তারই এক সশ্রদ্ধ উপলব্ধি জাগিয়ে তুলল এরা।

কাজ হয়ে যাবার পর আমরা সবাই উঠলাম গাধা-বোট, ওখানেই মাতালের মতো ঘুমে ঢলে পড়লাম। তারপর যখন কাজানে এসে পৌঁছলাম, বালির তীরে যেন একটা ঘোলাটে কাদার স্রোতের মতো গড়িয়ে নেমে পড়লাম আমরা, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম সরাইখানার দিকে তিন জালা ভদ্‌কা গিলতে।

বাশ্‌কিন চোর এল আমার কাছে, আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল:

‘তোমায় নিয়ে ওরা কী করেছে বলতো?’

দারুণ ফূর্তির সঙ্গে আমি ওকে ঘটনাটা বললাম। শুনল সে, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্যঙ্গের সুরে বলল:

‘বোকা। বোকার চেয়েও হাঁদা। গর্দভ!’

শিস্ দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাছাকাছি-করে-পাতা টেবিলের সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে সে দুলতে দুলতে মাছের মতো চলে গেল। মুটেরা তখন টেবিলে বসে হৈ-হল্লা করে ভোজ লাগিয়ে দিয়েছে। দূরের এক কোণ থেকে মোটা চড়া গলায় কে যেন একটা অশ্লীল গান জুড়ে দিয়েছে:

রাত বারোটা বেজে গেল, নিশুত্ রাতে নাকি
বাগ-বাগিচায় পায়চারি দেয় ভদ্দরলোকের নেকী…

দশ বারোটা গলা একসঙ্গে কান ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল আর সেই সঙ্গে তালে-তালে টেবিলের ওপর শুরু হল হাত চাপড়ানি:

চৌকিদারে উঁকি মারে অন্ধকারে গিয়ে,
দ্যাখে মজার কাজ-কারবার চক্ষু দুটি চেয়ে…'

প্রবল অট্টহাসি আর শিস্। দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল এমন সব খিস্তি-খেউড়ে, উচ্ছৃঙ্খল বিশ্ব-নিন্দার নমুনা হিসাবে যেগুলোর জুড়ি বোধহয় পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আন্দ্রেই দেরেন্‌কভের সঙ্গে কেউ একজন আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দেরেন্‌কভ একটা মুদিখানার মালিক। মুদিখানাটা গরিব পাড়ার সরু একটা শড়কের শেষপ্রান্তে গুটিশুটি মেরে পড়ে আছে। পাশেই আবর্জনা-ভরা একটা খানা।

ছিনে-পড়া হাত, ছোটখাটো মানুষটি দেরেন্‌কভ। মুখটা বেশ সদয়, ফ্যাকাশে দাড়ি দিয়ে ঘেরা, চোখে বুদ্ধির ছাপ। কাজান শহরে দুষ্প্রাপ্য আর নিষিদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে চমৎকার গ্রন্থাগারটি দেরেন্‌কভেরই হাতে। ওর এই সংগ্রহের সদ্ব্যবহার করত শহরের যতো ইস্কুল-কলেজের ছাত্র আর নানা ধরণের বিপ্লবী চরিত্রের মানুষ।

মুদিখানাটা ছিল একটা বাড়ির বাইরের দিকে বাড়িটারই একটা বাড়তি অংশে, বাড়ির মালিক একজন স্কোপেৎস্* সুদখোর মহাজন। দোকান থেকে একটা দরজা পেরিয়েই ওপাশে বড়ো কামরা, জানলা

---

*স্কোপেৎস্—স্কোপেৎস্‌রা হল স্কোপৎসি নামে ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক—এরা মুষ্কচ্ছেদন করে থাকে।

দিয়ে উঠোনের সামান্য আলো আসে ভেতরে। সে ঘরটা থেকে আবার যাওয়া যায় একটা ছোট রান্নাঘরে, রান্নাঘরের ওপাশে দোকানের অংশ আর বাড়ির মাঝখানে যে অন্ধকারময় যাওয়া-আসার ঘরটা, তারই এক কোণে রয়েছে একটা ছোট ভাঁড়ারঘর, সেখানে সেই বে-আইনি গ্রন্থাগারটা। কিছু কিছু বই ছিল মোটামোটা খাতায় হাতে লিখে নকল করা। এমনিভাবে নকল করা হয়েছিল লাভ্‌রোভের 'ঐতিহাসিক পত্রাবলী', চের্নিশেভ্‌স্কির 'কী করিতে হইবে?', পিসারেভের অনেকগুলো প্রবন্ধ, 'ক্ষুধার শাসন' আর 'জটিল কাজের পদ্ধতি'। সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলোই হাতে হাতে জীর্ণ হয়ে ক্ষয়ে গেছে, পড়ে পড়ে প্রায় ছিঁড়ে যাবার অবস্থা।

প্রথম যেদিন দোকানে আসলাম, দেরেন্‌কভ তার খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আমায় শুধু মাথা নেড়ে ভেতরের দরজাটা দেখিয়ে দিল। আধো-অন্ধকার কামরাটার ভেতর ঢুকে দেখি: একজন ছোটখাটো বুড়ো মানুষ এককোণে গৃহদেবতার কলুঙ্গীটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করছে। লোকটিকে দেখে আমার মনে পড়ছিল সারোভের সাধু সেরাফিম'এর একটা ছবির কথা। দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে আমার মনে হল যেন কিছু একটা অন্যায় এই দৃশ্যটার মধ্যে আছে—একটা যেন গরমিলের ব্যাপার রয়েছে।

দেরেন্‌কভের বর্ণনা শুনে আমি তাকে 'নারোদ্‌নিক'* বলেই জানতাম। আমার ধারণায় নারোদনিক মানে বিপ্লবী, আর বিপ্লবী হলে ভগবানে তার বিশ্বাস না থাকাই উচিত। এই বাড়িতে এমন

---

*নারোদ্‌নিক-এরা—রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনের পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতার প্রতিনিধিগণ।

একটি ভগবৎভক্ত বুড়ো মানুষের অস্তিত্ব যেন আমার কাছে নেহাৎই বেমানান ঠেকছিল।

প্রার্থনা শেষ করে লোকটি তার সাদা চুল দাড়ি হাত বুলিয়ে সমান করে আমার দিকে কড়া চোখে চেয়ে বলল:

‘আমি আন্দ্রেইয়ের বাপ। আর তুমি কে? … ও, তাই বল? আমি ভাবলুম বুঝি ছদ্মবেশ-ধরা কোনো ছাত্র।’

‘ছাত্রদের আবার ছদ্মবেশে ঘুরতে হবে কেন?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

নিচু গলায় বুড়ো জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, তা হয় বৈকি। তবে, যতোই লুকিয়ে-ছাপিয়ে চল না কেন, ভগবানের চোখে ধরা পড়ে যাবেই!’

রান্নাঘরে চলে গেল লোকটা। আমি বসলাম জানলার পাশে, একটু বাদেই ডুবে গেলাম ভাবনায়। তারপর হঠাৎ শুনলাম কে যেন অবাক হয়ে বলছে:

‘ও, এই তাহলে সে?’

রান্নাঘরের চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে, পরনে তার আগাগোড়া সাদা পোশাক। মাথার সোনালি চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা আর গোলগাল মুখখানা ফ্যাকাশে। ঘন নীল চোখে যেন একটা হাসির ঝিলিক। মেয়েটিকে দেখতে অনেকটা শস্তা ছাপানো-ছবির পরীর মতো।

‘ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি সত্যিই অমন ভয়ানক দেখতে?’ জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। গলার আওয়াজটা সরু, কাঁপা-কাঁপা। আস্তে, খুব সাবধানে দেয়াল ধরে ধরে সে এগিয়ে এল আমার দিকে

—ওর পায়ের নিচের নিরেট মেঝেটা যেন শূন্যের ওপর টাঙ্গানো একটা দোলায়মান দড়ির মতো। মেয়েটির এই হাঁটতে-না-পারাটাই যেন আরো বেশি করে ওকে অপার্থিব করে তুলেছিল। সমস্ত শারীরটা ওর কাঁপছে, যেন পায়ের তলায় কেউ ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে, যেন ওর বাচ্চা মেয়ের মতো গোলগাল হাতদুটোয় হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে পাশের দেয়ালটা। হাতের আঙুলগুলো অদ্ভুত রকম অসাড়।

ওর সামনে বোবার মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, কেমন যেন অপ্রস্তুত মনে হচ্ছিল নিজেকে, একটা তীব্র সহানুভূতি জেগে উঠছিল মনে। এই আবছা-আঁধার ঘরটার ভেতর সবই যেন কেমন দুনিয়া ছাড়া!

মেয়েটি এমন সাবধানে একটা চেয়ারে এসে বসল যেন ভয় পাচ্ছে পাছে সেটা নিচে থেকে উধাও হয়ে যায়। যতোটা সহজ কেউ কোনোদিন হয় না, তেমনি সহজভাবেই সে আমায় জানাল, আজ মাত্র পাঁচদিন হয়েছে সে হাঁটা চলা শুরু করেছে, এর আগে প্রায় তিন মাস হাত-পাগুলো অকেজো হয়ে তাকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

হাসিমুখে বলল, 'এ এক ধরণের স্নায়বিক রোগ'।

এখন মনে পড়ে, আমি যেন সে সময় ভেবেছিলাম ওর এই অবস্থাটার একটা অন্যরকম যা হোক কিছু ব্যাখ্যা হলেই ভালো হত। স্নায়বিক রোগ—ব্যাপারটা অমন একটি মেয়ের পক্ষে নিতান্তই গদ্যময়, তার ওপর আবার ঘরের সেই অদ্ভুত আবহাওয়ায়, যেখানে সবকিছুই মনে হচ্ছিল যেন ভয়ে ভয়ে দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়িয়েছে। কোণের দিকে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলছিল বিগ্রহের সামনের প্রদীপটা, আর প্রদীপের তামার শেকলের ছায়াগুলো বড়ো ডিনার-টেবিলের সাদা চাদরটার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে যেন বিনা কারণেই খালি দুলছিল আর নড়ছিল।

'তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। ইচ্ছে ছিল তুমি কেমন তা দেখতে হবে', ছেলেমানুষের মতো সরু গলায় সে বলেই চলল।

আমার দিকে মেয়েটি যেভাবে তাকিয়ে রয়েছিল তাতে আমি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম—প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবার মতো। ওর চোখের ওই ঘন নীলের পেছনে এমন কিছু ছিল যা আমায় খুঁটিয়ে যাচাই করে নিচ্ছিল। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জানতামই না কী ভাবে শুরু করব। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখতে লাগলাম দেয়ালের ছবিগুলো—গেরৎসেন, ডারুইন, গ্যারিবল্‌ডির ছবি।

আমার বয়েসী একটি ছেলে দোকান থেকে ভেতরে ঢুকে আবার ভোঁ করে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ছেলেটির মাথার চুল সাদা রঙের, চোখদুটো বেপরোয়া। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কৈশোরোত্তর বয়েসের সরু-মোটা-মেশা গলায় সে বলে গেল:

'এখানে কী করছিস্, মারিয়া?'

মেয়েটি আমায় বলল, 'ওই হল আমার সবচেয়ে ছোট ভাই, আলেক্সেই। এতদিন আমি পড়াশোনা করছিলাম ধাত্রী-বিদ্যালয়ে। তবে অসুখে পড়ে গেলাম এই যা। কিছু বলছ না যে? খুব লজ্জা পাচ্ছ বুঝি?'

আন্দ্রেই দেরেন্‌কভ ভেতরে এল। শুকনো রোগা হাতখানা জামার বুকের নিচে ঢুকিয়ে রেখেছে। বোনের রেশমী চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে সামান্য একটু এলোমেলো করে দিল। তারপর আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল কী ধরণের কাজ আমি খুঁজছি।

ঠিক তখনই ঘরের ভেতর এল একটি পাতলা গড়নের মেয়ে, মাথায়

টকটকে লাল চুল, চোখদুটো সব্‌জে। আমার দিকে কড়া চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপর সাদা পোশাক-পরা মেয়েটির হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল। বলল:

'ব্যস্‌ অনেক হয়েছে, মারিয়া।'

নামটা খায় খাপ না। বড়ো বেশি ভোঁতা ভোঁতা।

অদ্ভুত একটা উত্তেজনা নিয়ে আমিও সেদিন ফিরে গেলাম। দু'দিন বাদে সন্ধ্যের সময় ফের এসে হাজির হলাম এই ঘরটায়। এখানে যারা থাকে তাদের জীবনটা কী ধরণের, সে-জীবনের কী তাৎপর্য হতে পারে তা জানবার জন্য খুবই আগ্রহ হয়েছিল আমার। এখানকার সবই যেন কেমন অদ্ভুত ধরণের।

অমায়িক ভালোমানুষ বুড়ো লোকটির নাম স্তেপান ইভানোভিচ্‌। মাথার চুল সাদা, আর শরীরটা এত ফ্যাকাশে যে চামড়ার তলা অবধি দেখা যায়। ঘরের এক কোণে বসে থাকত সে, সেখান থেকে দেখত আর অল্প অল্প হাসত, কাল্‌চে ঠোঁটদুটো এমনভাবে নাড়ত যেন আবেদন জানিয়ে বলছে, 'রক্ষে করো।'

সবসময়ই লোকটার একটা ভয়, একটা উদ্বিগ্ন দুশ্চিন্তা—এই বুঝি কী বিপদ ঘটবে! সেটা আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম।

ছিনে-পড়া হাত নিয়ে আন্দ্রেই এক-কাত হয়ে পায়চারি করত ঘরের ভেতর। ওর ধূসর রঙের কোর্তাটার বুকের কাছটা ময়দা আর তেল লেগে লেগে একেবারে কট্‌কটে শক্ত হয়ে গিয়েছিল গাছের ছালের মতো। আন্দ্রেইয়ের চলাফেরায় সংকোচভাব আর মুখে এমন একটা কাঁচুমাচু হাসি লেগে থাকত বাচ্চা ছেলেটির মতো যেন নেহাৎ নিরীহ রকমের কোনো দুষ্টুমি করেছে বলে এইমাত্র কেউ তাকে মাফ করে দিয়েছে। দোকানের কাজে ওকে সাহায্য করত অলেক্সেই—ভোঁতা কুঁড়ে ধরণের ছোকরাটি। তৃতীয় ভাই

ইভান — শিক্ষক বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেখানকার ছাত্রাবাসেই থাকত; শুধু ছুটিছাটার সময় বাড়ি আসত সে। ইভান পোশাকে-আশাকে ছিমছাম, পরিপাটি করে চুল-আঁচড়ানো ছোটখাটো মানুষ — দেখলে মনে হত বুঝি কোনো বুড়িয়ে-যাওয়া সরকারী কেরানী। অসুস্থ বোন মারিয়া চিলে-কোঠারই কোথাও থাকত, কালেভদ্রে সাহস করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসত সে। ও নিচে নেমে এলেই আমি অস্বস্তি বোধ করতাম; যেন অদৃশ্য কোনো বাঁধনে আমি বাঁধা পড়ে যাচ্ছি।

দেরেন্‌কভদের বাড়িতে খবরদারি করত একটি লম্বামতো লিকলিকে চেহারার মেয়েমানুষ। মুখখানা তার কাঠের পুতুলের মতো আর চোখের কঠিন দৃষ্টি খিটখিটে মেজাজের মঠবাসিনীর মতো। ওদের স্কোপেৎস্‌ বাড়িওয়ালাটির সঙ্গেই সে থাকত। তার কাজে সাহায্য করত তার লাল-চুলো টিকলো-নাক মেয়েটা, নাস্তিয়া। নাস্তিয়া যখন তার সবুজে চোখজোড়া ফিরিয়ে কোন পুরুষকে দেখত, তখন ওর নাকের ফুটোদুটো কাঁপত।

দেরেন্‌কভদের বাড়ির আসল মালিক ছিল কিন্তু ছাত্ররা — বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ধর্মীয় শিক্ষানিকেতনের ছাত্র, পশু-চিকিৎসার বিদ্যালয়ের ছাত্র একসঙ্গে মিলে হৈ-চৈ করত একদল যুবক—রাশিয়ার মানুষের জন্য তাদের ছিল বুকভরা দরদ, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ওদের ভাবনার অন্ত ছিল না। দিনের খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়ে কিংবা নতুন-পড়া কোনো বইয়ের সিদ্ধান্ত অথবা শহর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ঘটনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা একেক সন্ধ্যেয় ছুটে আসত দেরেন্‌কভের দোকানে। কাজানের সমস্ত পাড়া থেকেই আসত ওরা। প্রচণ্ড তর্কবিতর্কে মেতে উঠত, কিংবা ঘরের কোণে বসে ফিস্‌ফিসিয়ে চুপিচুপি আলোচনা করত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই আনত সঙ্গে, আর উত্তেজিত আঙুলগুলো বইয়ের পাতায় গুঁজে পরস্পরকে সচীৎকারে বোঝাত সবচেয়ে বড়ো কোন্‌ সত্যটির সন্ধান একেকজন পেয়েছে।

ওদের এসব তর্কবিতর্কের অবশ্য বিশেষ কিছু থই পেতাম না আমি। আমার কাছে মনে হত তর্কের সত্যটা বুঝি শব্দের বাহুল্যেই তলিয়ে গেল, ঠিক যেমন গরিবের ঘরের পাতলা-জোলো ঝোলে দৈবাৎ-জুটে-যাওয়া মাংসের টুকরো তলিয়ে যায় তেমনি। কয়েকজন ছাত্রকে দেখে আমার মনে পড়ত ভল্‌গার অঞ্চলে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় দেখেছি তাদের সাদা-দাড়িওয়ালা যুক্তিহীন তত্ত্ববিশারদদের কথা। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝেছিলাম। এখানে আমি এমন একদল মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাদের লক্ষ্য আমাদের জীবনটাকে বদলানো—বদলে আরো উন্নত করা, এদের নিষ্ঠাটুকু অনেক সময় কথার প্লাবনে ভেসে গিয়ে হাবুডুবু খায়, তবু তলিয়ে যায় না একেবারে। ওরা যে-সব সমস্যার সমাধান পেতে চায় আমার কাছে সেগুলো পরিষ্কার, সমস্যাগুলোর সার্থক সমাধানে আমারও যে যথেষ্ট ব্যক্তিগত স্বার্থ আর প্রয়োজন রয়েছে তা আমি অনুভব করতাম। অনেক সময় মনে হত ছাত্রদের এই কথাবার্তায় বুঝি আমারই মনের অব্যক্ত চিন্তাগুলো ভাষা পেয়েছে, এদের আমি বলতে গেলে পূজোই করতাম মনে মনে—যারা মুক্তির প্রতিশ্রুতি আনে তাদের যেমন পূজো করে শৃঙ্খলিত মানুষ।

ওরা আবার ওদের দিক থেকে আমাকে ভাবত অনেকটা একজন ছুতোর-মিস্তিরির মতো যে এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে ভেবেছে বুঝি এমন কিছু বানিয়ে বসবে যা একেবারে নেহাৎ মামুলি কিছু হবে না।

একজন ছাত্র হয়তো আরেকজনের কাছে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলবে, 'সহজাত প্রতিভা'। এমন গর্ব করে বলবে যেন কোনো রাস্তার ছোকরা খানাখন্দের মধ্যে কুড়িয়ে-পাওয়া একটা তামার পয়সা

বুক ফুলিয়ে বন্ধুবান্ধবদের দেখাচ্ছে। আমাকে কেউ 'সহজাত প্রতিভা' বা 'জনতার সন্তান' বলুক এ আমি পছন্দ করতাম না। আমার মনে হত আমি দুয়োরাণীর ছেলে, জীবনের সুখ-সৌভাগ্য আমার জন্য নয়। খেয়াল-খুশিমাফিক এই নতুন প্রেরণাগুলো আমার মনের বিকাশকে যেভাবে চালিত করত তাতে আমার কষ্টটাই বরং একেকসময় অসহ্য হয়ে উঠত। ঠিক এমনিভাবেই একদিন এক বইয়ের দোকানের জানলায় 'প্রবাদবাক্য ও সূত্রমালা' নামে একখানা বই নজরে পড়েছিল। যদিও কথাগুলোর মানে জানতাম না, তবু হঠাৎ দারুণ আগ্রহ হল বইটা পড়ার। ধর্মীয় শিক্ষানিকেতনের এক ছাত্রকে তাই বললাম বইখানার একটা কপি ধার দিতে।

'হুঁ, তারপর?' বিদ্রূপ করে জবাব দিল ভাবী আর্চবিশপ মশাই। ছোকরার মাথাটা ছিল নিগ্রোদের মতো, ঘন কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট আর চকচকে সাদা দাঁত। বলল, 'ও সব বাজে জিনিস, ভাই। তার চেয়ে তোমায় যা পড়তে দেওয়া হয় তাই পড়ো, যা তোমার সাজে না তাতে নাক গলাতে যাওয়া কেন বাপু!'

শিক্ষকের এই রূঢ় ভাষায় মনে বড়ো আঘাত পেয়েছিলাম আমি। জাহাজঘাটায় কিছু পয়সা রোজগার করে আর বাদবাকিটা দেরেনকভের কাছ থেকে ধার করে বইটা অবশ্য কিনে ফেলেছিলাম। এখনও রয়েছে আমার কাছে—গূঢ় বিষয় নিয়ে লেখা আমার কেনা ওইটেই প্রথম বই।

মোটের ওপর আমার সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার করা হত তা বেশ কঠিনই বলতে হবে। 'সমাজ বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ' বইটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল সভ্যতার বিকাশে আদিম রাখালের 'গোষ্ঠীর

অবদানটা যেন বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলেছেন গ্রন্থকার, আর সে তুলনায় উদ্যোগী শিকারী পর্যটকদের অন্যায়ভাবে খাটো করে দেখিয়েছেন। আমারই একজন শিক্ষাগুরুকে গিয়ে মনের কথাটা খুলে বললাম। সে ভাষাতত্ত্বের ছাত্র। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের মেয়েলি চেহারাটার মধ্যে কঠিন একটা অ-পছন্দের ভাব বজায় রেখে সে আমায় 'সমালোচনার অধিকার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিলো।

'সমালোচনার অধিকার পেতে হলে বিশেষ একটা তত্ত্বে বিশ্বাস থাকা চাই। কোন্ তত্ত্বে তোমার বিশ্বাস আছে শুনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

এ ছাত্রটি হরদমই বই পড়ত—এমন কি রাস্তায়ও। অনেক সময় তাকে দেখতাম রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে বইয়ের ভেতর মাথাটি গুঁজে, সামনে যারা পড়ছে তাদের সঙ্গে ধাক্কাও খাচ্ছে। চিলে-কোঠার ঘরে শুয়ে টাইফাসের খিদে-জ্বরে ছট্‌ফট্ করতে করতে সে প্রলাপ বকে:

'নীতিশাস্ত্রের উচিত স্বাধীনতা আর জবরদস্তির মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করা—সমন্বয়—সম্-সম্-সমন্...'

নরম সরম মানুষ নিয়মিত না খেয়ে-খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, স্থায়ী সত্যের পেছনে ক্রমাগত ছুটে কাহিল হয়ে গেছে সে। কেতাব-পড়া ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো আনন্দের খবর রাখে না। যখন ওর নিজের ধারণা হয় দু'জন বড়ো দার্শনিকের দুটি বিরুদ্ধমতকে ও এক জায়গায় মেলাতে পেরেছে তখন ওর কোমল কালো চোখজোড়া যেন শিশুর মতো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাজানে ওর সঙ্গে আমার পরিচর হবার প্রায় বছর দশেক পর আবার খারকভে দেখা হয়েছিল আমাদের। কেম্ শহরে পাঁচবছর নির্বাসনে থেকে তারপর খারকভে এসে ও আবার নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শুরু

করেছিল। নানা মতবৈষম্যে-ভরা একটা উইয়ের ঢিবির ভেতর বাস করছে—এমনি এক মানুষ বলেই ওকে আমি মনে করতাম। টি-বি রোগে যখন ও সাংঘাতিক রকম অসুস্থ, রক্ত বমি করছে, তখনও চেষ্টা করত নীট্শের সঙ্গে মার্কসকে মেলাতে। ঘামে-ভেজা চট্‌চটে হাতদুটো দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে ও ফিস্‌ফিস্ করে বলত:

'সমন্বয় ছাড়া জীবনটাই যে অচল!'

একটা ট্রামগাড়িতে ওর মৃত্যু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময়।

বিচারশক্তি জন্য এ-রকম বহু শহীদের দেখা আমি পেয়েছি। তাদের স্মৃতিকে আমি পবিত্র বলে মনে করি।

দেরেন্‌কভের দোকানে এমনি ধরণের আরও কুড়ি বাইশটি প্রাণী এসে জুটত। ওদের মধ্যে একজন জাপানী পর্যন্ত ছিল। তার নাম পান্তেলেইমন সাতো, ধর্মীয় শিক্ষানিকেতনের ছাত্র। মাঝেমাঝেই এই বৈঠকগুলোকে দেখতাম এক বিরাট চেহারার বুক-চওড়া লোক, তাতারী কায়দায় তার মাথার চুল কামানো, আর প্রকাণ্ড গাল-ভরা দাড়ি। ধূসর লম্বা কোটের ভিতর মনে হত তাকে যেন সেলাই করে রাখা হয়েছে। কোটের হুকগুলো সে একেবারে থুতনি পর্যন্ত এঁটে রাখত। সাধারণত ঘরের একটি কোণে একা বসে ছোটো নলচেওয়ালা পাইপের ধোঁয়া ছাড়ত সে আর কামরার ভেতরের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত ধীর, চিন্তিত, ধূসর চোখজোড়া ফিরিয়ে। লোকটির সন্ধানী সমনোযোগ দৃষ্টি এসে বার বার স্থির হয়ে পড়ত আমার মুখের ওপর। মনে হত যেন গভীর অভিনিবেশে সে আমার ওজনটা বুঝে নিচ্ছে। কেন যেন আমার ভয় হত লোকটাকে। ওর ওই নীরবতাটাই যেন আমার কাছে ধাঁধার মতো। অন্যরা সবাই কিন্তু চেঁচিয়ে, বক্‌বক্ করে, যা বলার তা নিশ্চিত বলত। আর মন্তব্যগুলো যতো বেশি ক্ষুরধার হত

ততোই আমার অবশ্য ভালো লাগত। তারপর অনেকদিন বাদে বুঝতে শুরু করেছিলাম তীব্র কথাগুলো মনের ইতরামি আর ভণ্ডামিকে চাপা দেবার জন্য নেহাৎই একটা বাহ্যিক আবরণ। দাড়িওয়ালা এই দৈত্যটার নীরবতার পেছনে কী ছিল তাহলে?

সবাই তাকে ডাকত 'খখল' বলে। আমার ধারণা, আন্দ্রেই ছাড়া আর কেউ ওর আসল নামটা জানত না। কিছুদিন বাদেই আবিষ্কার করলাম ভদ্রলোক দশ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে সদ্য ফিরেছে ইয়াকুৎস্ক অঞ্চল থেকে। এতে আমার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেল ওর সম্পর্কে, কিন্তু ওর সঙ্গে পরিচয় করার সাহস জোগাল না মনে। তবু যে লজ্জা কিংবা সাহসের অভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছিল তা নয়। উল্টে বরং একটা উদ্‌গ্রীব, অশান্ত কৌতূহলই আমাকে পেয়ে বসেছিল — সবকিছু জানতে হবে যথা সম্ভব শীঘ্রই এমনি একটা উদগ্র আকাঙ্খা: এই আমার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যা একইসময়ে শুধু একটি জিনিস নিয়েই গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আমায় চিরজীবন বাধা দিয়ে এসেছে।

সাধারণ মানুষ নিয়ে ওরা যখন কথা বলত আমি অবাক হয়ে শুনতাম, আমার নিজস্ব ধারণাগুলো সম্পর্কে ভরসা পেতাম না, কিন্তু তবু মনে হত এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে ওদের সঙ্গে আমার চিন্তাধারার মিল হতে পারে না। ওদের চোখে সাধারণ মানুষ হল প্রজ্ঞা, উদারতা আর আত্মিক সৌন্দর্যের মূর্তিমান প্রতিরূপ, এমন একটা প্রতিমূর্তি যা প্রায় দেবোচিত, যা-কিছু মহৎ, ন্যায্য আর মহিমামণ্ডিত তার উৎস হল সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমি তো মানুষকে এমন চোখে দেখিনি। আমি আমার আশেপাশে দেখেছি ছুতোর-মিস্তিরি, মুটে আর ইমারত-মিস্তিরিদের, আমি চিনতাম ইয়াকভ, অসিপ আর

গ্রিগরিকে। কিন্তু এখানে এমনভাবে আলোচনা হয় যেন সাধারণ মানুষ একটা সামগ্রিক সমষ্টি। এই জনতার একেবারে পেছনের সারিতে নিজেদের বসায় এরা, জনতার ইচ্ছাধীন বলে মনে করে নিজেদের। আমার কিন্তু মনে হত সবটুকু সৌন্দর্য আর সবটুকু শক্তি ঠিক এই ক-জনের ভাবনার ভেতরেই মূর্তরূপ পেয়েছে; এরা আপনার মধ্যে সংহত করেছে, বুকের ভেতর জ্বালিয়ে রেখেছে বাঁচবার একটা উষ্ণ হিতকর বাসনা, মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোন নয়া-কানুনের অনুসারে স্বাধীনভাবে জীবনটাকে গড়ে তুলবার বাসনা।

এর আগে আমি যে নিকৃষ্ট জীবগুলোর ভেতর কাটিয়েছি তাদের মধ্যে কখন মানুষের প্রতি এ ভালোবাসা আমার চোখে পড়েনি। অথচ এখানে প্রত্যেকটা কথার ভেতর তারই ধ্বনি বাজে, প্রত্যেকটা চাহনির ভেতর দেখি তারই ঔজ্জ্বল্য।

গণদেবতার পূজারীদের এইসব কথাবার্তা আমার প্রাণে যেন বর্ষার তাজা জলধারার মতো নেমে আসত। পল্লী অঞ্চলের আঁধার-মলিন জীবন আর শহীদ-চাষীদের নিয়ে লেখা সাদাসিধে সরল সাহিত্য পড়ে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। জীবনের সত্যিকারের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া ও উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় প্রেরণা আসতে পারে শুধু মানুষের প্রতি গভীর দরদ আর বুকভরা ভালোবাসা থেকেই—এ আমি বুঝেছিলাম। নিজের সম্পর্কে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি আর পাঁচজনের প্রতি বেশী মনোযোগী হলাম।

আন্দ্রেই দেরেন্‌কভ আমায় বিশ্বাস করে বুঝিয়ে বলেছিল যে ওর দোকান থেকে যা সামান্য আয় হয় তার সবটাই খরচা হয় 'সবার উপরে মানুষের কল্যাণ' এই মতে যারা বিশ্বাসী তাদের

সাহায্যের জন্য। ওদের আড্ডায় থাকলে আন্দ্রেই এমনভাবে চলাফেরা করত যেন আর্চবিশপের ধর্মালোচনায় সে একজন খাঁটি ধার্মিক ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নিয়েছে। বইয়ের-পোকা এই মানুষগুলোর সদা-সচেতন বিদ্যাবুদ্ধির সে খোলাখুলিই তারিফ করত। কোর্তার বুকের নিচে ছিনে-পড়া হাতখানা ঢুকিয়ে, খুশির হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত করে সে তার অন্য হাতে রেশমী দাড়ি নেড়ে আমায় জিজ্ঞেস করত:

'বেড়ে বলেছে কিন্তু, না? এবার বেশ বলেছে!'

আবার পশু-চিকিৎসার বিদ্যালয়ের ছাত্র লাভ্‌রোভ যখন তার অদ্ভুত ধরণের রাজহাঁসের মতো গলায় নারোদ্‌নিকদের আক্রমণ করে ধর্মবিরোধী তর্ক জমাত, দেরেন্‌কভ তখন শুধু চোখদুটো নামিয়ে ভয়ে ভয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলত:

'দেখেছ কেমন হল্লাবাজ ঝগড়াটে!'

নারোদ্‌নিকদের সম্পর্কে দেরেন্‌কভের আচরণ অনেকটা আমারই মতো ছিল। কিন্তু ওর ওপর ছাত্রদের ব্যবহারটা যেন একটু রূঢ় আর বিবেচনা-রহিত বলে মনে হত আমার—বড়োলোকেরা তাদের চাকরের সঙ্গে, কিংবা সরাইখানার চাপরাশীদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে অনেকটা তেমনি। দেরেন্‌কভ নিজে কিন্তু লক্ষ্য করত না এসব। অতিথিরা চলে যাবার পর প্রায়ই সে আমাকে বলত রাতে তার সঙ্গে ওখানেই থাকতে। ঘরটা ফের গোছগাছ করে নিয়ে আমরা মেঝেয় ফেল্টের মাদুর বিছিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তাম। তারপর অনেক রাত অবধি জেগে ফিস্‌ফিস্ করে বন্ধুর মতো গল্প করতাম। ঘরের কোণে বিগ্রহের প্রদীপ থেকে যে মিটমিটে আলো ছড়িয়ে পড়ত তাতে আমাদের আশেপাশের অন্ধকার খুব সামান্যই ঘুচত। বিশ্বাস খাঁটি হলে মনে যে অচঞ্চল আনন্দ হয় তেমনি আনন্দের সঙ্গে দেরেন্‌কভ আমায় বলত:

'এক সময় এমনি ধরণের ভালমানুষ আমরা শ-য়ে শ-য়ে, হাজারে হাজারে পাব। সারা রাশিয়ায় সমস্ত সেরা-সেরা পদগুলো তারা দখল করবে, তারপর দেখতে দেখতে তারা আমাদের গোটা জীবনই দেবে পাল্টে।'

আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো এই মানুষটা যে লালচুলো নাস্তিয়ার প্রতি খুবই আসক্ত তা আমি ধরতে পেরেছিলাম। মেয়েটির উত্ত্যক্তকারী চোখদুটোর দিকে না তাকাবার চেষ্টাই করত সে, আর চাকরের সঙ্গে মালিক যেভাবে কথা বলে অন্য সকলের সামনে তেমনি শুকনো গলায় খবরদারির সুরে কথা বলত নাস্তিয়ার সঙ্গে। কিন্তু পেছন থেকে ওকে লক্ষ্য করে যেত কামনা-ব্যাকুল চোখে। আর যখন ওকে একা পেত তখন অস্থিরভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মুখে একটা ভীরু, ক্ষমা-চাওয়ার হাসি নিয়ে কথা বলত ওর সঙ্গে।

দেরেন্‌কভের ছোট বোনটিও ঘরের এক কোণে বসে অতিথিদের বাগ্‌বিতণ্ডা লক্ষ্য করত। মন দিয়ে শুনবার চেষ্টায় চোখদুটো বড়ো-বড়ো করে, ছেলেমানুষী মুখখানা বেশ মজা করে বাড়িয়ে ধরে রাখত। যখন একটু বেশি রকমের তীব্র কথা বলা হত, তখন ও চট্‌ করে সজোরে নিশ্বাস টানত, যেন হঠাৎ কেউ ওর গায়ে বরফ জল ছিটিয়ে দিয়েছে। হল্‌দে রঙের চুলওয়ালা একজন মেডিক্যাল ছাত্র ছিল। সে ওর কোণের দিকটায় এসে গম্ভীর জোয়ান মোরগের চালে পায়চারি করতে ভালোবাসত। যখন ওর সঙ্গে কথা বলত তখন গলার স্বরটা নামিয়ে আনত রহস্যময় একটা আধা-ফিস্‌ফিসানির স্তরে, আর ভারিক্কি চালে ভুরুদুটো কোঁচকাত। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল ভারি কৌতূহলোদ্দীপক।

কিন্তু—শরৎকাল এসে পড়ছে, স্থায়ী একটা চাকরি-বাকরি না পেলে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হবে। যে-সব নতুন নতুন আকর্ষণের সন্ধান পাচ্ছি তাতেই মশগুল হয়ে যাবার ফলে আমার উপার্জনও দিন দিন কমতে লাগল, রোজকার আহারটুকুর জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হলাম, আর অন্যের দেওয়া অন্ন গলা দিয়ে নামানোই বড়ো কঠিন। শীতটা কাটাবার মতো একটা 'আস্তানা' আমাকে খুঁজে নিতেই হবে এই সময়। ভাসিলি সেমিয়নভের রুটির কারখানায় ঠিক এমনি ধরণের একটা আস্তানা পেয়ে গেলাম।

আমার জীবনের এই অধ্যায়টার রূপরেখা আমি 'মনিব', 'কনোভালভ্', 'ছাব্বিশ আর এক' গল্পগুলোর মারফত দিয়েছি। কী বিশ্রী যে একটা সময় গিয়েছিল! তবে হ্যাঁ, শিখবার মতোও অনেক কিছু পেয়েছি তখন।

শরীরের দিক থেকে বড়ো বিশ্রী সময় গেছে সেটা, মনের দিক থেকে আরো খারাপ।

রুটির কারখানার নিচু তলা-কুঠরিতে গিয়ে যেদিন ঢুকলাম সেদিনই একটা 'বিস্মৃতির দেয়াল' মাথা তুলল আমার এবং এই মানুষদের মাঝখানে—সাহচর্য আর সহায়তার প্রয়োজন আমার কাছে তখনই বেশি জরুরি হয়ে পড়েছিল। রুটির কারখানায় ওরা কেউই আসত না দেখা করতে। হপ্তা-দিনগুলোয় চোদ্দ ঘণ্টা করে খাটবার পর আর দেরেন্কভদের ওখানে যেতে পারতাম না, আর ছুটির দিনে হয় ঘুমোতাম নয়তো কারখানার সাথীদের সঙ্গেই কাটিয়ে দিতাম। ওদের মধ্যে কেউ কেউ চট্পট্ আমায় ধরে নিল মজাদার একটি ভাঁড়-বিশেষ বলে, আর বাকিরা সবাই এমন সরল অকপটভাবে আমায় ভালোবাসল, যে-ভালোবাসা একমাত্র শিশুরাই দেখায় ওদের যারা মন-ভোলানো গল্প

শোনাতে পারে তাদের। ওদের শোনাবার মতো কী আমি খুঁজে পেতাম তা ভগবানই জানেন, তবে একটা আশা আমি ওদের মধ্যে প্রাণপণে জাগাতে চেষ্টা করতাম—সে আশা অন্য এক জীবনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে—সে জীবন হবে ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ, সে জীবনের একটা সার্থকতা আর তাৎপর্য থাকবে। মাঝেমাঝে আমি সফলও হয়েছি, ওদের থল্‌থলে মুখগুলোর মধ্যে সহৃদয় বিষণ্নতার আমেজ ফুটে উঠতে দেখে, চোখে বিরক্তিবোধ আর ক্রোধের বহ্নি-জ্বালা দেখে আমি উদ্বেল হয়ে উঠেছি এক গর্ব-ভরা আনন্দে—আমিও তাহলে 'কাজ করছি জনতার মধ্যে', তাদের 'আলোক দান' করছি!

বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য নিজেকে মনে হত ঠুঁটো, খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হত, জ্ঞানের অভাব ছিল আমার, বাস্তব জীবন আর আমাদের আশেপাশের পৃথিবী সম্পর্কে অত্যন্ত মামুলি প্রশ্নেরও জবাব দিতে আমি হিমসিম খেয়ে যেতাম। সে সময়ে আমার মনে হত যেন একটা অন্ধকার গহ্বরের ভেতর গিয়ে আমি পড়েছি, মানুষ সেখানে অন্ধ কৃমিকীটের মতো পথ হাতড়াচ্ছে—কেবল চেষ্টা করছে বাস্তবকে ভুলে থাকতে, আর সে বিস্মৃতিকে তারা খুঁজে পাচ্ছে মদের নেশা আর গণিকার শীতল আলিঙ্গনের মধ্যে।

বেশ্যাপল্লীতে ঢুঁ মারা ওদের একটা দস্তুর—প্রত্যেক মাসের মাইনের দিনটায় এর আর ব্যতিক্রম নেই। সে শুভদিনটির আগে পুরো এক হপ্তা ধরে ওরা ফূর্তির স্বপ্ন দেখবে স-রব অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে, তারপর, সেদিনটা কেটে যাবার পর পরস্পরের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করবে কার কী আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়েছে। এ সব আলাপ-আলোচনায় ওরা নিজেদের যৌন শক্তি নিয়ে অশ্লীল গর্ব করে,

মেয়েদের নিয়ে রূঢ় ইয়ার্কি বিদ্রূপ করে, আর তাদের কথা বলতে গিয়ে বিরক্তিভরে থুতু ছিটোয়।

কিন্তু তবু যেন আশ্চর্য এক ব্যাপার! এসবের আড়ালেও আমি শুনি দুঃখ আর ধিক্কার, কিংবা হয়তো শুনি বলে আমার ধারণা হয়। বারাঙ্গনীদের 'সান্ত্বনা-গৃহে' এক রুবলের বিনিময়ে সারা রাতের জন্য একটি মেয়েকে কেনা চলে, অথচ তবু দেখতাম সেখানে আমার সঙ্গীরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, নিজেদের অপরাধী মনে করে, আমার কাছে অবশ্য সেটা খুব স্বাভাবিকই মনে হত। কেউ কেউ আবার বেশিরকম বেপরোয়াভাব দেখাত, এমনভাবে বড়াই করত যে আন্দাজ করতে পারতাম সেটা নেহাৎই মেকি, ইচ্ছে করে রঙ চড়ানো। পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের ব্যাপারে আমার আগ্রহ সুতীব্র, তাই গভীরতর অন্তদৃষ্টি দিয়ে এসব আমি লক্ষ্য করে যেতাম। নারীর আলিঙ্গনের আস্বাদ আমি তখনো পাইনি, আর ক্রমাগত সংযম রক্ষা করে চলার ফলে বিশ্রী একটা বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলাম। আমায় বিদ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপে আপ্যায়িত করত আমার সঙ্গীরা আর সেই সঙ্গে মেয়েরাও। কিছুদিন বাদে বন্ধুরা আমায় 'সান্ত্বনা-গৃহগুলোতে' ডেকে নিয়ে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। মুখের ওপর ওরা আমায় শুনিয়ে দিল:

'আমাদের সঙ্গে তোমার না আসাই ভালো, ভাই।'

'কেন?'

'কারণ—তুমি কাছে থাকলে আমাদের ফূর্তিই জমে না।'

সাগ্রহে লুফে নিলাম কথাগুলো, বুঝলাম ওরা তাহলে সত্যিই খানিকটা গুরুত্ব দিয়েছে আমাকে, কিন্তু এর চেয়ে পরিষ্কার কোনো কৈফিয়ত আমি আদায় করতে পারিনি।

'কী মানুষ তুমি, অ্যাঁ? একবার তো বললুম আমাদের সঙ্গে এসো না। তুমি কাছে থাকলে বড়ো পান্‌সে হয়ে যায়…'

বাঁকা হাসি হেসে শুধু আর্তেমই মন্তব্য করে:

'মনে হয় যেন স্বয়ং পুরুত ঠাকুর এসে হাজির হয়েছেন, কিংবা কারুর নিজের বাপ।'

আমি সামলে চলতাম বলে মেয়েগুলো প্রথম প্রথম আমায় ঠাট্টা করত। শেষের দিকে চটে গিয়ে বলত:

'তুমি ভাবো তুমি এতই ভালো যে আমরা তোমার যুগ্যিই নই?'

চল্লিশ বছরের 'যুবতী' তেরেসা বরুতা, মোটাসোটা পোলীয় স্ত্রীলোক, দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এ প্রতিষ্ঠানের সে-ই ছিল 'পরিচালিকা'। খাঁটি কুলীন কুকুরের মতো চতুর চোখে আমাকে লক্ষ্য করে সে বলত:

'আরে ছুঁড়িগুলো, ওকে তোরা দিক্ করিস্‌নি। ওর নিশ্চয় পিরিতের লোক রয়েছে। তাই না রে? ওর মতো সোন্দর জোয়ান ছোকরা—নিশ্চয় কোনো মনের-মানুষ ওকে বশে রেখেছে। তা ছাড়া কি বল্?'

ভয়ানক মদের নেশা তার, মাঝেমাঝে হন্যে হয়ে মাতলামি শুরু করত। মাতাল অবস্থায় তাকে দেখলে এত গা ঘিন্ ঘিন্ করত যে আর বলা যায় না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে অন্য মানুষ সম্পর্কে তার সুচিন্তিত আচরণ, তাদের কাজ-কর্মের যুক্তি খুঁজে পাবার জন্য তার ধীর শান্ত প্রয়াস দেখে আমি তো অবাক হয়ে যেতাম।

আমার সঙ্গীদের সে বলত, 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হল অ্যাকাডেমির ছাত্রগুলোকে বোঝা। সত্যিই তাই। মেয়েদের নিয়ে ওরা কী না

করে। মেঝেতে সাবান মাখিয়ে নেয়, তারপর ন্যাংটো করে চীনেমাটির বাসনে তাদের চার হাত-পা রেখে হামা দিয়ে বসায়, তারপর পেছন থেকে মারে ধাক্কা—দ্যাখে কদ্দূর গড়িয়ে যায়। এইভাবে একটার পর একটা মেয়েকে নিয়ে এই কাণ্ড করে। সত্যি বলছি। কেন করে?'

'বাজে কথা বলছ!' আমি তাকে বলি।

'আরে না, না, বাজে নয়!' তেরেসা শান্তভাবে ঠাণ্ডা মেজাজে বলে ওঠে, আর তার এই ধীরস্থির ভাবের মধ্যে এমন কিছু থাকে যা মনটাকে ভয়ানক দমিয়ে দেয়।

'এ তুমি বানিয়ে বলছ!'

'মেয়ে হয়ে কী করে বানাব এসব কথা? নাকি ভেবেছ আমি পাগল হয়ে গিয়েছি?' চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে।

লুব্ধ আগ্রহে সবাই কান পেতে শুনছে আমাদের তর্কবিতর্ক। তেরেসা বলেই চলেছে। অতিথিদের নানা কেরামতির বর্ণনা দিচ্ছে সে আবেগশূন্য ভাষায়—যেন একটি বিষয়েরই সে সন্ধান করছে—চাইছে বুঝতে: কেন এমনটা হয়?

শ্রোতারা ঘেন্নায় থুতু ছিটোয়, বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দেয় ছাত্রদের। কিন্তু আমি—আমি শুধু এটাই দেখতে পাচ্ছি যে তেরেসা আমাদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে—যাদের আমি মনে-প্রাণে ভালোবাসতে শিখেছি তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা জাগিয়ে তুলছে। আমি তাই জবাবে বলি, ছাত্ররা মানুষদের ভালোবাসে, জনসাধারণের মঙ্গলই চায় ওরা।

'ওরা তো হল ভস্ক্রেসেন্স্কায়া স্ট্রীটের ছাত্র—মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে, সাধারণ লোক। আমি বলছি যাদের কথা তারা আরস্কোয়ে

মাঠের ধর্মীয় শিক্ষানিকেতনের ছাত্র। ওরা গির্জের ছাত্র, সবাই বাপ-মা-মরা ছেলে। আর বাপ-মা না থাকলে যা হয়—প্রত্যেকেই বড়ো হয়ে চোর কিংবা বজ্জাত হবেই—বদ হবার জন্যই বড়ো হয়। আর সাতকূলে কেউ নেই তো, তাই কোনো কিছুর মায়াও নেই ওদের।'

তেরেসার নির্বিকার মেজাজে বলা গল্প শুনে, আর ছাত্র, সরকারী-কেরানী আর মোটামুটি সমস্ত 'ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকদের' সম্পর্কেই মেয়েদের ক্রদ্ধ নালিশ শুনে আমার সঙ্গীদের মনে ঘৃণা আর শত্রুতা ছাড়াও আরেকটা অনুভূতি জাগত যেটা প্রায় আনন্দেরই কাছাকাছি। অনুভূতিটাকে প্রকাশ করত তারা এইভাবে:

'ও, লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকরা তা হলে আমাদের চেয়েও খারাপ!'

এসব কথা শুনলে আমার কষ্ট হত, তিক্ত হয়ে উঠত মন। আমার চোখে পড়তে লাগল এই ছোট ছোট অন্ধকার এঁদো নর্দমার মতো খুপরিগুলোর ভেতর যেন শহরের যতো ময়লা চুঁইয়ে এসে পড়ে আর দুর্গন্ধ কালি-ওঠা আগুনের তাপে তা ঘৃণা আর বিদ্বেষের বিষাক্ত বাষ্প হয়ে ফের উড়ে যায় শহরের দিকেই। ঘুপ্‌সি কোটরগুলোর ভেতর মানুষ আসত জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায়, জীবনের একঘেয়েমি সইতে না পেরে। তবু কিন্তু দেখতাম বেখাপ্পা লব্‌জগুলোকে রূপান্তরিত করে কী মর্মস্পর্শী সব গান তৈরি হত এখানে—প্রেমের যাতনা আর দুঃখবেদনা নিয়ে; দেখতাম, 'শিক্ষিত ভদ্রলোকদের' জীবন সম্পর্কে কদর্য কাহিনীর জন্ম; যা বুঝতে পারা যায় না তার সম্পর্কে মনে বিদ্রূপ আর বিরোধিতার বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা ব্যাপার: 'সান্ত্বনা-গৃহগুলো'ও আসলে

একরকমের বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আমার সঙ্গীরা ভয়ানক বিষাক্ত ধরণের শিক্ষা পেয়ে থাকে।

'প্রমোদ-সঙ্গিনীদের' দেখতাম নোংরা মেঝের ওপর দিয়ে অলসভাবে হাঁটাচলা করতে, অ্যাকর্ডিয়নের গোঙানির তাগিদে কিংবা জরাজীর্ণ পিয়ানোর পীড়াদায়ক ঝন্‌ঝনানি আর টুংটাংএর তালে তাদের থল্‌থলে দেহগুলো বিশ্রীভাবে কেঁপে কেঁপে উঠত। আর এইসব দেখতে দেখতে আমার মনে নানা সব অস্পষ্ট, অথচ বিষণ্ন চিন্তা উঁকি দিত। আশেপাশের সবকিছুর ভেতর থেকেই যেন একটা একঘেয়েমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখান থেকে পালিয়ে যাবার একটা অক্ষম বাসনা মেজাজটাকেই বিষাক্ত করে তোলে যেন।

রুটির কারখানার বসে যখন মুক্তির পথ আর মানুষের সুখের সন্ধানে যারা আত্মনিয়োগ করেছে তাদের কথা বলতে শুরু করতাম তখন জবাব আসত:

'ও, কিন্তু মেয়েগুলো যে ওদের নিয়ে অন্যরকম কেচ্ছা শোনায় গো!'

ক্রুদ্ধ নির্লজ্জার সঙ্গে আমায় ওরা নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করত। কিন্তু আমি হলাম বাগ-না-মানা বাচ্চা কুকুর, আমি বুঝতাম যে বুড়োঘাগী ওই জানোয়ারগুলোর চেয়ে আমার জ্ঞান তো কম নয়ই, সাহসও অনেক বেশি। তাই আমিও পাল্টা মেজাজ দেখিয়ে দিতাম। এটুকু আমি উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলাম যে জীবন যতটা কঠিন, জীবনের ভাবনাও তার চেয়ে কম কঠিন নয়; একেক সময় আমার কাজের সঙ্গী এই একবগ্‌গা ধৈর্যশীল লোকগুলোর ওপর তো আমার ভয়ানক ঘেন্নাই ধরে যেত। সবচেয়ে অসহ্য লাগত তাদের ওই মুখ-

বোজা ধৈর্যের বহর দেখে; যেভাবে হাল-ছাড়া গা-সহা-ভাবে ওরা আমাদের মাতাল মনিবটার আধা-উন্মত্ত অপমানগুলো হজম করে যেত তাতে আমি খেপেই উঠতাম।

আর—যা হবার তাই হয়তো হল! ঠিক এমনি এক কঠিন সময়ে এমন একটা ভাবধারার সঙ্গে আমার সংযোগ হল যা আমার কাছে একেবারেই নতুন: সে ভাবধারা যদিও আমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী তবু যেন আমাকে তা ভয়ানকভাবে নাড়া দিয়ে গেল।

ওই ধরণের এক ঝড়ের রাতে ধূসর আকাশটা যেন গুড়িয়ে ওঠা পাগলা হাওয়ার দাপটে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন গোটা আকাশটাই ঝিরঝির করে নেমে আসছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়ো বরফের গাদার নিচে পৃথিবীটাকে ডুবিয়ে দিতে; এ গ্রহের আয়ু যেন ফুরিয়ে আসছে, আর সূর্যটা নিভে গিয়ে আর বুঝি কোনোদিনও আকাশে উঠবে না। শ্রোভ্‌টাইড্‌ উৎসবের এমনি এক রাতে আমি দেরেন্‌কভদের ওখান থেকে বেরিয়ে আমার রুটির কারখানার আস্তানার দিকে চলেছি। মুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগছে। চোখ বুজে এগিয়ে চলেছি ধোঁয়াটে, ঘোলাটে, ছন্নছাড়া কুম্ভীপাকের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। বরফের মধ্যে ঠিক হাঁটা-পথটার আড়াআড়ি শুয়ে এক ভদ্রলোক, তাঁরই গায়ে আমার পা বেধে গিয়েছিল। আমরা দুজনেই একসঙ্গে গালাগাল দিয়ে উঠলাম, 'দূর শয়তান!' আমি বললাম রুশ ভাষায়, উনি বললেন ফরাসীতে।

ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকল আমার কাছে। ভদ্রলোককে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলাম—ছোটখাটো মানুষ, শরীরে ওজনও নেই তেমন। আমাকে ধাক্কা দিয়ে রেগে চেঁচিয়ে বললেন:

'আমার টুপিটা, এই হতভাগা! আমার টুপি ফিরিয়ে দে! ঠাণ্ডায় জমে যাব!'

বরফের মধ্যে খুঁজে পেলাম তাঁর টুপি, ঝেড়ে সাফ করে তাঁর উস্‌কোখুস্‌কো চুলওয়ালা মাথাটার ওপর দিলাম সেটাকে বসিয়ে। কিন্তু উনি সেটাকে টেনে খুলে ফেলে শূন্যে নাড়তে লাগলেন আর দুটো ভাষাতেই গালিগালাজ করে আমায় ধমকাতে লাগলেন:

'সরে পড় এখান থেকে!'

সঙ্গে সঙ্গে উনি ছুটে চললেন সামনের দিকে, এলোমেলো বরফ হাওয়ার ভেতর কোথায় মিলিয়ে গেলেন যেন। কিন্তু একটু বাদেই ফের তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল রাস্তার ধারে একটা নিভে-যাওয়া বাতির নিচে। বাতির কাঠের-খাম্বাটা জড়িয়ে ধরে উনি তখন ব্যগ্রভাবে বলছিলেন:

'লেনা, আমি মরে যাচ্ছি··· লেনা গো!'

বোঝা যাচ্ছিল ভদ্রলোক মাতাল। যদি ওঁকে রাস্তায় ফেলে চলে যেতাম তাহলে খুব সম্ভব উনি ঠাণ্ডায় জমেই যেতেন। জিজ্ঞেস করলাম, উনি কোথায় থাকেন।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'এ রাস্তাটার নাম কী? কোন্ পথে যাব জানি না।'

আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চললাম, ফের জিজ্ঞেস করলাম কোথায় থাকেন উনি।

কাঁপতে কাঁপতে বিড়বিড় করে বললেন, 'বুলাক্··· বুলাক্ স্ট্রীটে··· একটা স্নানঘর আছে সেখানে··· একটা ঘর···'

এলোপাথাড়ি পা ফেলে ফেলে কখনো হোঁচট খেয়ে কখনো কাত

হয়ে চলছিলেন ভদ্রলোক, আমারই তাতে হাঁটতে বড়ো অসুবিধ হচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম তাঁর দাঁতগুলো ঠক্‌ঠক্‌ করছে।

আমাকে গুঁতো দিয়ে উনি বিড়বিড় করে বললেন, 'সি তু সাভাই!'*

'বুঝলাম না।'

থেমে পড়ে হাতটা তুলে উনি পরিষ্কার করে উচ্চারণ করলেন—মনে হল খানিকটা গর্বের সঙ্গেই যেন:

'সি তু সাভাই উ জে তে মে-ন্‌…'**

মুখে আঙুল পুরে দিলেন উনি, টলতে টলতে প্রায় পড়ে যাবার জোগাড়। হাঁটু গেড়ে বসে আমি তাঁকে পিঠের ওপর তুলে নিলাম। টেনে নিয়ে চলেছি, এর মধ্যে আবার উনি বিড়বিড়িয়ে উঠলেন আমার মাথার ওপর তাঁর থুতনিটা চেপে ধরে:

'সি তু সাভাই উ… কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি যে। উঃ ভগবান!'

বুলাকে পৌঁছবার পর আমি তাঁকে বার বার করে জিজ্ঞেস করলাম ঠিক কোন্‌ বাড়িটায় উনি থাকেন। অবশেষে একটা খোলা আঙিনার পেছনে ঘূর্ণি-বরফে চাপা-পড়া একটা ছোট দালানের প্রবেশ পথে আমরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক পথ হাতড়াতে লাগলেন অন্দরের দরজার দিকের। তারপর আস্তে করে দরজাটায় টোকা দিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন আমাকে:

---

* [ফরাসী ভাষায়] যদি তুমি জানতে!

** [ফরাসী ভাষায়] যদি তুমি জানতে কোন পথের যাত্রী আমি।

'শ্‌শ্‌! আস্তে!...'

লাল ড্রেসিং-গাউন-পরা এক ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন, হাতে তাঁর একটা জ্বালানো মোমবাতি। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে আমাদের যাবার রাস্তা দিলেন তিনি। তারপর গাউনেরই কোনো ভাঁজ কিংবা পকেট থেকে একজোড়া হাত-চশমা বের করে তাই দিয়ে আমায় লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমি তাঁকে বললাম ভদ্রলোকটির হাত বোধহয় ঠাণ্ডায় জমে গেছে, পোশাক-আশাক খুলে ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া উচিত।

'সত্যি?' জিজ্ঞেস করলেন উনি। সুরেলা গলায় তারুণ্যের নিখাঁজ স্বর।

'ঠাণ্ডা জলে ওঁর হাতগুলো রাখতে হবে।'

নীরবে হাত-চশমা দিয়ে উনি ঘরের কোণটা দেখিয়ে দিলেন। সেখানে ছবি আঁকার একটা ইজেল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইজেলের ওপর একখানা ছবি—নদীর আর গাছের। হতভম্ব হয়ে আমি আরো ভালো করে দেখতে লাগলাম ভদ্রমহিলার মুখখানা। কেমন অদ্ভুত ধরণের নিথর যেন। আমার কাছ থেকে সরে আরেক কোণে গেলেন উনি। টেবিলের ওপর গোলাপী ঢাকনার নিচে একটা বাতি জ্বলছে। উনি বসলেন সেখানে। টেবিলের ওপর থেকে একখানা হরতনের-গোলাম আঁকা তাস তুলে নিয়ে একদৃষ্টে সেটাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

আমি গলাটা বেশ চড়িয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘরে ভদ্‌কা আছে?' জবাব দিলেন না উনি। নিবিষ্ট মনে খালি তাসই সাজাতে লাগলেন টেবিলের ওপর। ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে, বুকের

ওপর মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে, গায়ের পাশে দুলছে লাল হাতদুটো। একটা সোফায় শুইয়ে আমি ভদ্রলোকের কাপড়-জামা খুলে দিতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী ঘটছে। মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছি। সোফার পাশের দেয়ালটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে সারি সারি ফটোগ্রাফের আড়ালে, আর সেই ফটোগুলোর মাঝখানে একটা ম্যাট্‌মেটে সোনালি হার জ্বলেছে, সাদা ফিতে দিয়ে বাঁধা সেটা। ফিতের ডগায় সোনালি অক্ষরে লেখা পড়লাম:

'অনুপমা জিল্‌ডাকে'

ভদ্রলোকের হাত দুখানা রগড়ে দিতে শুরু করতেই উনি গোঙাতে লাগলেন, 'সামলে! এই হতভাগা!'

ভদ্রমহিলা তাসগুলো বিছিয়ে চুপচাপ মগ্ন হয়ে বসে আছেন। টিকলো নাকটার জন্য মুখটাকে খানিকটা পাখির মতো দেখায়, বড়ো বড়ো একজোড়া অচঞ্চল চোখ যেন জ্বলছে। পাঁশুটে রঙের চুলগুলো একটু ফুলিয়ে নেবার জন্য এবার উনি হাত তুললেন। হাতদুটে কিশোরী মেয়ের মতো কচি। চুলগুলো এমনভাবে ফাঁপিয়ে রাখা যে দেখলে অনেকটা পরচুলা মনে হয়। নিচু অথচ বেশ পরিষ্কার গলায় উনি জিজ্ঞেস করলেন:

'মিশাকে দেখেছিলে, জর্জেস্?'

একপাশে আমাকে ঠেলে দিয়ে চট্‌ করে উঠে বসে জর্জেস্ জবাব দিলেন অস্থির ক্ষিপ্রতার সঙ্গে:

'কেন, তুমি তো জানোই সে কিয়েভে গেছে।'

তাসের দিকে তাকিয়ে থেকেই ভদ্রমহিলা পুনরাবৃত্তি করলেন,

'হ্যাঁ, কিয়েভে গেছে।' লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলার গলায় আবেগ বা স্বরের ওঠা-নামার কোনো চিহ্নই নেই।

'সে তো ফিরে আসবে শীগ্‌গিরই…'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ তো! খুব শীগ্‌গিরই ফিরবে।'

'সত্যি?' ফের বললেন মহিলাটি।

আধা-উলঙ্গ অবস্থাতেই জর্জেস্ সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলেন তার পাশে। মহিলার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কী যেন বললেন ফরাসীতে।

উনি রুশভাষায় জবাব দিলেন, 'আমি তো বেশ সুস্থিরই আছি।'

'বুঝলে, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন বরফ ঝড়, তার ওপর সাঙ্ঘাতিক হাওয়া। ভেবেছিলাম বুঝি জমেই গেলাম ঠাণ্ডায়!' ভদ্রমহিলার হাঁটুর ওপর নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে-থাকা হাতখানায় নিজের হাত বুলিয়ে জর্জেস্ তাড়াতাড়ি বললেন কথাগুলো। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। লালচে মুখ আর কালো গোঁফের নিচে পুরু ঠোঁটদুটোয় একটা উদ্বিগ্ন আতঙ্কের ভাব। গোল মাথার ওপর খাড়া-খাড়া পাঁশুটে চুলগুলোয় সজোরে হাত ঘষছিলেন উনি, নেশার ঝোঁকটা দ্রুত কেটে যাচ্ছে।

'আমরা কাল কিয়েভ রওনা হচ্ছি', বললেন মহিলাটি। এটা তাঁর প্রশ্নও হতে পারে, অথবা শুধু জানিয়ে দিলেন কথাটা—তাও হতে পারে।

'ঠিক কথা, কালই রওনা হব! তাহলে তো তোমার একটু বিশ্রাম করে নেওয়া উচিত। শুতে যাও না কেন? অনেক রাত হয়ে গেছে…'

'মিশা কি আসবে না আজ?'

'না গো, না! এমন বরফ ঝড়...। যাও তো—এবার তোমার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত।'

টেবিল থেকে বাতিটা তুলে নিয়ে বইয়ের আলমারিতে আড়াল-করা একটা ছোট দরজার ভেতর দিয়ে ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন জর্জেস্। অনেকক্ষণ এ ঘরে একা রইলাম আমি, মনটা শূন্য, আনমনা, পাশের ঘর থেকে জর্জেসের নিচু ভাঙা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। জানলার ওপর ঝড়ের ঝাঁকড়া-থাবার সাপ্‌টানি। মেঝেতে গলে-যাওয়া বরফজলের মধ্যে টিম্‌টিম্‌-করে-জ্বলা মোমবাতির শিখাটার ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঘরে আসবাবপত্র ঠাসা। একটা অদ্ভুত গরম গন্ধ যেন কামরার ভেতর ছড়িয়ে আছে, মনটাকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

অবশেষে আবার জর্জেস্ এসে ঢুকলেন হেলতে-দুলতে, হাতে সেই বাতিটা নিয়ে। চিমনির কাঁচে টিং-টিং করে ঘা খাচ্ছিল বাতির ঢাকনাটা।

'শুয়ে পড়েছে এবার।'

টেবিলে বাতিটা নামিয়ে রাখলেন উনি। মনে হচ্ছে যেন ভাবনায় ডুবে গেছেন। ঘরের মাঝখানটায় থেমে পড়ে উনি কথা বলতে শুরু করলেন; কিন্তু আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেন না।

'তাহলে, কী আর বলব তোমায়? তুমি না থাকলে আমি বোধহয় আজ শেষই হয়ে যেতাম...। ধন্যবাদ! তারপর—তোমার পরিচয়টা?'

একপাশে মাথাটা হেলিয়ে রেখে উনি কাঁপতে কাঁপতে কান পেতে রইলেন, পাশের ঘরে ক্ষীণ একটু খস্‌খস্ আওয়াজে যেন শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমি খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্ত্রী বুঝি উনি?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। আমার সবকিছু। জীবনে আমার যতোকিছু মায়া সব ওরই জন্য!' মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে নিচু গলায় বললেন ভদ্রলোকটি। আবার মাথায় সজোরে হাত ঘষতে লাগলেন উনি।

'একটু চা খাওয়া যাক্, অ্যাঁ?'

অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন উনি—কিন্তু, তারপরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন—মনে পড়েছে অতিরিক্ত মাছ খাওয়ায় বাড়ির ঝিটির তো আবার অসুখ করেছিল, হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাকে।

সামোভারটা আমিই গরম করতে চাইলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন উনি। ভুলেই গিয়েছিলেন পরনে তাঁর পোশাক রয়েছে যৎসামান্য। ওইভাবেই ভিজে মেঝেটার ওপর দিয়ে খালি-পায়ে উনি ছপাৎ ছপাৎ করে চললেন আমাকে তাঁর ছোট রান্নাঘরটা দেখাতে। সেখানে উনোনটার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ফের বললেন:

'তুমি না থাকলে আমি হয়তো ঠাণ্ডায় জমে যেতাম। ধন্যবাদ!'

তারপর চমকে উঠে, ভয়ে চোখদুটো বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ওর তাহলে কী অবস্থা হত ভাবো দেখি? হা ভগবান্!'

দরজার নিশানা সেই কালো ফোকরটার দিকে চোখ ফিরিয়ে এবার তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ করে বললেন:

'ওর শরীর ভাল নয়। সে তো তুমি দেখলেই। ওর একটি ছেলে মস্কোতে ছিল, গানবাজনা করত—সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু ও এখনও ভাবে ছেলে বাড়ি ফিরে আসবে। আজ প্রায় দু-বছর হল ঘটেছে ব্যাপারটা।'

এরপর চা খেতে খেতে ভদ্রলোক ছাড়া-ছাড়াভাবে বলে চললেন— সাধারণ কথাবার্তায় যা শোনা যায়-না সেইসব কথা: মহিলাটি গাঁয়ের জমিদারনী, আর উনি ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক, ভদ্রমহিলার ছেলেটিকে উনি পড়াবার ভার নিয়েছিলেন। তারপর তাঁর প্রেমে পড়ে যান উনি। এই ভদ্রলোকের জন্যই তিনি তাঁর স্বামীকে ছেড়ে চলে আসেন—স্বামীটি ছিলেন জার্মান ব্যারন। ভদ্রমহিলা অপেরায় গান গাইতেন। তাঁরা দুজনে বেশ সুখীও হয়েছিলেন, ব্যারন ভদ্রলোকটি অবশ্য মহিলার জীবনটাকে বিষাক্ত করে তুলবার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছিলেন।

এসব কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক চোখদুটো কুঁচকে নিবিষ্টভাবে কী যেন লক্ষ্য করছিলেন ঝুলকালিভরা রান্নাঘরের অন্ধকারের ভেতর, উনোনের ধারে যে-জায়গাটা জীর্ণ হয়ে গেছে তারই ওপাশে চেয়ে। চাটা উনি এত গরম খেয়ে ফেললেন যে জিভই পুড়ে গেল তাঁর, যন্ত্রণায় মুখখানা কুঁচকে গেল। উৎকণ্ঠাভরে গোল-গোল চোখজোড়া পিট্‌পিট্‌ করে ফের জিজ্ঞেস করলেন:

'আর—তুমি? ও, তাই বুঝি! রুটির কারখানায় কাজ করো। অদ্ভুত তো! কাজটা তোমায় মানায় বলে তো মনে হয় না। কেন বল তো?'

ভদ্রলোকের গলায় শঙ্কার আভাস। আমার দিকে সন্দেহাতুর দৃষ্টিতে তাকালেন—প্রতারিত হয়ে কেউ ফাঁদে পড়লে যেমনভাবে তাকায় তেমনি।

আমার জীবন-কাহিনীর খানিকটা তাঁকে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলাম।

'বাস্তবিক!' মৃদু বিস্ময়ে উনি বললেন, 'হাঁ, এই রকম ব্যাপার!…'

তারপর হঠাৎ যেন উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'"কুৎসিত হাঁসের বাচ্চার" সেই রূপকথার গল্পটা—জানো বোধহয় তুমি?'

মুখখানা বিশ্রীরকম বিকৃত করলেন উনি। বলতে বলতে রাগে ওঁর প্রত্যেকটা কথা যেন কেঁপে কেপে উঠল, ভাঙা গলার স্বর ক্রমে অদ্ভুত একটা অস্বাভাবিক উঁচু পর্দায় উঠে গেল।

'এমনি ধরণের রূপকথার গল্প মনে রঙ ধরিয়ে দেয়। যখন তোমার মতো বয়েস ছিল তখন আমিও অমনি ভাবতাম—ভাবতাম একদিন হয়তো আমি সুন্দর রাজহাঁস হব। যা হোক, এখন··· কথা ছিল আমি অ্যাকাডেমিতে পড়ব, কিন্তু তা না করে গেলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। আমার বাবা ছিলেন পাদ্রি—তিনি তো আমায় ত্যজ্যপুত্রই করে বসলেন। তারপর প্যারিসে গিয়ে পড়লুম প্রগতির ইতিহাস—মানে মানুষের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর কি। নিজেও কিছু কিছু লিখলাম। হ্যাঁ, তাও করেছি। সবই এমন···'

চমকে উঠে এক মুহূর্ত কান পেতে রইলেন উনি। তারপর বললেন:

'প্রগতি—নিজেদের বোকা বানাবার জন্য মানুষই বানিয়েছে ও জিনিসটা! বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই, যুক্তিও নেই। গোলামি বাদ দিয়ে কোনো প্রগতিই হয় না। যে-মুহূর্তে সংখ্যাগুরুর ওপর সংখ্যালঘুর হুকুমদারি শেষ হবে তখনই অচল হয়ে যাবে মানুষের সমাজ। জীবনকে আমরা যতোই সহজে করতে চাই, খাটুনির সুরাহা করতে চেষ্টা করি, ততোই আরো জটিল করে তুলি, নিজেদের মেহনত আরো বাড়িয়ে তুলি। কলকারখানা আর মেশিন তৈরি করি আরো বেশি করে মেশিন বানাবার জন্য—কী মুর্খামি! যখন নাকি সারা

দুনিয়ায় আসল প্রয়োজন চাষীর, ফসল ফলাবার লোকের, তখন আমরা সৃষ্টি করছি মজুর, পালে পালে কারখানার শ্রমিক। একমাত্র জিনিস যা প্রকৃতির হাত থেকে মেহনতের জোরে ছিনিয়ে নেওয়া দরকার তা হল খাদ্য। মানুষের চাহিদা যতো কম, সে ততো বেশি সুখী, যতো বেশি দাবিদাওয়া, ততো অভাব স্বাচ্ছন্দ্যের।'

ভদ্রলোক হয়তো হুবহু এ কথাগুলো বলেননি, তবে ঠিক এমনি ধরণের মাথা-গুলোনো অভিমতগুলোই তিনি প্রকাশ করছিলেন। এই বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পরিচয় সেই প্রথম—আর ঠিক এমনি নগ্ন, এমনি প্রকট রূপেই। উত্তেজিত হয়ে সরু গলায় চেঁচিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোক অন্দরমহলের খোলা দরজাটার দিকে উদ্বিগ্নভাবে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। এক মুহূর্ত নীরবে কান পেতে শুনলেন। তারপর প্রায় পাগলের মতো ফিস্‌ফিস্ করে বলতে শুরু করলেন আবার:

'কথাটা কিন্তু মনে রেখো—প্রয়োজন কারুরই বেশি নয়। এক টুকরো রুটি, আর একজন নার।...'

নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে রহস্যময় চাপা গলায় এমন সব কথা বললেন যা আমার অজানা, এমন কবিতা আবৃত্তি করলেন যা কোনোদিন পড়িনি। তারপর হঠাৎ যেন সেই বাশ্‌কিন চোরের সঙ্গে তার অনেকখানি মিল খুঁজে পেলাম আমি।

'বিয়াত্রিচে, ফিয়ামেত্তা, লাউরা, নিনন্' ফিস্‌ফিস্ করে উনি যাদের কথা বললেন তাঁদের কারুর নামই আগে শুনিনি। কোন রাজা-রাজড়া আর কবিদের প্রেমের কাহিনী শোনালেন, ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করলেন তালে তালে, কনুই অবধি খোলা সরু হাতখানা দুলিয়ে দুলিয়ে।

চাপা আবেগতপ্ত গলায় বললেন, 'পৃথিবীকে শাসন করে প্রেম আর ক্ষুধা'। কথাগুলো আমি জানতাম। 'ক্ষুধার শাসন' নামে সেই বিপ্লবী পুস্তিকাটার শিরোনামার নিচেই ছাপা হয়েছিল এ কথা ক-টি। ঘটনাটা আমার মনের মধ্যে তাই তাৎপর্যমণ্ডিত একটা বিশেষ ধরণের গুরুত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

'মানুষ চায় ভুলে থাকতে, সান্ত্বনা পেতে—জ্ঞানের সন্ধান পেতে চায় না!'

তাঁর এই চূড়ান্ত অভিমতটা আমার মাথা একেবারেই ঘুরিয়ে দিল।

যখন সেই রান্নাঘর ছেড়ে বেরুলাম তখন সকাল হয়ে গেছে: দেয়ালের ছোট ঘড়িটাতে ছ-টা বেজে কয়েকমিনিট। সীসের মতো কালচে অন্ধকারে বরফ-গাদা ঠেলে এগুচ্ছি। আমার আশপাশে প্রচণ্ড হাওয়ার শোঁসানি। অথচ তখনো আমার কানে যেন বাজছে ভগ্নহৃদয় মানুষটার আর্ত উন্মত্ত প্রলাপ, কেবলই মনে হচ্ছে ওঁর বক্তব্যগুলো যেন তেতো ওষুধের মতো—কিছুতেই গিলতে পারছি না, গলার কোথায় যেন আটকে আছে, শ্বাস রোধ হয়ে যাচ্ছে আমার। রুটির কারখানার আস্তানায় লোকজনের ভেতর আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কাঁধের ওপর বরফের ছিল্‌কেগুলো জমতে জমতে ভারি হয়ে উঠেছে। সেই বোঝা টেনে নিয়েই ঘুরে বেড়ালাম তাতার-পাড়ার রাস্তায় রাস্তায়—যতোক্ষণ না আলো হয়। তারপর হাওয়ার টানে স্তূপাকার হয়ে-ওঠা বরফের আড়ালের মধ্যে শহরের লোকেরা চলাচল করতে শুরু করল।

ইতিহাসের শিক্ষকটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি। দেখা

করতে চাইওনি। কিন্তু পরবর্তী কালে জীবনের অর্থহীনতা আর পরিশ্রমের অসারতা নিয়ে এমনি ধরণের কথাবার্তা আমাকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে—শুনতে হয়েছে অশিক্ষিত পর্যটক, হা-ঘরে মুসাফির আর 'তল্‌স্তয়পন্থী'দের মুখ থেকে, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষদের মুখ থেকে। অধ্যাত্মবিদ্যায় এম.এ. ডিগ্রাধারী জনৈক পুরোহিতের মুখেও এমন কথা শুনেছি, বোমাওয়ালা রসায়নবিদ, নবজীবনবাদী জীবতত্ত্ববিদ এবং আরো অনেকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু এই ধরণের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে যতোখানি মাথা ঘুলিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল পরবর্তী এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে ততোখানি ঘাবড়ে যাইনি।

ইতিহাসের শিক্ষকের সঙ্গে আমার সেই আলাপের পর তিরিশ বছরের বেশি কেটে গেছে, তারপর মাত্র এই বছর-দুয়েক আগে হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ঠিক একই ধরণের ভাবনাচিন্তা, হুবহু প্রায় একই ভাষায় শুনতে পেলাম আমার বহুদিনের পরিচিত একজন মজুরের মুখে।

'খুব খোলাখুলিভাবেই' কথা হচ্ছিল আমাদের। লোকটা নিজেকে বলত 'রাজনৈতিক ধুরন্ধর' একটু গম্ভীরভাবে হেসে। সে আমায় এমন বেপরোয়া বে-আব্রু ঢঙে কতকগুলো কথা বলল যা আমার বিশ্বাস একমাত্র রুশদের পক্ষেই সম্ভব!

'আরে ভাই, আলেক্সেই মাক্সিমিচ! কী দরকার আমার বিজ্ঞান, অ্যাকাডেমি, বিমান, এ সব ঝামেলা দিয়ে? বোঝা বাড়ানো ছাড়া এ আর কী! এ সব দিয়ে আমার কোন্ উপকারটা হবে? যা চাই তা হল একটা শান্তির নীড়, আর—একটি মেয়েমানুষ; যখনই ইচ্ছে হবে

চুমু খাব তাকে, আর সেও আমার চুমুতে সাড়া দেবে খোলা মনে—দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে সাড়া দেবে। এই তো! আর তুমি—তুমি কথা বলছ পুঁথিপড়া ভদ্রলোকদের মতো। এখন আর তুমি আমাদের জাতের লোক নও হে। তোমার মনে বিষ ঢুকেছে। মানুষ হল ছোটখাটো ব্যাপার, তাদের চেয়ে তোমার কাছে এখন আদর্শের মূল্য বেশি। তোমার নজরটা হয়েছে ইহুদীগুলোর মতো—যেন মানুষ পয়দাই হয়েছে রোববারে ব্রহ্মচর্য করবার জন্য! তাই না হে?'

'কিন্তু ইহুদীরা তো এমন কথা মনে করে না…'

'শয়তান জানে ওরা কী মনে করে। ওদের বোঝা বড়ো কঠিন ব্যাপার।' জবাব দিল সে। সিগারেটটা নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে সে নীরবে লক্ষ্য করল সেটা কি ভাবে ভাসে।

শরতের জোছনা-ভরা রাত। আমরা দুজন বসেছিলাম নেভা নদীর জেটিতে একটা গ্রানাইট পাথরের বেঞ্চির ওপর। সারাদিন ধরে আমরা অক্লান্ত অথচ অনর্থক চেষ্টা করেছি একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য: উদ্দেশ্যটা ছিল সৎ এবং তার প্রয়োজনও ছিল। সারাদিন নিষ্ফল মানসিক পরিশ্রমের পর অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম দুজনেই।

'তুমি হয়তো আমাদের সঙ্গে রয়েছ, কিন্তু আমাদের কেউ নও তুমি', চিন্তিতভাবে মৃদুস্বরে সে বলেই চলেছে, 'বুদ্ধিজীবীগুলো—বড়ো মাথা গরম করতে ভালোবাসে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওরা বিদ্রোহে-বিপ্লবে যোগ দিয়েছে। যীশুখ্রীষ্টের মতো। তিনিও ছিলেন আদর্শবাদী লোক, পরলোকের জন্য বিদ্রোহ করেছিলেন। আর ঠিক ওই রকমভাবেই গোটা বুদ্ধিজীবীশ্রেণীও বিদ্রোহ করছে কল্পিত

একটা স্বপ্নরাজ্যের জন্য আদর্শবাদীরা বিদ্রোহ করে আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে ও-পথে পা বাড়ায় যতো নিষ্কর্মা, বদমায়েশ আর নোংরা জীবগুলো — ওরা সবাই আসে আক্রোশের বশে, কারণ ওরা দেখে জীবনে ওদের কোনো স্থান নেই। আর মজুররা — তারা বিদ্রোহ করে বিপ্লবের খাতিরে। ওদের যেটা প্রয়োজন তা হল শ্রমের উপায় আর উৎপাদনের যথার্থ বিলি-ব্যবস্থা। ওরা যখন সমস্ত ক্ষমতা গুছিয়ে নেবে তারপর কি তুমি ভেবেছ ওরা রাষ্ট্র রাখতে রাজি হবে? কখ্খনো না! সবাই তখন আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, ওদের প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে নিজের জন্য কোথাও কোনো শান্তির নীড় খুঁজে পেতে, নিজের মতো করে…’

‘কলকারখানার কথা বলছ? কারিগরি বিদ্যা? কিন্তু তাতে করে তো আমাদের গলার ফাঁসটাই আরও এঁটে বসবে। আমাদের বাঁধনটাই শুধু শক্ত হতে পারে ওতে, আর কিছু নয়। না হে, অযথা মেহনত করার হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতেই হবে। লোকে চায় স্বস্তি, ব্যস্। কারখানা, বিজ্ঞান — এ সব আমাদের স্বস্তি দেবে না কখনো। একজন লোকের একার আর কতটা চাহিদা? আমার যখন দরকার একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের, তখন শুধু-শুধু কেন শহর নগর গড়তে যাব? যখন লোকে এক জায়গায় দলবেঁধে থাকে তখনই দেখবে তারা জল-সেঁচা, খাল-নালা, বিজ্‌লি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে লেগে গেছে। কিন্তু — এ সব বাদ দিয়ে চলতে চেষ্টা কর একবারটি, দেখবে জীবনটা কতো সহজ হয়ে যাবে। যাই তুমি বল না কেন, আমাদের অসংখ্য ব্যাপার রয়েছে যার কোনো দামই নেই, আর সে সবই এসেছে বুদ্ধিজীবীদের

কাছ থেকে। সেইজন্যই তো বলি, বুদ্ধিজীবীরা বড়ো বিপজ্জনক চীজ্।'

আমি মন্তব্য করলাম পৃথিবীতে আর কোনো জাত নেই যারা আমাদের রুশদের মতো অমন দ্বিধাহীন, অমন পরিপূর্ণভাবে জীবন থেকে তার তাৎপর্যটাকে বর্জন করতে জানে।

আমার বন্ধুটি অল্প একটু হেসে ফোঁড়ন কাটল, 'রুশরা হল মনের দিক থেকে সবচেয়ে স্বাধীন জাত কি না! শুধু—রাগ কোর না ভাই, খাঁটি কথাই বলছি। এইভাবেই আমাদের দেশের লক্ষ-লক্ষ লোক চিন্তা করে আসছে, তবে তারা জানে না কীভাবে কথাগুলোকে সাজিয়ে বলতে হবে…। জীবনটা আরো সহজ হওয়াই উচিত। তাহলেই সেটা মানুষদের প্রতি আরো সদয় হবে…'

এ লোকটি কোনো কালেই 'তল্‌স্তয়পন্থী' নয়, নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকও তার দেখিনি কখনো। বরাবরই লোকটির মানসিক বিকাশের ধারা আমি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করে গিয়েছি।

এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর আমি একটা কথা না ভেবে পারিনি। রাশিয়ার লক্ষ-লক্ষ নরনারী বিপ্লবের বেদনা আর যাতনা সহ্য করছে একমাত্র এই কারণে যে তাদের অন্তরে অন্তরে আশা আছে মেহনতের হাত থেকে তারা রেহাই পাবে—এই কথাটা যদি বাস্তবিকই সত্যি হয়, তাহলে? সবচেয়ে কম খেটে সবচেয়ে বেশি আনন্দের ভাগ নেওয়া—চিন্তাটা খুবই লোভনীয় বৈকি! আকাশের চাঁদ হাতে পাবার মতো, যে-কোনো কল্পনাবিলাসের মতোই এ-স্বপ্ন মুগ্ধ করে দেয় মানুষের মন।

আমার তখন মনে পড়ে হেনরীক ইব্‌সেনের সেই লাইনগুলো:

তোমরা বল আমি নাকি সেকেলে হয়ে পড়েছি।
আমি যা ছিলাম বরাবর তাই আছি।
শুধু দাবার বোড়ে সরাবো—এমন মানুষ নই আমি।

একেবারে কিস্তিমাৎ করে দাও!
তাহলেই তোমার দলে রয়েছি পুরোপুরি।

একমাত্র বিপ্লব যার কথা আমি জানি—
যার মধ্যে মোহ ছিল না, বঞ্চনা ছিল না,
যে বিপ্লব সবকিছু ধ্বংস করতে পারে
সে বিপ্লব মহাপ্লাবন।
কিন্তু সেখানেও দেখেছি বিদ্রোহী লুসিফার প্রতারিত,
কারণ স্বৈরতন্ত্রী নায়ক হয়ে বসেছে একা নোয়া
জাহাজটিতে।

তাই—আবার এসো বন্ধু, বিপ্লবের দরদী সঙ্গীরা!
আর সেটা সম্পাদন করার জন্য।
ডাকো লড়িয়েদের, ডাকো বক্তাদের।
সারা পৃথিবী ভাসিয়ে দিয়ে আরেক মহাপ্লাবন আনো,
আর আমি—মহা খুশি হয়ে মৃত্যুবাণ ছুঁড়ি
স্বৈরতন্ত্রের জাহাজকে ঘায়েল করতে।

দেরেন্‌কভের দোকানের আয় অতি যৎসামান্য, অথচ এদিকে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে লোকের সংখ্যা আর দানসত্রের ব্যবস্থা।

‘একটা কিছু করা দরকার হে’, চিন্তাক্লিষ্টভাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আন্দ্রেই বলত আর অপরাধীর মতো হাসত, দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

আমার মনে হত এই লোকটি যেন ধরেই রেখেছে মানুষের উপকারের জন্য তাকে সারাজীবন গাধার খাটুনি খেটে যেতে হবে—এই তার কপালের লেখা। আর যদিও তার এই দণ্ডটুকু সে মুখ বুজে মেনে নিয়েছে, তবু একেকসময় যেন বোঝাটা বড়ো বেশি ভারি হয়ে উঠত তার পক্ষে।

কথায় কথায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি নানাভাবে তাকে বলেছি:

‘কেন এ কাজ করছেন?’

মনে হত আমার কথার মানেটা সে তলিয়ে দেখতে পারেনি, কারণ ‘কিসের জন্য’র জবাব সে সবসময়ই দিত কেতাবী ভাষায়, ছাড়া-ছাড়াভাবে—সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা বলত সে, শিক্ষা-দীক্ষা আর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলত।

‘কিন্তু—লোকে কি জ্ঞান চায়? সত্যিই কি তারা জ্ঞানের সন্ধান করে?’

‘নিশ্চয়! তা ছাড়া কী? তুমিও তো চাও, তাই না?’

হ্যাঁ, তা চাই বটে। কিন্তু আমার মনে পড়ে সেই ইতিহাসের শিক্ষকটি যা বলেছিলেন:

‘মানুষ চায় ভুলে থাকতে, সান্ত্বনা পেতে—জ্ঞানের সন্ধান পেতে চায় না।’

করাতের মতো ধারালো এমনি ধরণের চিন্তাধারার সঙ্গে সতেরো বছরের যুবকদের মোকাবিলা হওয়াটাই বিপজ্জনক। এতে করে ভোঁতা হয়ে যায় চিন্তাধারাই, তরুণ যুবকদের কোনো লাভও হয় না এতে।

আমার মনে হতে লাগল যেন আমি সবসময়ই লক্ষ্য করেছি একটা ব্যাপার এবং বরাবরই যেন লক্ষ্য করে এসেছি। গল্প কাহিনী ইত্যাদি যতোই আকর্ষণীয় হোক্ না কেন এগুলো লোকে উপভোগ করে মাত্র একটি কারণে—অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য তাদের লক্ষ্মীছাড়া অথচ অভ্যস্ত জীবনটাকে তারা ভুলে থাকতে পারে; গল্পের মধ্যে যতো বেশি 'কল্পনার খোরাক' থাকবে শ্রোতারা ততো উদ্‌গ্রীব হয়ে তা গ্রহণ করবে, যে-সব বইয়ে প্রচুর পরিমাণে 'বাস্তবের খোলস দিয়ে কল্পনার' সরবরাহ, সে-সব বইই মন টানবে সবচেয়ে বেশি। আমি তখন অস্বাস্থ্যকর একটা কুয়াশার মধ্যে যেন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।

দেরেন্‌কভ ঠিক করল একটা রুটির কারখানা খুলবে। আমার মনে আছে যথাসাধ্য সূক্ষ্ম হিসেব করে দেখা হয়েছিল যাতে কারখানাটা থেকে প্রত্যেক রুবল অন্তত শতকরা পঁয়াত্রিশ ভাগ মুনাফা হাতে আসে। আমাকে কাজ করতে হবে রুটির কারিগর-মিস্ত্রির 'সাগরেদ' হয়ে, আর 'দলেরই একজন' হিসেবে নজর রাখতে হবে যাতে পূর্বোক্ত ময়দা, ডিম, মাখন কিংবা তৈরি মালগুলো গায়েব না করে ফেলে।

এইভাবে অবশেষে প্রকাণ্ড আর নোংরা একটা একতলার কুঠরি থেকে এসে হাজির হলাম আরেকটা তল-কুঠরিতে—ছোট হলেও সেটা খানিকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার একটা নতুন কাজই হল ঘরটাকে সাফ রাখা। আগে যেখানে চল্লিশজন লোকের একটা দল নিয়ে আমায় কাজ করতে হত এখন সেখানে মাত্র একটি লোক। লোকটার রগের কাছের চুলগুলো পাকতে শুরু করেছে, দাড়িটা ছোট আর ছুঁচলো। মুখখানা পাতলা, ধোঁয়ার ছোপধরা, আর চোখজোড়া

কালো-কালো, চিন্তাক্লিষ্ট। লোকটার মুখটা অদ্ভুত ধরণের—পুঁটিমাছের মতো ছোট। নরম পুরু ঠোঁটদুটো এমনভাবে উঁচিয়ে রেখেছে যেন মনে-মনে কাকে চুমু খাচ্ছে সবসময়। আর চোখদুটোর গভীরে যেন বিদ্রূপের ঝিলিক।

চুরি করত লোকটা নিঃসন্দেহে। রুটির কারখানার পয়লা দিনের কাজের পরই সে দশটা ডিম, তিন পাউণ্ড কিংবা তারও বেশি ময়দা আর বড়োসড়ো এক তাল মাখন সরিয়ে রাখল।

'ওটা কেন রাখলে?'

'ও আমার চেনা একটি ছোট মেয়ের জন্য', অমায়িকভাবে জবাব দিল সে। তারপর কপালটা কুঁচকে আবার বলল, 'চমৎ-কার ছোট্ট একটি খুকি!'

আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম চুরি জিনিসটা দুনিয়ার চোখে একটা অপরাধ। কিন্তু আমার বক্তৃতায় বোধহয় তেমন জোর ছিল না, অথবা আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে আমার নিজেরই হয়তো যথেষ্ট আস্থা ছিল না। মোট কথা আমার কথায় কোনো কাজ হল না।

ভিজে ময়দার তাল রাখার বাক্সের ঢাকনাটার গায়ে হেলান দিয়ে জানলার ফাঁকে আকাশের তারাগুলো দেখতে দেখতে কারিগর-মিস্ত্রিটা যেন অবিশ্বাসভরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল:

'উনি এলেন আমায় বক্তৃতা শোনাতে! জীবনে এই প্রথম তো দেখলে আমায়, আর ব্যাপারখানা দেখ! বক্তৃতা শোনাচ্ছে! আর আমি হলুম ওর ঠাকুর্দার বয়েসী। হুঁঃ সে এক মজাদার ব্যাপার!'

তারা দেখা শেষ হবার পর সে জিজ্ঞেস করল:

'এর আগে কোথায় কাজ করতে? তোমার যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে। সেমিয়নভের ওখানে বলছ? যেখানে সেই গোলমালটা হয়েছিল?-ও। তাহলে বোধহয় স্বপ্নেই কখনো দেখে থাকব তোমায়…'

ক-দিন বাদেই আবিষ্কার করলাম এ লোকটার নিদ্রা দেবার ক্ষমতা অফুরন্ত। যে-কোনো সময়, যে-কোনো অবস্থায় সে ঘুমোতে পারে; এমন কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল্লিতে রুটি দেবার কাঠের কোদালটায় শরীরের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়েও ঘুমোতে পারে। ঘুমের মধ্যে তার ভুরুজোড়া উঁচু হয়ে ওঠে, গোটা মুখখানার ভেতরেই একটা বিশেষ ধরণের পরিবর্তন আসে—একটা সব্যঙ্গ বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে তাতে। লোকটা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে গুপ্তধন আর স্বপ্ন নিয়ে গল্প করতে। রীতিমতো জোর দিয়েই সে বলে:

'গোটা পৃথিবীটার আগাগোড়া আমার নখদর্পণে, মাংসের পুর-দেয়া পিঠের মতো ধনসম্পত্তিতে ঠাসা। সমস্ত জায়গায় পোঁতা আছে টাকার সিন্দুক, পিপে আর জালা। মাঝেমাঝে তো আমারই চেনা-জানা জায়গার স্বপ্ন দেখি। একবার বুঝলে, একটা স্নানঘর ছিল—স্বপ্ন দেখলুম যেন সেখানে এক কোণে সিন্দুক বোঝাই রূপোর বাসনপত্র রয়েছে। যা হোক, জেগে উঠে তো সিধে চলে গেলাম সেখানে, খুঁড়তে শুরু করে দিলাম জায়গাটা। প্রায় দু-ফুট মতো খুঁড়েছি, তারপর কি পেলাম বলতে পার? পোড়া কয়লা আর একটা কুকুরের মাথার খুলি। ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি!… তারপর যেন আচম্কা দড়াম্ করে শব্দ—জানলাটা ভেঙে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে এক বোকা মাগী গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু করে দিল: চোর! চোর! বাঁচাও! আমি অবিশ্যি পালিয়ে বাঁচলাম, নয়তো মার খেয়ে যেতাম। সে এক মজাদার ব্যাপার।'

প্রায়ই শুনতাম এইরকম মজাদার ব্যাপার। ইভান কুজ্‌মিচ লুতোনিন নিজে কিন্তু হাসত না। শু ু ভুরুটা কুঁচকে নাকটা ফুলিয়ে চোখজোড়া এমনভাবে কপালে তুলত যেন ওই একধরণের হাসি।

লুতোনিনের স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোনো কল্পনার স্থান ছিল না কিন্তু। বাস্তবের মতোই তা পান্‌সে আর ফাঁকা-ফাঁকা। আমি বুঝতাম না স্বপ্নগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে সে কেন এত আনন্দ পায়, অথচ পারিপার্শ্বিক জীবন নিয়ে কখনো একটি কথাও সে বলতে চায় না।

একবার এক ধনী চা-ব্যবসায়ীর মেয়েকে জোর করে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পরেই সে আত্মহত্যা করে। সারা শহরটায় ঢি-ঢি পড়ে যায়। কয়েক হাজার যুবকের একটা মস্ত বড় দল তার শবযাত্রায় যোগ দেয়। মেয়েটির সমাধির পাশে ছাত্ররা বক্তৃতাও দিয়েছিল। তারপর পুলিশ এসে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। আমাদের ছোট দোকানটিতে বসে সবাই এই করুণ ব্যাপারাটা নিয়ে আলোচনা করছিল চড়া গলায়। দোকানের পেছনের কামরাটায় উত্তেজিত ছাত্রদের ভিড়। ওদের গরম গরম কথা, ঝাঁঝালো মন্তব্যগুলো ভেসে আসছিল তল-কুঠরিতে আমাদের কানে।

লুতোনিন ফোঁড়ন দিল, 'ছুঁড়িটাকে ছেলেবেলায় আচ্ছা করে চড়ানো উচিত ছিল!' তারপর ওই কথার পিঠে পিঠেই সে আমায় জানিয়ে দিল:

'স্বপ্ন দেখছিলাম, একটা ডোবার ধারে বসে মাছ ধরছি, কার্প্‌ মাছ। তারপর বলা নেই কওয়া নেই একটা পুলিশ এসে হাজির। থাম্‌ বেটা! কার হুকুমে মাছ ধরছি? এদিকে—দৌড়োবার জায়গাই তখন খুঁজে পাই না—দিলুম জলের মধ্যে ঝাঁপ, তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল।'

তা হলেও, যদিও মনে হচ্ছিল ওর নজরের সীমানার বাইরে বাস্তবে যা ঘটবার তা ঘটে চলেছে, ও কিন্তু আমাদের এই রুটির কারখানাটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা ব্যাপারের আঁচ পেয়ে গেল অচিরেই। খদ্দেরদের খাবার পরিবেশন করে এমন সব মেয়ে যারা এ-কাজে আনাড়ি, কেতাব-পড়া মেয়ে সব। একটি হল মালিকের বোন। আরেকটি তারই বন্ধু, লম্বা, গোলাপী গাল, চোখদুটো দরদভরা। ছাত্ররা রোজই আসে। দোকানের পেছনের কামরাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কখনো নিজেদের মধ্যে ফুসুর ফুসুর করে, কখনো চেঁচিয়ে কথা বলে। মালিককে বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। আর আমি—কারিগরের 'সাগরেদ'—তো প্রায় ম্যানেজারের সামিল।

লুতোনিন প্রশ্ন করে, 'তুমি কি মনিবের আত্মীয় নাকি? না তোমায় জামাই-টামাই কিছু করবে বলে ভেবে রেখেছে? না? সে এক মজাদার ব্যাপার তো! আর—ওই ছাত্রগুলো এখানে ঘুর-ঘুর করে কেন? জোয়ান মেয়েগুলোর জন্য? হুম্… বেশ তা নয় মানলুম…। কিন্তু—ওদেরও তো এমন কিছু আহা-মরি রূপ নয়, তোমার এই ভদ্রমহিলাদের? এ সব ছাত্র-টাত্র আমার বোধহয় রোল-রুটি দিয়ে পেট ভরতেই আসে, মেয়েদের দিকে ওদের অত টান নেই…'

সকাল পাঁচটা ছ-টার দিকে প্রায় রোজই একটি মেয়ে এসে উঁকি দিত রুটির কারখানার জানলায়। মেয়েটির খাটো-খাটো পা। সবরকম আকৃতির গোলাকার পিণ্ড যেন এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে—অনেকটা তরমুজের বস্তার মতো। আমাদের জানলার ঠিক ধারটিতে বসে খালি পাদুটো দুলিয়ে সে হাই তুলতে তুলতে ডাকত:

'ভানিয়া!'

মাথায় বাঁধা রঙদার রুমালের ফাঁক দিয়ে ফিকে কোঁকড়া চুল বেরিয়ে এসেছে। নিচু কপাল আর খেলনার বেলুনের মতো ফুলো-ফুলো লাল গালদুটোর ওপর চুলগুলো ছোট পাকিয়ে আংটির মতো ঝুলে পড়েছে গোল হয়ে। কোঁকড়া চুল ওর ঘুম-ভরা চোখে এসে পড়তেই অলসভাবে ছোট ছোট হাত দিয়ে সেগুলোকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে — আঙুলগুলো কেমন যেন মজা করে ছড়িয়ে ধরছে একেবারে নবজাত শিশুর মতো। আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবতাম: এরকম একটা খুকির সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক কী নিয়ে এত আলাপ করতে পারে? লুতোনিনের ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে:

'এই যে, এসেছ?'

'হ্যাঁ, এই তো।'

'ঘুমিয়েছিলে না কি?'

'কেন ঘুমোবো না?'

'কী স্বপ্ন দেখলে?'

'আমার মনে নেই…'

সারা শহর নিস্তব্ধ। তবে একেবারে নীরব নয় — কোথায় যেন ঝাড়ুদারের ঝাঁটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। চড়ুইগুলো সবে জেগে উঠেই কিচির-মিচির করতে শুরু করেছে। উদীয়মান সূর্যের নরম উষ্ণ আলো ট্যারচা হয়ে এসে মিলছে জানলার কাঁচের ওপর আপন প্রতিবিম্বেরই সঙ্গে দিন সবে শুরু হল — ম্লানগম্ভীর এমনি সময়টা আমার বড়ো ভালো লাগে। খোলা জানলা দিয়ে লোমশ হাতখানা বাড়িয়ে লুতোনিনন সেই মেয়েটার পাদুটো চেপে ধরে। উদাসীনভাবে

মেয়েটা নিজেকে সঁপে দেয় মিস্ত্রির এই তদন্ত-কাজের সামনে। হাসে না, শুধু ভেড়ার মতো শূন্য চোখদুটো পিট্‌পিট্‌ করে।

'পেশ্‌কভ, মিষ্টি রুটিগুলো বের করে ফেল তো চুল্লি থেকে। সময় হয়ে গেছে।

চুল্লি থেকে বড়ো লোহার কড়াইগুলো টেনে বার করি। মিস্ত্রি প্রায় গোটা দশেক বন্‌রুটি, রোল আর পিঠে তুলে নিয়ে মেয়েটার কোলে ছুঁড়ে দেয়। একটা গরম বন্‌রুটি সাবধানে এ-হাত থেকে ও-হাতে বদল করতে থাকে মেয়েটা, তারপর ভেড়ার মতো হলদে-হলদে দাঁতগুলো দিয়ে কামড় বসায় সেটার ওপর—জিভটা পুড়ে যায় আর অধৈর্য হয়ে গোঙাতে থাকে সে।

লোলুপ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে মিস্ত্রি বলে:

'এই ছুঁড়ি, ঘাগরা নামা!'

তারপর যখন মেয়েটি চলে যায় ও আমার কাছে গর্ব করে বলে:

'ঠিক জোয়ান ভেড়ীর মতো—কোঁকড়া চুলে ভরা! দেখনি তুমি? আমি ভাই বুঝলে—এসব ব্যাপারে আমি আবার একটু বাছবিচার করে চলি। আমি তো কখ্‌খনো মেয়েমানুষের কাছে ঘেঁষি না। শুধু কুমারী মেয়ে। এটি হল আমার তের নম্বর—নিকীফরীচের ধরম মেয়ে।'

চুপচাপ শুনি ওর এই উপচে-ওঠা গজালি, আর মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি:

'আর আমি? আমার জীবনটাও এর মতোই হবে নাকি?'

পাউণ্ড হিসেবে বিক্রি হয় সাদা বড়ো রুটিগুলো সেগুলো তৈরি হওয়ামাত্র একটা লম্বা বারকোষে দশ বারোটা সাজিয়ে নিয়ে আমি ছুটে যাই দেরেন্‌কভের

দোকানে। এ ফরমায়েশী কাজটা শেষ হতেই আবার দু-মণী একটা ঝুড়ির মধ্যে রোল আর বন্‌রুটি ভরে দৌড়োই ধর্মীয় শিক্ষানিকেতনের দিকে যাতে ছাত্রদের প্রাতরাশের সময়টায় গিয়ে হাজির হতে পারি। প্রকাণ্ড খাবার-ঘরটার দরজার ঠিক ভেতর-দিকটায় দাঁড়িয়ে আমি রুটি বেচি—'নগদ দামে' কিংবা ধারে—আর দাঁড়িয়ে শুনি তল্‌স্তয় সম্পর্কে ওরা যা কিছু তর্কবিতর্ক করে তার প্রত্যেকটা কথা। শিক্ষানিকেতনের একজন অধ্যাপক, নাম গুসেভ—লেভ তল্‌স্তয় আর তাঁর মতবাদের জাতশত্রু ছিলেন উনি। মাঝেমাঝে আমার ঝুড়িতে রুটির নিচে বই থাকত—গোপনে সেগুলোকে পাচার করতে হত কোনো-কোনো ছাত্রের কাছে। অনেক সময় আবার ছাত্ররাও আমার ঝুড়িতে বই কিংবা কাগজপত্র গুঁজে দিত।

সপ্তাহে একদিন রুটি নিয়ে যেতাম আরো অনেক দূরে—'উন্মাদ আশ্রমে'। মনস্তত্ত্ববিদ বেখ্‌তেরেভ সেখানে রোগীর নমুনা দেখিয়ে অধ্যাপনা করতেন। একদিন উনি ছাত্রদের দেখালেন এমন একটি রোগী যে নিজেকে হোমরা-চোমরা কিছু মনে করে। হাসপাতালের সাদা পোশাক আর মাথায় রাত-টুপি-আঁটা প্যাঁকাটির মতো লোকটা যখন হলঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল তখন তাকে দেখে আমি হাসিই সামলাতে পারিনি। সে কিন্তু আমার পাশ কাটিয়ে হলের ভেতর এগিয়ে গিয়ে একটু থামল, তারপর সিধে তাকাল আমার মুখের দিকে। আমি জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন লোকটার কয়লার মতো কালো অথচ আগুন-ভরা মর্মভেদী চোখদুটো একেবারে আমার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিঁধছে। বক্তৃতার আগাগোড়া সময়টা বেখ্‌তেরেভ যখন দাড়ি চুম্‌রে পাগলটার সঙ্গে রীতিমতো সম্মান করে কথা বলছিলেন,

আমি কেবল গোপনে মুখ ঘষছিলাম একখানা হাত দিয়ে। মনে হচ্ছিল যেন একরাশ জ্বালা-ধরা ধুলো উড়ে এসে পড়েছে মুখে।

ভোঁতা একঘেয়ে মোটা গলায় লোকটা যেন কি দাবি জানাচ্ছিল বেখ্‌তেরেভের কাছে। উদ্ধত ভঙ্গিতে একখানা লম্বা হাত সামনে বাড়িয়ে ধরেছে সে, আর তার লম্বা আঙুলের অনেকটা পেছনে জামার হাতাটা সরে গেছে। আমার মনে হল লোকটার গোটা দেহটাই যেন লম্বা হয়ে ঠেলে এগিয়ে এসেছে, ক্রমে-ক্রমে কাল্‌চে-পানা হাতটা যেন যতোটা খুশি লম্বা হয়ে ঘরের এপাশে এসে আমার গলাটা টিপে ধরবে। লোকটার হাড়্‌ডসার মুখের কালো-কোটরে-বসা কালো চোখদুটোর মর্মভেদী দৃষ্টির মধ্যে যেন ঝিকিয়ে উঠছে ধমক আর দাপট। মজাদার টুপি-পরা এই মানুষটাকে বসে বসে লক্ষ্য করছিল গোটা কুড়ি ছাত্র। অল্প ক-জন মাত্র হাসছে, কিন্তু বেশির ভাগই গম্ভীর, নিবিষ্টচিত্ত। লোকটার জ্বলজ্বলে আগুনে চোখদুটোর তুলনায় ওদের চোখগুলো অসাধারণ রকম বৈচিত্র্যহীন। মনে ভয় জাগিয়ে দেয় লোকটা, চালচলনেও যে বেশ সম্ভ্রমাত্মক কিছু রয়েছে তা সত্যি!

ছাত্রদের নিথর নীরবতার মাঝখানে অধ্যাপকের গলার আওয়াজ পরিষ্কার আর স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁর প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে ভোঁতা গলাটা থেকে কর্কশ চীৎকার উঠছিল, মনে হচ্ছিল যেন মেঝেটার তলা থেকে কেউ কথা বলছে, যেন মৃত্যু-পাণ্ডুর দেয়ালটার ওপাশ থেকে শব্দ আসছে। পাগলটার মন্থর সাড়ম্বর ভাবভঙ্গি অনেকটা আর্চবিশপের মতো।

সে রাতেই এই লোকটাকে নিয়ে আমি ছড়া লিখেছিলাম, লোকটার নাম দিয়েছিলাম 'রাজাদের রাজা, ভগবানের দোসর আর

বুদ্ধিদাতা'। বহুদিন পর্যন্ত লোকটাকে আমি ভুলতেই পারিনি, জীবনটাকে আমার একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে।

সন্ধ্যে ছ-টা থেকে প্রায় বেলা দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতাম কাজে। বিকেলগুলো ঘুমিয়ে কাটাতাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছাড়া পড়ার সময়ই মিলত না। ভিজে ময়দার তাল একপ্রস্থ ঠাসা হয়ে যাবার পর, দ্বিতীয় প্রস্থ যখন তৈরি হয়নি আর রুটিগুলো সবে চুল্লিতে বসানো হয়েছে, তখন যা একটু অবসর পেতাম। কাজের অন্ধিসন্ধিগুলো যতোই আমার জানা হয়ে যেতে লাগল, মিস্ত্রিটাও ততোই ঢিলে দিল কাজে, সব চাপাতে লাগল আমারই ঘাড়ে 'কায়দাকানুনগুলো শিখিয়ে দেবার' নামে। সৌহার্দ-ভরা বিস্ময়ের সুরে তারিফ করে বলত:

'তোমার এলেম আছে। বছর দুয়েকের মধ্যে পুরোদস্তুর কারিগর হয়ে যাবে। সে এক মজাদার ব্যাপার তো। বাচ্ছা ছেলে কেই-বা তোমায় খাতির করবে, আর কেই-বা তোমার কথা শুনবে?'

বই পড়ায় আমার এত উৎসাহ ওর পছন্দ হত না। উৎকণ্ঠিত হয়ে উপদেশ দিত, 'বই ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করো, তার চেয়ে ঘুমোও।' কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করত না কি বইগুলো আমি পড়ি।

স্বপ্ন গুপ্তধন আর তার খাটো-পাওয়ালা নাদুস-নুদুস মেয়েটাকে নিয়েই সে একেবারে মশগুল হয়ে ছিল। মাঝেমাঝেই রাতের দিকে আসত মেয়েটা। তাকে নিয়ে মিস্ত্রি যেত দরদালানটার ভেতর যেখানে ময়দার বস্তাগুলো থাকত সেইখানে, কিংবা ঠাণ্ডার দিন হলে কপালটা কুঁচকে আমায় সে অনুরোধ জানাত:

'আধ-ঘণ্টার জন্য একট বাইরে যাও না।'

আমি বেরিয়ে যেতাম, আর ভাবতাম: এই ভালোবাসা আর

বইয়ে যে-ভালোবাসার কথা লেখে তার মধ্যে কতো আকাশ-পাতাল তফাত!...

দোকানের পেছনে ছোট ঘরটায় থাকত আমার মনিবের বোন। ওর জন্য আমি নিয়মিত সামোভার গরম রাখতাম, কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করতাম দেখা-সাক্ষাৎ না করার। আমাকে বড়ো অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল সে। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ঠিক সেদিনের মতোই অসহ্য চোখদুটো ফিরিয়ে সে শিশুর মতো লক্ষ্য করত আমাকে। আমার সন্দেহ হত ওর চোখের গভীরে যেন একটা হাসি লুকিয়ে আছে—উপহাসের হাসি।

অসাধারণ শারীরিক শক্তিই আমাকে বড়ো কুৎসিত করে তুলেছিল। আমাকে সওয়া পাঁচ-মণী বস্তাগুলো সরাতে দেখে মিস্ত্রি দুঃখ করে বলত:

'তোমার গায়ে তিনটে লোকের সমান জোর বটে, তবে—একটু যেন বেয়াড়া ধরণের! ঠিক ষাঁড়ের মতো, অথচ এদিকে দেখতে শুঁটকো।'

এতদিনে আমি পড়াশোনার দিক দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি। কবিতা ভালো লাগে, এমন কি নিজেও দু-এক ছত্র লিখতে শুরু করেছি। তা সত্ত্বেও কথা বলবার সময় আমি অবশ্য 'আমার নিজস্ব ভাষাই' ব্যবহার করি, বইয়ের ভাষা নয়। আমি জানি আমার কথাগুলো কঠিন, কর্কশ, কিন্তু আমার যেন মনে হয় শুধু এই ভাষার মাধ্যমেই আমার চিন্তার চরম বিশৃঙ্খলাকে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া সম্ভব। একেক সময় আবার ইচ্ছে করেই রূঢ় হই—যে-কোন জিনিস আমার কাছে প্রতিকূল আর বিরক্তিকর ঠেকলেই আমি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠি, তা সে যতো অস্পষ্ট কারণেই হোক না কেন।

আমার এক শিক্ষক ছিল অঙ্কের ছাত্র, সে আমায় ভর্ৎসনা করে বলত:

'তোমার যা কথা বলার ধরণ, তাতে পিত্তি চটে যায়! কথা তো নয় যেন একেকখানা লোহার বাটখারা!'

মোটের ওপর কিশোরদের যেমন সচরাচর হয়ে থাকে—আমার নিজের সম্পর্কে ছিল ভয়ানক অতৃপ্তি, নিজেকে মনে হত স্থূল আর হাস্যাস্পদ। আর আমার চেহারাটাও ছিল তেমনি—কাল্‌মিকদের মতো উঁচু চোয়ালের হাড়। গলার আওয়াজের ওপরও আমার দখল ছিল না।

এদিকে আমার মনিবের বোনটি কিন্তু ডানায় ভর দিয়ে উড়ে-যাওয়া সোয়ালো পাখির মতোই চঞ্চল আর স্বচ্ছন্দগতি, অবশ্য মোটাসোটা গোলগাল ছোট্ট দেহটার তুলনায় ওর চলাফেরার লঘুতা আমার কাছে একটু বেমানান ঠেকত। ওর ভাবভঙ্গিতে, হাঁটাচলার মধ্যে কিছু একটা ছিল যা ঠিক স্বাভাবিক নয়, একটু যেন চেষ্টাকৃত। গলার আওয়াজে ফূর্তির ভাব; মাঝেমাঝে হাসতও, কিন্তু ওর স্বচ্ছ হাসি শুনে আমার মনে হত প্রথম যে-অবস্থার মধ্যে ওকে দেখেছিলাম সেটা এখন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে এই মাত্র। কিন্তু আমি তা ভুলতে চাইনি। স্বাভাবিকের বাইরে যা কিছু আমার মনে দাগ কাটত তাই আমি সযত্নে তুলে রাখতাম স্মৃতির ভাণ্ডারে। অসাধারণটাও যে সম্ভব সেটারও যে বাস্তব অস্তিত্ব আছে তা জানার জরুরি প্রয়োজন ছিল আমার।

মাঝেমাঝে সে জিজ্ঞেস করত:

'কী পড়ছ তুমি?'

আমি সংক্ষেপে জবাব দিতাম পাল্টা প্রশ্ন করার তাগিদে:

'আমি কী পড়ি তাতে তোমার কি আসে যায়?'

এক রাত্রে মিস্ত্রি তার প্রিয়াটিকে আদর করতে করতে আমাকে নেশা-জড়ানো গলায় বলল:

‘একটুখানি বাইরে যাও তো। আর মনিবের ওই বোনটার সঙ্গে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি করলেই তো পারো? এভাবে সুযোগ হাত ছাড়া করো কেন! এদিকে তো ছাত্ররা দিব্যি…’

আমি ওকে জানিয়ে দিলাম ফের যদি এমন ধারা কথা বলে তাহলে লোহার বাটখারা দিয়ে ওর মাথাই ফাটিয়ে দেব। দরদালানে ময়দার বস্তাগুলোর উপর বসতেই আমি ওর গলার আওয়াজ পেলাম কব্জা-ঢিলে দরজার ফাঁক দিয়ে:

‘কেনই বা রাগ করতে যাই? সারাদিন বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকলে এরকম তো হবেই—যেন পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোকরা।’

দরদালানের ভেতর কিচ্-কিচ্ করে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ইঁদুরগুলো। আর ওদিকে চুল্লি-ঘরে তখন মেয়েটা গোঙাচ্ছে আর কাতরাচ্ছে। আমি উঠে বাড়ির আঙিনায় গেলাম। ঝির-ঝির করে হাল্‌কা বৃষ্টি পড়ছে অলস ছন্দে, প্রায় নিঃশব্দেই, গুমোট হাওয়াটা তবু যেন তাজা হয়ে ওঠেনি, পোড়া গন্ধে ভারি। জঙ্গলে কোথায় যেন আগুন লেগেছে। মাঝ-রাত গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রুটির কারখানার উল্টোদিকের বাড়িটার জানলাগুলো খোলা, আধ-আলো, আধ-অন্ধকার কামরাগুলো থেকে গান ভেসে আসছে:

সেকালের সেই ভার্‌লামি সাধু
কাঞ্চন-প্রভা কান্তি
নেড়া-নেড়ী যতো চেলাদের দেখে
পেতেন পরম শান্তি…

মিস্ত্রির হাঁটুর ওপর সেই মেয়েটা যেভাবে পড়ে আছে, মারিয়া দেরেন্‌কভাকেও আমি সেই অবস্থায় আমার হাঁটুর ওপর কল্পনা করার চেষ্টা করলাম—বুঝতে আমার একটুও বাকি রইল না যে সেটা অসম্ভব। অমন জিনিস চিন্তা করতেই ভয় হয়।

সাঁঝ থেকে ভোর—সারা রাত জেগে
সাধু চালাতেন মোচ্ছব,
সুরা, গান, আর আরো কতো—হুঁ-হুঁ!
রঙ্গ-রসের ছয়লাপ…

অন্য গলাগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল একটা দরাজ মোটা ফূর্তির স্বর আর ওই ইঙ্গিতপূর্ণ 'হুঁ-হুঁ' কথাটার ওপর ঘুরে ফিরে জোর দিচ্ছিল। হাঁটুতে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলাম একটা জানলার ভেতর দিয়ে। লেসের পর্দার ওপাশে দেখলাম চারকোণা একটা ঘরের ধূসর দেয়াল, নীল ঢাকনা দেওয়া ছোট বাতির আলো পড়েছে। বাতির সামনে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে একটা মেয়ে যেন কী লিখছে। এবার সে মাথাটা তুলল। লাল কলমের গোড়া দিয়ে কপালের পাশের চুলটা পেছনে সরিয়ে দিল। মেয়েটির চোখদুটো আধ-বোজা, মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। ধীরে-সুস্থে চিঠিটা ভাঁজ করে খামের কিনারায় জিভ চালিয়ে সে খামটা এঁটে দিল। তারপর টেবিলের ওপর সেটাকে ছুঁড়ে দিয়ে একবার আঙুলটা নাচাল লেপাফাখানা লক্ষ্য করে। মেয়েটার তর্জনীটা আমার কড়ে আঙুলের চেয়েও ছোট। খামখানা কিন্তু সে আবার তুলে নিল ভুরু কুঁচকে। খামটা ছিঁড়ে পুরো চিঠিটা পড়ল আরেকবার, তারপর আরেকখানা খামের ভেতর পুরে সেটা এঁটে দিল। টেবিলের

ওপর ঝুঁকে পড়ে এবার সে লিখল ঠিকানাটা। তারপর শান্তির সাদা নিশান ওড়াবার মতো করে চিঠিখানা হাওয়ায় দোলাতে লাগল শুকোবার জন্য। পায়ের ডগায় ভর দিয়ে পাক খেয়ে হাততালি দিয়ে সে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল আমার নজরের বাইরে ঘরের কোণের বিছানাটার দিকে। যখন আবার ফিরে এল দেখলাম ব্লাউজটা খুলে ফেলেছে। কাঁধদুটো সুগোল, মাংসল। টেবিল থেকে বাতিটা তুলে নিয়ে আবার সে অদৃশ্য হল কোণের দিকে। কেউ যখন মনে করে সে একলা রয়েছে, তখন দৈবাৎ তার চালচলন বাইরের লোকের নজরে পড়লে অনেক সময় পাগলের মতো ঠেকতে পারে। উঠোনের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আমার মনে হল মেয়েটা যখন তার ছোট ঘরখানার ভেতর একা থাকে তখন কী অদ্ভুত ভাবেই না সময় কাটায়!

কিন্তু সেই হলদে-চুলো ছাত্রটা যখন ওকে দেখতে আসে, আর খুব চাপা-গলায়, প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কী নিয়ে আলোচনা করে—তখন যেন মেয়েটি নিজেকে গুটিয়ে নেয়, স্বাভাবিকের চেয়েও ছোট মনে হয় তাকে। ভীরু চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে হাত দুখানা পেছনে কিংবা টেবিলের নিচে লুকোয়। হলদে-চুলো ওই ছাত্রটাকে আমার পছন্দ হয় না। দেখতে পারি না দুচোখে।

এইসব কথা ভাবছিলাম, এমন সময় মিস্ত্রির সেই মেয়েটা চাদর মুড়ি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল। আমায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল:

'ভেতরে যাও…'

বারকোষের ওপর ভিজে ময়দার তালটা ছুঁড়ে দিয়ে মিস্ত্রি খুব গর্ব করে আমাকে তার প্রেমিকাটির কথা শোনায়, বলে মেয়েটার নাকি তৃপ্ত দেবার অক্লান্ত ক্ষমতা। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ভাবি:

'এ আমি কোথায় চলেছি?'

আমার মনে হতে থাকে যেন খুব কাছেই কোথাও—কোনো একটা কোণাঘুঁজির মধ্যে ওৎ পেতে আছে আমার দুর্ভাগ্য!

রুটির কারখানার কাজ এত ভাল চলছিল যে দেরেন্‌কভকে আরো বড়ো একটা জায়গার ফিকিরে থাকতে হল। আরেকজন লোক নেবার কথাও সে ভাবল। এ হলে তো খুবই ভাল। আমার একার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড চাপ যাচ্ছে, ক্লান্তিতে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাবার অবস্থা।

মিস্ত্রি আমায় কথা দিল, 'নতুন জায়গায় তো তুমি কারিগরের প্রধান সাগরেদ হিসেবে কাজ করবে। আমি ওদের বলে দেব যাতে মাসে দশ রুবল মাইনে বাড়িয়ে দেয়। নিশ্চয় বলব।'

ও যে কেন আমাকে কারিগরের প্রধান সাগরেদ হিসেবে চায় সে আমি ভালো করেই জানতাম। কাজ ও বরদাস্ত করতে পারে না, আর আমি কাজ করি আগ্রহ নিয়ে। আমার পক্ষে পরিশ্রমের ক্লান্তিটাই বেশি কাম্য। এতে আমার মনের অস্বস্তিটা চাপা পড়ে, আর যৌন তাগিদের তাড়না সংযত হয়। কিন্তু পড়াশোনার সুযোগ আর মেলেই না বলতে গেলে।

মিস্ত্রি বলে, 'তোমার ওই কেতাব পড়া বন্ধ করেছ ভালোই হয়েছে। ইঁদুরের জলখাবার ছাড়া আর কোন্ কাজে লাগবে ওগুলো! তবে—সত্যিই কি তুমি কখনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখ না? নিশ্চয় দেখ! মুখ বুজে থাক, তাই। এটা মজাদার ব্যাপার তো। স্বপ্নের কথা বললে কী দোষ হয় শুনি? এতে তো কারুর কোনো ক্ষতি নেই…'

আমার সঙ্গে ওর বরাবরই খুব সদ্ভাব ছিল। আমার সম্পর্কে ওর খানিকটা সত্যিকারের সম্ভ্রমবোধও ছিল মনে হয়। কিংবা হয়তো ভয়

করত আমাকে, কারণ আমি ছিলাম আমাদের মনিবের আশ্রিত। অবশ্য তাই বলে ওর নিয়মিত চুরি-চামারি কখনো বন্ধ হয়নি।

আমার দিদিমা মারা গেলেন। কবর হবার সাত হপ্তা বাদে একটা চিঠি মারফৎ তাঁর মৃত্যুর খবর পেলাম। চিঠিটা লিখেছিল আমারই এক মামাতো ভাই। কমার ধার না ধেরে ছোট্ট চিঠিখানায় সে জানিয়েছে যে আমার দিদিমা নাকি ভিক্ষে করতে গিয়ে গির্জার চাঁদনি থেকে পড়ে পা ভেঙেছিলেন। আটদিনের দিন জখমটাতে 'পচ্ ধরে যায়'। পরে জেনেছিলাম আমার দুই সোমত্ত জোয়ান মামাতো ভাই আর বোন তার অপোগণ্ড বাচ্চাগুলোকে নিয়ে নাকি দিদিমার ঘাড়েই ভর করেছিল, ওঁর ভিক্ষে-করা অন্ন ধ্বংস করত তারা। একজন ডাক্তারকে ডাকার বুদ্ধি পর্যন্ত ওদের ঘটে ছিল না।

মামাতো ভাইটি লিখেছিল:

'পেত্রপাভ্লভ্স্ক গির্জার উঠোনে আমরা তাহাকে কবর দিয়াছি সেখানে আমাদের পরিবারের সকলেরই মাটি হইয়াছিল আমরা শবানুগমন করি এবং ভিখারীরাও আসিয়াছিল তাহারা সকলেই তাহাকে ভালোবাসিত এবং কাঁদাকাটিও করিয়াছে। দাদামহাশয়ও কাঁদিলেন তিনি আমাদের তাড়াইয়া দিয়া একা তাহার কবরের পাশে বসিয়া রহিলেন আমরা তাঁহাকে ঝোপের আড়াল হইতে দেখিতেছিলাম তিনি কাঁদিতেছিলেন তিনিও শীঘ্রই ধরাধাম ত্যাগ করিবেন।'

আমি কাঁদিনি। কিন্তু মনে পড়ে—যেন একটা বরফ হাওয়ার ঝাপ্টা চলে গিয়েছিল আমার ওপর দিয়ে। উঠোনের কাঠের গাদার ওপর বসে সে-রাতটিতে আমি আকুল হয়ে কেবলই ভেবেছিলাম। কাউকে আমার দিদিমার কথা শোনাই, বলি তাঁর দরদী মন, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা

আর প্রত্যেকের ওপর তাঁর মায়ের মতো স্নেহের কথা। অনেকদিন পর্যন্ত এই আকুল ইচ্ছাটাকে আমি বুকের ভেতর জীইয়ে রেখেছি, কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না যাকে এসব কথা শোনাতে পারি। তারপর অবশেষে এ-কামনা আপনা হতেই পুড়ে নিঃশেষ হল, অচরিতার্থই রয়ে গেল।

এই দিনগুলোর কথা আমার বহু বছর বাদেও মনে পড়েছিল— যখন আ. প. চেখভের লেখা সেই কোচম্যানের গল্পটা পড়ি। আর কাউকে না পেয়ে কোচম্যান তার ঘোড়াটাকেই শুনিয়েছিল ছেলের মৃত্যুর কথা। আশ্চর্য বাস্তব সে কাহিনী। আমার আপশোস হত সেই তীব্র শোকের দিনগুলোয় ঘোড়া দূরে থাক, একটা কুকুরও আমার জোটেনি কথা-বলার মতো। আপশোস হত, অন্তত ইঁদুরগুলোর কাছে আমার মনের দুঃখ জানাবার কথা তখন ভাবিনি কেন। রুটির কারখানায় ওদের সংখ্যা তো বড়ো কম ছিল না, আর আমার সঙ্গে ওদের সৌহার্দও ছিল যথেষ্ট।

পুলিশের লোক নিকীফরীচ আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে ক্ষুধার্ত শিকারী বাজের মতো। লোকটা গাঁট্টাগোঁট্টা শক্তসমর্থ বুড়ো মানুষ, রূপোলি কদম-ছাঁট চুল, চওড়া দাড়ি সবসময়ই ছিমছাম করে ছাঁটা আর আঁচড়ানো। ক্রিস্‌মাসের দিনে জবাই করা হবে বলে লোকে যেমন পুরুষ্টু হাঁসের ওপর নজর রাখে, তেমনি করে আমার ওপর নজর রাখত লোকটা।

'শুনেছি তুমি নাক বই-টই পড়তে ভালোবাস', আলাপ জমায় সে এইভাবে। 'বেশ তো, তা কী ধরণের বই পড়া হয় শুনি? বাইবেল পড়ো বুঝি, কিংবা সাধুসন্তদের জীবনী?

হ্যাঁ। বাইবেল আমি জানি, আর দৈনিক শাস্ত্রানুশীলনটাও

আমার জানা আছে। শুনে নিকীফরীচ যেন কেমন হতভম্ব হয়, একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে যায়।

'হুম্‌ম্‌! তা বেশ, ভালো ভালো বই পড়তে আইনের দিক থেকে বাধা নেই। আর কাউণ্ট তল্‌স্তয়? তার লেখাটেখা পড়েছ কখনো?'

তল্‌স্তয়ের রচনাও আমি পড়েছি; তবে—মনে হল যেন আমি তাঁর যে বইগুলো পড়েছি সেগুলোর সম্পর্কে পুলিশের লোকটার তেমন আগ্রহ নেই। বলে:

'ব্যস্‌ বুঝেছি, ওই সাধারণ বইগুলোর কথা বলছ, ও রকম তো সবাই লেখে। তবে তার নাকি অন্য অনেক বই আছে। লোকে বলে শুনতে পাই—সে-সব নাকি পাদ্রি পুরোহিতদের বিরুদ্ধে লেখা। সে-সব বই পড়তে তবে না কাজের কাজ হত?'

'অন্য অনেক বই'ও অবশ্য আমি পড়েছি—হেক্টোগ্রাফ করা সেই বইগুলো। তবে আমার কাছে সে-সব বড়ো জোলো মনে হয়েছে, আর পুলিশের সঙ্গে আলাপ করার বিষয়ও নয় সেটা।

রাস্তায় কয়েকবার এমনি ধরণের একটু-আধটু আলাপের পর বুড়ো লোকটা আমায় তার ডেরায় যাবার জন্য সাধাসাধি শুরু করল।

'আমার গুম্‌টিতে এসো না একদিন, চা খাওয়া যাবে।'

ও যে কোন্‌ তালে রয়েছে সে আমি বুঝতে পেরেছি; তবুও—আমার যেতে ইচ্ছে হল। আমার গুরুদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সকলেরই মত হল পুলিশের লোকটার অতিথি-সৎকারে অবহেলা দেখালে মাঝখান থেকে হয়তো রুটির কারখানা সম্পর্কে তার সন্দেহটাই আরো বেড়ে যাবে।

তাই—চললাম নিকীফরীচের গুম্‌টি-ঘরে। ছোট নিচু ঘরটার প্রায় তিনভাগের একভাগ জুড়ে রয়েছে রুশদেশী চুল্লিটা। অন্য তৃতীয়াংশে প্রকাণ্ড

একটা ডবল-বিছানা রয়েছে ছিট কাপড়ের আড়ালে। টক্‌টকে লাল ঢাকনাওয়ালা অসংখ্য বালিশ পাহাড় করে রাখা। বাকি জায়গাটুকুতে একটা থালাবাসনের তাক, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর ঘরের একমাত্র ছোট জানলাটার পাশে একটা কাঠের বেঞ্চি। উর্দির কোর্তার বোতাম খুলে দিয়ে নিকীফরীচ বসেছে বেঞ্চিটায়, গোটা জানলাটাই তার পিঠে ঢাকা পড়ে গেছে। টেবিলের ধারে নিকীফরীচের মুখোমুখি বসেছি আমি, তার বউয়ের পাশে, বউটি বছর কুড়ি বয়েসের যুবতী, ভরাট বুক, গালদুটো লাল, আর তার অদ্ভুত ধূসর-নীল চোখের চাউনি দুষ্টুমি আর শয়তানি-ভরা। খেয়াল-খুশিমতো ভরা টক্‌টকে লাল ঠোঁটদুটো ফুলোচ্ছে। গলার স্বরেও যেন একটা ক্রোধের শুষ্ক আভাস।

পুলিশটা বলে, 'আমি জানতে পেরেছি আমার ধর্ম-মেয়ে সেক্‌লেতেইয়া নাকি তোমাদের রুটির কারখানাটার কাছে ঘুরঘুর করে। বড়ো বজ্জাত ছুঁড়ি , দুশ্চরিত্রা। সব মেয়েমানুষই বজ্জাত।'

'সবাই নাকি?' জিজ্ঞেস করে ওর বউ।

'হ্যাঁ, গুণে গুণে প্রত্যেকটা!' জোরের সঙ্গে পাল্টা জবাব দেয় নিকীফরীচ, আর ছটফটে ঘোড়া যেমন জিন-রেকাবে আওয়াজ তোলে তেমনি করে মেডেলগুলো ঝাঁকায় ঝন্‌ঝন্‌ করে। পিরিস থেকে এক চুমুক চা গলায় ঢেলে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ফের বলে:

'দুশ্চরিত্রা আর বদমায়েশ—গলির সবচেয়ে ছোটলোক বেশ্যাটা থেকে আরম্ভ করে একেবারে রাণী মহারাণী পর্যন্ত! সেভা-দেশের সেই রাণীটা শুধু লাম্পট্যের লোভেই দু-হাজার মাইল মরুভূমি পার হয়ে রাজা সলমনের ঘরে উঠেছিল! আর আমাদের রাণী কাথারিনও। তাঁকে 'মহিমান্বিতাই' বলো আর যাই বলো…'

তারপর সে বিশদভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে রাজপ্রাসাদের কোনো এক সাধারণ ভৃত্যের কাহিনী—জার-সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এক রাত কাটিয়ে সে নাকি রাতারাতি সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটা ধাপ ডিঙ্গিয়ে একেবারে সার্জেণ্ট থেকে জেনারেল হয়ে গিয়েছিল। মন দিয়ে শুনতে শুনতে নিকীফরীচের বউ মাঝেমাঝে ঠোঁট দিয়ে জিভ চাটে আর টেবিলের তলায় আমার পা ওর পা দিয়ে ধাক্কা দেয়। নিকীফরীচ বেশ রসিয়ে রসিয়ে মোলায়েমভাবে কথা বলছে। তারপর অলক্ষ্যেই কখন যেন প্রসঙ্গ পাল্টে একেবারে নতুন বিষয়ের মধ্যে এসে পড়ে:

'এখন ধরো যেমন একটি ছেলে রয়েছে আমাদের এই তল্লাটেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে প্রথম বর্ষ। নাম তার প্লেৎনিয়ভ…'

নিঃশ্বাস ফেলে ওর বউ বলে বসে:

'দেখতে খুব ভালো নয়, তবে—চমৎকার লোক!'

'কে চমৎকার?'

'মিস্টার প্লেৎনিয়ভ।'

'এক নম্বর কথা হল, মিস্টারটা বাদ দাও। পড়াশোনা যখন শেষ করবে তখনই হবে মিস্টার, আপাতত সে সাধারণ একটা ছাত্র, অন্য যে কোনো ছাত্রের মতো। ওরকম হাজার গণ্ডা মেলে। দু-নম্বর কথা হল—চমৎকার কেন বলছ?'

'কী ফূর্তিবাজ ছেলে। আর বয়সও কম।'

'এক নম্বর কথা হল, মেলার আসরের ভাঁড়রাও তো ফূর্তিবাজ।'

'ভাঁড়দের তো ফূর্তিবাজ হবার জন্য মাইনে দিতে হয়।'

'চুপ করো! তারপর দু-নম্বর কথা হল একটা কুত্তাও বয়েসকালে জোয়ান থাকে…'

‘ভাঁড়গুলো তো বাঁদর বিশেষ…’

‘একবার বলেছি তো চুপ করো, মনে নেই? কানে গিয়েছিল?’

‘শুনেছি।’

‘বেশ, তারপর তো…’

বউ বশ মানবার পর নিকীফরীচ আমার দিকে ফিরে উপদেশ দিত:

‘যা বলছিলাম, এই প্লেৎনিয়ভ ছোঁড়াটা কৌতূহলজনক। তোমার সঙ্গে তার পরিচয় থাকা উচিত!’

নিকীফরীচ হয়তো অনেক সময় আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে থাকবে। তাই আমি জবাব দিই:

‘হ্যাঁ, চিনি বৈকি।’

‘চেনো, অ্যাঁ? হুম্‌ম্‌…’

ওর গলার স্বরে হতাশার ভাব। হঠাৎ বেঞ্চির ওপর ঘুরে বসে ও; মেডেলগুলোও তাই ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। আমি খুব সাবধান রয়েছি এদিকে। কয়েকটা প্রচার-পত্রের কথা আমার জানা ছিল যেগুলো প্লেৎনিয়ভ হেক্টোগ্রাফে ছেপে বের করেছে।

আমার পা তার পায়ে ধাক্কা দিয়ে বউটা সমানে খোঁচাচ্ছে বুড়োটাকে। আর সেও খুব জাঁক দেখিয়ে বুক ফোলাচ্ছে, ময়ূরের বর্ণাঢ্য পুচ্ছের মতো তার কথার ভাণ্ডার মেলে ধরছে আমার সামনে। কিন্তু এদিকে টেবিলের তলায় তার বউ ফষ্টিনষ্টি করছে বলে আমি অতো মন দিয়ে শুনতে পারিনি তার কথা, এবারও তাই প্রসঙ্গান্তরটা কখন ঘটল টেরই পাইনি। গলার স্বর নামিয়ে অনেকখানি ভারিক্কি করে সে বলে:

‘একটা অদৃশ্য সূতো—বুঝলে না ব্যাপারটা?’ বড়ো বড়ো গোল চোখ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে। ‘মহানুভব সম্রাটকে যদি মাকড়সা হিসেবে কল্পনা করো…’

‘ও মা, এ কী কথা বলছ গো?’ বউটা বলে ওঠে।

‘বক্‌বক কোরো না তো তুমি! বোকা হাঁদা কোথাকার! পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যই ওভাবে বলেছি, নিন্দে করে নয়, হতচ্ছাড়ি। যা, সামোভারটা নামা!’

চোখ কুঁচকে ভ্রূকুটি করে সে সযত্নে বোঝাতে থাকে:

‘একটা অদৃশ্য সূতো—বলতে পারো একটা মাকড়সার জালের মতো। সে জালের মাঝখানে বসে আছেন মহামহিম সম্রাট জার তৃতীয় আলেক্সান্দার, সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ইত্যাদি ইত্যাদি, আর সে জাল পাক খেয়ে খেয়ে নেমে এসেছে সম্রাটের একেকজন মন্ত্রী, একেকজন মহানুভব রাজ্যপালের মারফৎ। প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারী হয়ে একেবারে আমার কাছে অবধি, এমন কি সৈন্যদলের সবচেয়ে নিচু পদের সেপাইটা অবধি নেমে এসেছে এই অদৃশ্য জালখানা। এ জাল ছাড়িয়ে আছে সর্বত্র, প্রত্যেকটা জিনিসকে জড়িয়ে আঁকড়ে রয়েছে এ জালের সূতো। আর, জারের এই অদৃশ্য শক্তির জোরেই সাম্রাজ্যটা টিঁকে আছে এত যুগ ধরে। শুধু—ওই ধূর্ত ইংরেজ রাণীটা, সে-ই তো যতো পোলীয় ইহুদীর বাচ্চা আর কিছু কিছু রুশকে ঘুষ দিয়ে বাগিয়েছিল, আর এরাও যেখানে যতোটা সম্ভব, চেষ্টা করেছে অদৃশ্য সূতোটাকে ছিঁড়ে দেবার, অথচ ভাব দেখিয়েছে যেন জনসাধারণেরই বন্ধুলোক এরা।’

টেবিলের ওপর ঝুঁকে আমার দিকে মুখখানা বাড়িয়ে ধরে সে চাপা কঠিন স্বরে বলে:

‘বুঝতে পেরেছ? বেশ কথা! কেন এভাবে এসব বলছি তোমায় বল তো? তোমাদের মিস্ত্রি তো খুব প্রশংসা করে তোমার—বলে, তুমি নাকি খুব চালাক ছেলে। খাঁটি মানুষ। কারুর সাতে পাঁচে নেই। যা হোক,

তোমাদের ওই রুটির কারখানাটাতে দেখি যত সব ছাত্রের ভিড়। সারা রাত ওরা দেরেন্‌কভার ঘরেই কাটায়। যদি একজন হত—তা হলে নয় বোঝা যেত। কিন্তু—এতজন মানুষ যে! এর মানে কী? অ্যাঁ? আমি অবিশ্যি ছাত্রদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। আজ ছাত্র আছে—কাল সহকারী উকিল হবে। ছাত্র তো ভালো কথাই। তবে ওরা আবার বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি সবকিছুর মধ্যে মাথা গলাতে চায় কিনা। আর তা ছাড়া জারের শত্রুরা রয়েছে—ওরাই তো উস্কায়! বুঝলে না? আর আরেকটা কথা তোমায় আমি বলে রাখছি…'

কিন্তু ও বলতে যাবার আগেই ঘরের দরজাটা খুলে যায়। একজন বুড়ো লোক ভেতরে ঢোকে: ছোটখাটো মানুষ, লালচে নাক, একটা চামড়ার ফিতে বেঁধে মাথার কোঁকড়া চুলগুলোকে পেছনে হটিয়ে রেখেছে। লোকটার হাতে এক বোতল ভদ্‌কা, আর—মনে হচ্ছে পেটেও পড়েছে কিছু।

'সতরঞ্চ চলবে নাকি হে?' রঙ্গ নরে জিজ্ঞেস করে লোকটা। তারপরেই ছাড়ে মজাতার সব রসের কথার তুবড়ি।

গম্ভীরভাবে নিকীফরীচ বলে, 'ইনি আমার শ্বশুরমশায়।' বোঝা যায় বিরক্ত হয়েছে সে।

একটু বাদে আমি বিদায় নিতে উঠি। ধূর্ত স্ত্রীলোকটা আমাকে বাইরে এগিয়ে দিতে এসে চিম্‌টি কেটে বলে:

'দেখেছ কেমন মেঘ করেছে? আগুনের মতো লাল! …'

ছোট্ট একটুকরো সোনালি মেঘ ছাড়া এমনিতে আকাশ কিন্তু পরিষ্কার।

আমার গুরুদের আমি খাটো করতে চাই না, তবে একথা ঠিক যে রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে তারা আমায় যা বুঝিয়েছিল তার

থেকে অনেক সরল আর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে এই পুলিশের লোকটা। কোথাও একটা মাকড়সা ওৎ পেতে বসে আছে, আর সেই মাকড়সাটার দেহ থেকে 'অদৃশ্য সূতো' বেবিয়ে এসে জালের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে জীবনের প্রত্যেকটা অঙ্গকে। ক-দিন বাদে যেদিকেই ফিরি নজরে পড়ে শুধু সেই জালের নাছোড়বান্দা প্যাঁচ আর ফাঁসগুলো।

সেদিন সন্ধ্যেয় দোকান বন্ধ হবার পর মারিয়া দেরেন্‌কভা আমায় তার নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। চট্‌পট জানিয়ে দিল পুলিশের লোকটা আমাকে যা বলেছে সে-সব জেনে নেবার জন্য তার ওপর নাকি হুকুম হয়েছে।

আমি পুরো বিবরণটা দেবার পর সে উদ্বিগ্নভাবে চেঁচিয়ে বলল, 'ও ভগবান, তাই নাকি!' তারপর ঠিক ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো ঘরের ভেতর এপাশ-ওপাশ ছুটোছুটি করে হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল। 'কিন্তু— মিস্ত্রিটা কখনও তোমার কাছ থেকে কোনো কথা বের করতে চেষ্টা করেছে? ওর সেই রক্ষিতা মেয়েটা তো আবার নিকীফরীচেরই আত্মীয়, তাই না? লোকটাকে তাহলে তো ছাড়িয়ে দিতে হয়।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম গম্ভীরভাবে। 'রক্ষিতা' কথাটা সে এমন সরাসরি সাদামাটাভাবে বলতে পারল দেখে আমার যেন কেমন ভালো লাগেনি। মিস্ত্রিকে সরাবার যুক্তিটাও আমার পছন্দ হল না।

'দেখো, খুব সাবধানে থেকো কিন্তু!' বলল মেয়েটি। আর বরাবরের মতো এবারও ওর একভাবে-চেয়ে-থাকা চোখদুটোর সামনে অস্বস্তি বোধ হতে লাগল আমার। মনে হচ্ছিল যেন একটা কিছু

জানতে চায় সে আমার কাছে—কিন্তু কী তা বুঝতে পারলাম না। তারপর সে হাতদুটো পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'সবসময় এত গম্ভীর হয়ে থাক কেন?'

'মাত্র ক-দিন হল আমার দিদিমা মারা গেছেন।'

যেন একটু মজা পেল মেয়েটা। হেসে বলল:

'খুব ভালোবাসতে বুঝি ওঁকে?'

'হ্যাঁ। আর কিছু জানতে চান?'

'না।'

আমি চলে এলাম। মনে আছে সে রাতে আমি যে কবিতা লিখেছিলাম তাতে একটা বেপরোয়া পংক্তি জুড়ে দিয়েছিলাম:

'আপনি যা নন সেটাই আপনি দেখাতে চান!'

ঠিক হয়েছিল ছাত্ররা যতোটা সম্ভব রুটির কারখানাটা এড়িয়ে চলবে। এবার থেকে তাই ওদের দেখা পেতাম খুবই কম। বই পড়ে যে-সব বিষয় একটু ঘোলাটে ঠেকত সেগুলো এখন জিজ্ঞেস করে বুঝে নেবার সুযোগ আমার প্রায় হয়ই না। প্রশ্নগুলো তাই একটা খাতায় টুকে রাখতে শুরু করি। কিন্তু একদিন হল কি, খুব ক্লান্ত হয়ে আমার লেখার খাতাটার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই ফাঁকে মিস্ত্রিটা পড়ে নিল লেখাগুলো। আমাকে জাগিয়ে তুলে সে জিজ্ঞেস করল:

'হরদম এ সব তুমি কী লিখছ হে? "গ্যারিবল্ডি কেন রাজাকে তাড়িয়ে দেয়নি?' গ্যারিবল্ডিটা আবার কে? আর এ সব কথাই বা কে কবে শুনেছে? রাজাকে তাড়িয়ে দেওয়া?'

তিরিক্ষি মেজাজে খাতাটা ভিজে ময়দার তাল রাখার বাক্সের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা চলে গেল। চুল্লির ওধার থেকে গজর-গজর করতে লাগল:

'হুঁঃ, উনি তাড়াবেন রাজারাজড়াদের, বললেই হল! মজাদার ব্যাপার তো। ও সব চালাকি ছেড়ে দাও হে। মাথায় কেতাব ঢুকেছে কিনা! চার-পাঁচ বছর আগে সারাতভ শহরে তোমার মতো সব বইয়ের-পোকাগুলোকে পুলিশরা এলোপাথাড়ি ধরে-পাকড়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিকীফরীচেরও নজর রয়েছে তোমার ওপর, হ্যাঁ। ও সব রাজা-গজাদের কথা ভুলে যাও। ওরা তো আর পায়রা নয় যে তাড়া করে বেড়াবে!'

ভালো মনেই বলেছিল লোকটা। কিন্তু যেভাবে জবাব দিলে লাগসই হত সেভাবে জবাব দিতে আমি পারিনি। মিস্ত্রির সঙ্গে কোনো 'বিপজ্জনক প্রসঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল আমার।

একটা বিশেষ ধরণের কৌতূহলোদ্দীপক বই সে-সময় শহরের লোকদের হাতে হাতে ঘুরছিল। সর্বত্র এই বইটা পড়া হচ্ছিল, তুমুল-কলহও হচ্ছিল এর বিষয়বস্তু নিয়ে। পশু-চিকিৎসার ছাত্র লাভ্‌রোভকে বললাম একখানা কপি জোগাড় করে দিতে; ও কিন্তু বড়ো নিরুৎসাহ করে দিল আমাকে:

'না, বন্ধু তা হয় না। কোনো প্রশ্নই ওঠে না তোমাকে দেবার। তবে, একটা কাজ করতে পারো, বোধহয় দুয়েকদিনের মধ্যেই আমার চেনা একটা জায়গায় বইটা পড়া হবে। তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারি সেখানে।'

'স্বর্গারোহণ-পর্ব' দিবসের মাঝ-রাতে আরস্কোয়ে মাঠের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি গট্‌গট্ করে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লাভ্‌রোভের অস্পষ্ট মূর্তিটা—প্রায় পঞ্চাশ পা দূরে। মাঠ একেবারে ফাঁকা। তবু লাভ্‌রোভের উপদেশমতো আমি 'সাবধান' হয়ে হাঁটছি: শিস্ দিয়ে, গান গেয়ে, কখনো বা টলতে টলতে 'মাতাল মজুরের

মতো'। ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ অলসভাবে গড়িয়ে চলেছে মাথার ওপর দিয়ে, আর সোনার তালের মতো চাঁদটা ছুটেছে ওদের ফাঁকে ফাঁকে— মাঠের ওপর ঘন ট্যারচা ছায়া ফেলে, প্রত্যেকটা জোলো-ডোবার মধ্যে রূপালি আর ইস্পাত-রঙের ঝিলিক তুলে। পেছন দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি শহরের রুষ্ট গুঞ্জন।

ধর্মীয় শিক্ষানিকেতন পেরিয়ে খানিকটা ওধারে একটা ফল-বাগিচার বেড়ার সামনে দাঁড়াল আমার সঙ্গী। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরলাম। নিঃশব্দে বেড়াটা ডিঙিয়ে আমরা দুজন এগিয়ে চললাম আগাছা-গজানো ছন্নছাড়া বাগানটার ভেতর দিয়ে। নিচু-হয়ে-ঝুলে-পড়া ডালপালা ঠেলে এগুতে গিয়ে শিশিরের বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো গা ভিজিয়ে দিল আমাদের। একটা বাড়ির সামনে এসে খড়খড়ি-আঁটা জানলার ওপর টোকা দিতেই খড়খড়িটা খুলে গেল। দাড়িওয়ালা একখানা মুখ উঁকি দিল ভেতর থেকে। মুখখানার পেছনে অন্ধকার, কোনো সাড়াশব্দ নেই।

'কে ওখানে?'

'ইয়াকভের বন্ধু।'

'উঠে এসো।'

দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আরো কয়েকজন লোকের অস্তিত্ব টের পেলাম আমি। কাপড়-জামার খস্‌খসানি, হাঁটাচলার শব্দ আসছিল। কানে এল একটা চাপা কাশি, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্তা। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতেই আমার মুখের ওপর আলো পড়ল, এক নজরে দেখে নিলাম দেয়ালের ধারে ধারে বসে আছে কয়েকটি কালো-কালো মূর্তি।

'সবাই হাজির?'

'হ্যাঁ।'

'জানলার ওপর কিছু টাঙিয়ে দাও, তাহলে খড়খড়ির বাইরে থেকে আলো দেখা যাবে না।'

গম্‌গমে গলায় কে যেন রাগ করে বলে উঠল:

'এইরকম একটা পোড়ো বাড়িতে জড়ো হবার বুদ্ধিটা কার মাথায় এসেছিল শুনি?'

'অতো জোরে—নয়!'

কোণের দিকে একজন একটা ছোট বাতি জ্বালল। ঘরটা ফাঁকা, আসবাবপত্র নেই। দুটো বাক্সের ওপর আড়াআড়ি পাতা একখানা তক্তার ওপর পাঁচজন লোক সার দিয়ে বসে আছে—বেড়ার ওপর পাতিকাকের মতো। উল্টো-করে বসানো আরেকটা বাক্সের ওপর বাতিটা। আরো তিনজন লোক বসেছে দেয়াল ঘেঁষে, মেঝের ওপর। জানলার চৌকাঠে পা ঝুলিয়ে বসেছে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে দেখতে একটি যুবক, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। দাড়িওয়ালা লোকটি আর এই যুবকটিকে ছাড়া বাকি সবাইকে আমি চিনতাম। গম্ভীর মোটা গলায় দাড়িওয়ালা লোকটা ঘোষণা করল, 'ভূতপূর্ব নারোদোভোলেৎস্'* জর্জ প্লেখানভের লেখা 'আমাদের মতদ্বৈধতা' নামে একটা পুস্তিকা এখন পড়ে শোনাবে সে।

---

* নারোদোভোলেৎস্—নারোদ্‌নিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। জ·ভ· প্লেখানভ এক রুশ মার্কসবাদী, যিনি নারোদ্‌নিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, এই পুস্তিকা এবং তাঁর অন্যান্য রচনাতেও প্রমাণ করেছিলেন যে নারোদ্‌নিক্ মতবাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ভাবে নারোদনিৎচেস্‌ৎভো'র আদর্শগত পরাজয়ের পথের সূচনা হয়, যে-কাজ ভ· ই· লেনিন চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

দেয়ালের ধারে ছায়ার আড়াল থেকে কে একজন গাঁক-গাঁক করে উঠল:

'ও সব তো আমাদের জানাই আছে!'

একটা মজার উত্তেজনা অনুভব করছিলাম আমি। রহস্যময় আবহাওয়াটাই তার কারণ—সমস্ত কাব্যরসের মধ্যে এই রহস্যময়তার আকর্ষণটাই সবচেয়ে বেশি। ধর্মমন্দিরে প্রথম দীক্ষার দিনে একজন খাঁটি ধর্মবিশ্বাসীর যেমন অনুভূতি হয়, আমার ঠিক তেমনিই মনে হচ্ছিল আজ—মনে পড়ে যাচ্ছিল গুহাশ্রয়ী আদিম খ্রীষ্টানুগামীদের কথা। গম্‌গমে গম্ভীর গলায় প্রত্যেকটা শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণ সারা ঘরটাকে ভরে তুলেছিল।

এককোণ থেকে আবার কে যেন গাঁক-গাঁক করে উঠল:

'ঘোড়ার ডিম যতো!'

কোণের দিকটায় যে মূর্তিগুলো বসেছিল তাদের মাথার ওপর একটুকরো তামা ম্যাট্‌ম্যাট করছে—অন্ধকারের ভেতরে রহস্যময় দেখাচ্ছে সেটাকে। রোমান যোদ্ধাদের তামার শিরস্ত্রাণের কথা মনে পড়ছিল আমার। একটু বাদেই বুঝলাম ওটা নিশ্চয় চুল্লির ড্যাম্পারের* হাতলটা।

ঘরের ভেতর চাপা গলার আওয়াজ ক্রমে গরম গরম কথার মারপ্যাঁচে ঘোলাটে এলোমেলো হয়ে উঠল। খানিক বাদে বক্তাদের মধ্যে কে যে কী বলছে বোঝাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমার ঠিক মাথার ওপর জানলার চৌকাঠটা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল বিদ্রূপের সুরে:

'ব্যাপারটা কী? কি পড়া হবে, নাকি হবে না?'

---

* ড্যাম্পার—উনুনের দহন-নিয়ন্ত্রক ধাতুর পাত।

বলছিল লম্বা-চুলওয়ালা ফ্যাকাশে চেহারার সেই ছেলেটা। কথাবার্তা বন্ধ হল, আবার শোনা যেতে লাগল পাঠকের গুরুগম্ভীর মোটা গলা। জ্বলন্ত সিগারেটের লাল আগুন মিটমিট করছে আর মাঝেমাঝে একেকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠতেই আলো পড়ছে চিন্তাচ্ছন্ন মুখগুলোর ওপর। কেউ চোখ আধ-বুজে রয়েছে, কেউ-বা বড়ো বড়ো চোখ করে চেয়ে আছে।

পড়া চলল এত দীর্ঘসময় নিয়ে যে শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অবশ্য তীক্ষ্ণ, উদ্দীপনাময় শব্দের বিন্যাসে লেখকের স্বচ্ছ চিন্তাধারা যে-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাতে আমার ভালই লাগছিল।

তারপর—হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে পাঠক পড়া বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা গম্‌গম্‌ করে উঠল ক্রুদ্ধ মন্তব্যে:

'দলত্যাগী বেইমান!'

'ফাঁকা আওয়াজই সার!'

'আমাদের শহীদদের রক্ত অপবিত্র করেছে!'

'জেনেরালভ, উলিয়ানভের ফাঁসি হয়ে যাবার পর…'

জানলার চৌকাঠ থেকে ছোকরা যুবকটি আবার বলে উঠল:

'ভদ্রমহোদয়গণ! এভাবে গালিগালাজ না করে দরকারী আলোচনা শুরু করে দিলে হয় না?'

তর্কবিতর্ক আমার বরদাস্ত হত না, ও জিনিস আমি মন দিয়ে অনুধাবনই করতে পারতাম না। উত্তেজিত চিন্তার অবাধ্য লাফ-ঝাঁপের সঙ্গে তাল রেখে চলা আমার পক্ষে কঠিন; আর তর্ক-রসিকদের উলঙ্গ আত্মম্ভরিতা দেখে বরাবরই আমার বিরক্তি জাগত মনে।

সামনের দিকে ঝুঁকে জানলার চৌকাঠে বসা ছোকরাটি আমায় বলল:

‘তুমি পেশ্‌কভ না? সেই রুটির দোকানের তো? আমি ফেদোসিয়েভ। আমাদের দুজনের আলাপটা হয়ে যাওয়া উচিত। দেখ— এখান থেকে আমাদের সত্যিকারের কোনো লাভ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে গোলমাল চলবে, অথচ কোনো লাভই হবে না। তার চেয়ে বরং চল না দুজন বেরিয়ে যাই?’

ফেদোসিয়েভের কথা আমি আগেও শুনেছিলাম। শুনেছিলাম ও নাকি খুব নিষ্ঠাবান একদল যুবককে নিয়ে একটা চক্র গড়েছে। আর আমার কাছে ছেলেটার আকর্ষণ হল ওর গভীর চোখ আর ফ্যাকাশে ভাবপ্রবণ মুখখানা।

মাঠটার ভেতর দিয়ে দুজন হেঁটে আসছি। ও জানতে চাইল আমার জীবনের সব কথা: মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে কিনা, কী কী বই পড়েছি, কতোখানি অবসর আছে আমার হাতে, ইত্যাদি। নানা কথার ফাঁকে বলল:

‘তোমাদের ওই রুটির কারখানাটার কথা আমি শুনেছি। ও সব বাজে বোকামির মধ্যে থেকে সময় নষ্ট করছ দেখে আমার অবাকই লাগছে। এর মধ্যে তুমি কাজের কী পেলে?’

কিছুদিন থেকে অবশ্য আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল ওখানে থেকে আমার কোনো লাভ নেই। কথাটা তাকে বলতে সে বেশ খুশিই হয়েছে মনে হল। যাবার সময় বেশ আন্তরিকভাবেই সে আমার হাতে হাত মেলাল। প্রসন্ন হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, দুয়েকদিনের মধ্যেই সে শহর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে প্রায় হপ্তা-তিনেকের

জন্য। ফিরে আসার পর জানাবে কোথায় কী ভাবে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে।

রুটির কারখানার কাজ বাস্তবিকই খুব ভাল চলছিল তখন, কিন্তু আমার কাছে দিনদিনই সবকিছু বড়ো দুর্বিষহ ঠেকতে লাগল। নতুন জায়গায় কারখানা উঠে আসার পর আমার কাজ আরো অনেক বেড়ে গেছে। রুটির কারখানার কাজ ছাড়াও আমাকে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বন্‌রুটি আর রোল পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়, অ্যাকাডেমি আর 'অভিজাত ঘরের তরুণী মহিলাদের বিদ্যালয়েও' রুটি বেচতে হয়। ঝুড়ি থেকে রোল তুলে নিয়ে তরুণী মহিলারা সেখানে চিঠি গুঁজে দেয়, আর প্রায়ই তাজ্জব হয়ে দেখি চিঠি লেখার চমৎকার সেই কাগজগুলোর মধ্যে ছেলেমানুষী হাতের লেখায় অতি অশ্লীল সব শব্দ লেখা। বড়ো অদ্ভুত লাগত দেখতে যখন এই অনাবিল-দৃষ্টি অপাপবিদ্ধা কুমারীর দল ভিড় করে দাঁড়াত আমার ঝুড়িটাকে ঘিরে—আর ফূর্তিতে কিচির-মিচির করে, ভেংচি কেটে, ছোট ছোট গোলাপী হাতের থাবা দিয়ে রোলগুলো উল্টেপাল্টে দেখত, বড়ো অদ্ভুত লাগত ওদের দেখতে, আর ওদের দেখতে দেখতে জানতে চেষ্টা করতাম ওদের ভেতর কে সে মেয়েটি যে অমন নির্লজ্জ কথাগুলো আমাকে লিখতে পারল? অমন জঘন্য নিষিদ্ধ শব্দগুলোর আসল মানে বোধহয় ওরা জানতই না। নোংরা 'সান্ত্বনা-গৃহগুলোর' কথা মনে পড়তেই নিজেকে প্রশ্ন করি:

'এও কি হতে পারে যে সেই খুপরিগুলো থেকে "অদৃশ্য সূতোটা" এখানে পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে?'

ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, শামলা রঙ, সুপুষ্ট বুক আর ঘন কালো বিনুনী তার। একদিন দরদালানের ভেতর আমায় দাঁড় করিয়ে ও তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

'আমার এই চিঠিটা যদি ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দাও তোমায় দশ কোপেক দেব।'

নরম কালো চোখদুটো ওর জলে ভরে উঠেছে। আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়াল মেয়েটা, সমস্ত মুখ কান টকটকে লাল হয়ে উঠল। বাহাদুরি দেখিয়ে আমি দশ কোপেক নিতে অস্বীকার করলাম, তবে চিঠিটা নিলাম। ঠিকানায় পৌঁছেও দিলাম সেটা। যার কাছে দিয়েছিলাম সে একজন ছাত্র। রোগা পাতলা, গালদুটোয় ক্ষয়রোগীদের মতো রক্তিমতা। উচ্চতর আদালতের একজন হাকিমের ছেলে সে। তামার খুচরো পয়সা উদাসীন নীরবতার সঙ্গে গুণে সে আমায় পঞ্চাশটা কোপেক দিতে গেল। আমি যখন বললাম আমার পয়সার দরকার নেই তখন ফের ওগুলো পকেটে পুরতে গেল সে, কিন্তু হাতটা ওর এত অস্থির যে পয়সাগুলো সব ঝন্‌ঝন্‌ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

শূন্যচোখে ছেলেটা তাকিয়ে দেখল মেঝের ওপর পয়সাগুলোর গড়িয়ে যাওয়া। দুহাত কচলাতে লাগল যতোক্ষণ-না আঙুলের গিঁটগুলো মট্‌মট্‌ করে ওঠে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে উঠল:

'এখন কী করা যাবে? আচ্ছা, এসো তাহলে! ভেবে দেখি একটু ...'

ভেবে ও কতোদূর কী করেছিল জানি না, তবে আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছিল সেই মেয়েটির জন্য। ক-দিন বাদেই ও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। প্রায় পনের বছর বাদে আবার যখন মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে তখন ক্রিমিয়ার এক ইস্কুলের শিক্ষিকা। টি-বি-তে ভুগছে। জীবনে দারুণ আঘাত পেলে যেমন হয় তেমনিভাবে

পৃথিবীর সব কিছুর সম্পর্কেই নির্মম বিতৃষ্ণা নিয়ে কথাবার্তা বলত সে।

রোল ফেরির কাজ হয়ে যাবার পর অল্প খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। তারপর সন্ধ্যে হলে ফের কারখানায় কাজে লাগি—যাতে রাত বারোটার আগেই মিষ্টি রুটিগুলো তৈরি থাকে। আমাদের দোকানটা এখন শহরের থিয়েটার বাড়ির কাছেই, তাই অভিনয় শেষ হবার পরই খদ্দেররা আসে গরম গরম বন্‌রুটি খেতে। সে কাজটা হয়ে যাবার পর সকালের রুটি আর রোলের জন্য ভিজে ময়দার তাল ঠাসতে বসি—শুধু হাতে পনের-কুড়ি মণ ভিজে ময়দার তাল ঠাসাও কিছু ছেলেখেলা ব্যাপার নয়।

এ কাজের পর আবার একটু ঘুমোবার সুযোগ পাই—দু-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার পর আবার বেরিয়ে পড়ি নতুন দিনের সওদা নিয়ে।

এইভাবে চলেছে দিনের পর দিন।

তবু বরাবরই মনের ভেতর রয়েছে সেই অদম্য ইচ্ছাটা—আমার চোখে যা 'মঙ্গলজনক, ন্যায্য আর চিরন্তন' তার বীজ আমাকে মাটিতে পুঁতে যেতেই হবে। মিশুক স্বভাবের মানুষ আমি, ভাল করে গল্প বলতেও পারি কথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর পড়াশোনা—এ দুটোই আমার সব ধ্যানধারণার প্রেরণা জুগিয়েছে। অত্যন্ত নগণ্য, অত্যন্ত মামুলি একটা ঘটনাকে ভিত্তি করেও আমি চমৎকার গল্প তৈরি করে ফেলি—সেই 'অদৃশ্য সূতোর' অদ্ভুত ঘোরপ্যাঁচকে জড়িয়ে। ক্রেস্তোভ্‌নিকভ কারখানা আর আলাফুজভ মিলের মজুরদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বিশেষ করে আমার ভালো লাগত সূতোকলের বুড়ো তাঁতি নিকিতা রুব্‌ৎসভকে। লোকটা চালাক চতুর, ছট্‌ফটে স্বভাবের—

রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটা সূতোকলের কারখানায়ই সে একসময় না একসময় কাজ করেছে।

চাপা ধরা গলায় বুড়ো আমায় বলত, 'পঞ্চাশ আর সাত—সাতান্ন বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি এ দুনিয়ার বুকে, বুঝলি রে আলেক্সেই, আমার মাক্সিমিচ—ওরে আমার বাচ্চা আমার আনকোরা মাকু রে।' কালো চশমার আড়ালে ওর ধূসর চোখের হাসি ফুটে উঠত। চোখদুটো ওর সবসময় যন্ত্রণায় টস্‌টসে। তামার তারে যেমন-তেমন করে বাঁধা চশমাজোড়া ওর নাকের গোড়ায় আর কানের পেছনে সব্‌জে দাগ ফেলেছিল। তাঁতি বন্ধুদের মহলে রুব্‌ৎসভের নাম ছিল 'জার্মান', কারণ জুল্‌ফিজোড়া কামিয়ে নিচের ঠোঁটটার তলে শুধু এক গোছা ঘন ধূসর দাড়ি আর কড়া গোঁফ রেখেছিল ও। লোকটার ছাতিখানা ছিল চওড়া, মাঝামাঝি গড়ন, সারা অঙ্গে একটা বিষণ্ন উৎফুল্লতা লেগে থাকত।

টাক-পড়া এবড়ো-খেবড়ো মাথাখানা দোলাতে দোলাতে বাঁ-কাধটার ওপর হেলিয়ে সে বলত, 'সার্কাস আমার ভালো লাগে। ঘোড়া আর পশুগুলোকে কেমন শেখায়, দেখেছ? বেশ আরাম পাই দেখে। নেহাৎই জানোয়ার—তবু যেন ওদের দেখলে ভক্তি হয়! মনে মনে ভাবি: তাহলে মানুষদেরও নিশ্চয় শেখাবার উপায় আছে কেমন করে মগজ খাটাতে হয়। পশুদের তো সার্কাসের লোকরা মিষ্টি খাইয়ে বশ করে। আমাদের বেলায় অবশ্য মুদির দোকান থেকেই চিনি কেনা চলে। তবে আমাদের যেটা দরকার সেটা অন্য

জাতের চিনি—আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। সে চিনির নাম হল—মনের দরদ। তাই তো বলি হে খোকা: দুনিয়াতে চলবার নড়ি হল দয়াদাক্ষিণ্য, মুগুর নয়—যেমন নাকি আমাদের এই দুনিয়াটার দস্তুর। তাই কিনা বল?'

বুড়ো নিজে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যের ধার ধারে না। লোকের সঙ্গে কথা বলার একটা ব্যঙ্গময়, আধা-গর্বভরা ভঙ্গি আছে ওর; আর তর্ক করবার সময় প্রতিপক্ষকে ইচ্ছে করে অপমান করবার জন্যই খোঁচা দিয়ে ছোটখাটো কড়া কড়া জবাব ছাড়ে। ওর সঙ্গে প্রথম যখন আমার একটা বীয়ারের আড্ডায় সাক্ষাৎ হয় সেদিন তো অতিথিরা সবাই ভয়ানক খেপে গিয়ে ওকে মারতেই গিয়েছিল। দুয়েকটা ঘা পড়েওছিল, আমিই গিয়ে ঠেকাই, ওকে বের করে নিয়ে যাই ঘরের বাইরে।

শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতর অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খুব বিশ্রীরকম মেরেছে বুঝি আপনাকে?'

'আমাকে মারবে? আমাকে মারা ওদের কম্ম নয়!' উদাসীনভাবে জবাব দিল ও। 'থাম, আমাকে "আপনি" বলো কেন?'

এইভাবেই আমাদের আলাপ পরিচয় শুরু। প্রথম প্রথম খুব বুদ্ধি-কৌশলের প্যাঁচ খাটিয়ে আমায় নিয়ে তামাশা করত, কিন্তু যখন ওকে বর্ণনা দিয়ে বোঝালাম 'অদৃশ্য সূতোতা' আমাদের জীবনে কী খেলা খেলছে তখন ভেবে চিন্তে ও বলল:

'কই, তুই তো বোকা নোস্ দেখছি! না, মোটেই না! যেভাবে জিনিসটা বোঝালি তাতে তো বোকা মনে হল না!'

তারপর তার ব্যবহার বদলে গেল। বাপের মতো স্নেহ করতে শুরু করল আমায়। এমন কি আমার পুরো নাম আর পদবী ধরেও ডাকতে লাগল এবার।

'তুই যে-সব কথা বলিস্ তা ঠিকই আলেক্সেই, আমার মাক্সিমিচ রে, আমার লম্বা তুরপুণটা রে। কথাগুলো তো তোর ঠিকই তবে কেউ যে বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিছু লাভ নেই রে।'

'তুমি তো আমার কথা সত্যি বলে মানো, তাই না?'

'আমি—আমি তো একটা নেড়ী কুত্তা রে। তার ওপর লেজ কাটা। তবে বেশির ভাগ লোকই ঘরে-পোষা কুকুর, লেজে তাদের যতোরাজ্যের চোরকাঁটা লেগে আছে—বউ রে, ছেলে রে, তার হ্যানো-ত্যানো ছাই ভস্ম। কুকুরগুলোর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ওদের খুপরিটুকু। তোর কথা ওরা মানবে না রে। একবার এক ব্যাপার দেখেছিলাম। মরোজভ কারখানায় ঘটেছিল কাণ্ডটা। যারা আগু বাড়িয়ে গেল তারা মাথায় খেল বাড়ি। আর—বুঝলি তো, বাড়ি তো আর পশ্চাদ্দেশে নয়, রীতিমতো মাথায়। সুতরাং ব্যথাটা বড়ো সহজে ভোলা যায়নি।'

তবে ক্রেস্তোভ্নিকভের কারখানার ফিটার-মিস্ত্রি ইয়াকভ সাপোশ্নিকভের সঙ্গে পরিচয় হবার পর কিন্তু ওর কথাবার্তা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। ক্ষয়রোগী ইয়াকভ—গাটার বাজায়, বাইবেলে দখল আছে তার। যেমন নির্বিকারভাবে ও ঈশ্বরকে নস্যাৎ করে তা দেখে রুব্‌ৎসভ তো একেবারে থ'। ক্ষয়ে-যাওয়া ফুস্‌ফুসের এক-আধটা রক্তাক্ত দলা থুতুর সঙ্গে কেশে তুলে ইয়াকভ ব্যগ্র উৎসাহে তর্ক জুড়ে দেয়:

'প্রথম কথা—"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আর তাঁর আদলে" মোটেই আমি সৃষ্ট হইনি। তেমন কোনো ব্যাপারই নয়। জ্ঞান? কোন্ জিনিসের কতোটুকই বা জানি! শক্তি? কতোটুকু করার ক্ষমতা আছে আমার! দয়ালু? আমার মধ্যে দয়াও নেই, মোটেই না! দ্বিতীয় কথা—হয়

ঈশ্বর জানেন না আমার জীবন কতো কঠিন; নয়তো জানেন, কিন্তু আমার কোনো উপকার করার ক্ষমতাই তাঁর নেই; কিংবা হয়তো উপকার করতে পারেন কিন্তু করতে চান না। তৃতীয় কথা—ঈশ্বর সর্বজ্ঞও নন, সর্বশক্তিমানও নন, করুণাময়ও নন। আসলে তাঁর অস্তিত্বই নেই। এটা বানানো কথা, এ সবই বানানো, আমাদের গোটা জীবনটাই তো বানানো। কিন্তু—আমাকে বোকা বানাতে কেউ পারবে না।'

প্রথমটায় রুব্‌ৎসভ এতটা হক্‌চকিয়ে যায় যে কথাই বলতে পারে না। তারপর রাগে ফ্যাকাশে হয়ে প্রচণ্ড শাপমন্যি শুরু করে দেয়। কিন্তু ইয়াকভ বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখায়, ফলে ওর গুরুগম্ভীর কথায় রুব্‌ৎসভই যায় ঘায়েল হয়ে। মাথা নিচু করে নীরব ভাবনায় মগ্ন হতে বাধ্য হয় সে।

এইভাবে আক্রমণ চালাতে গিয়ে সাপোশ্‌নিকভের চেহারাটা প্রায় ভয়ঙ্করই হয়ে ওঠে। চমৎকার মুখটা কালো হয়ে ওঠে, তার চুলগুলো কালো আর কোঁকড়া জিপ্‌সীদের মতো; চক্‌চকে নেকড়ে-দাঁতের ওপর নীল ঠোঁটদুটো কুঁচকে যায়। যখন প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাকায় তখন ওর কালো চোখের প্রবল তীব্র দৃষ্টিটা যেন অন্তর্ভেদী হয়ে ওঠে, সে দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। ওর এই চাউনি আমায় সেই পাগলটার কথা মনে করিয়ে দেয় যে নিজেকে বিরাট একটা কিছু মনে করত।

ইয়াকভের বাড়ি থেকে ফিরে এসে রুব্‌ৎসভ গম্ভীর চালে বলে:

'আগে কখনো কেউ ভগবানের বিরুদ্ধে আমায় কিছু বলেনি। অনেক রকম কথাই শুনেছি, কিন্তু এরকম কথা তো শুনিনি বাপু। লোকটা অবশ্য বাঁচবে না বেশিদিন, এইটেই যা একটা দুঃখের কথা! জ্বলতে জ্বলতে ঠিক গন্‌গনে আগুনটি হয়ে উঠেছে এখন...। খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, ভাই। হ্যাঁ, বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক।'

দেখতে দেখতে ইয়াকভের অনুরক্ত হয়ে পড়ে সে। ক্ষয়রোগী ফিটার-মিস্ত্রিটার কথাবার্তায় একটা নতুন উত্তেজনা জাগে ওর মধ্যে। ভেতর থেকে উত্তেজনাটা এমনভাবে টগবগিয়ে ফুটে উঠতে থাকে ওর যে হরদমই হাত তুলে টস্‌টসে চোখদুটো রগড়াতে শুরু করে দেয় রুব্‌ৎসভ।

মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলে, 'তা-হলে? তাহলে ভগবানের পাটটা চুকিয়ে দেওয়া গেল, অঁ্যা? হুম্‌ম্‌। এবার যদি রাশিয়ার জারের কথা বল, বুঝলে হে চক্‌চকে ছুঁচ্‌টি আমার, তা হলে আমি আমার মনের কথাটাই বলি: জার-টার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। গোলমালটা জার নিয়ে নয়, মুস্কিল করেছে ওই মালিক হর্তাকর্তার দল। যে কোনো জারই আসুক আমার আপত্তি নেই—এমন কি ইভান গ্রজ্‌নি* হলেও নয়। মস্‌নদে বসে তুমি হুকুম চালাও জার, যদি তাতেই তুমি খুশি থাকো। কিন্তু—আমাকে শুধু মালিক-মনিবদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে দাও, ব্যস্‌। সোজা কথা! এ যদি তুমি করো তাহলে তোমায় সোনার শেকল দিয়ে সিংহাসনে বেঁধে রাখব। তোমায় পূজো করব।'

'ক্ষুধার শাসন' বইখানা পড়ার পর ও বলে:

'ঠিক কথাই তো বলেছে। নিশ্চয়।'

লিথো-করা একখানা পুস্তিকা প্রথম দেখেই ও জিজ্ঞেস করে:

'কে লিখে দিয়েছে বল তো? ভারি সুন্দর আর পরিষ্কার। ওদের আমার ধন্যবাদ দিও।'

অদম্য জ্ঞান-পিপাসা রুব্‌ৎসভের। সাপোশ্‌নিকভের মাথা-ঘুলোনো

---

*ইভান গ্রজ্‌নি—ভয়ানক ইভান (ইভান দি টেরিবল)।

ভগবৎনিন্দার সূত্রটা ও ব্যগ্রভাবে প্রাণপণ মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। আমার কাছে বইয়ের গল্প শোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে। খুশি হয়ে সানন্দ হাসিতে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে বলে ওঠে:

'মানুষের মন বড়ো মজার জিনিস রে, মজার জিনিস!'

চোখের অসুখের ফলে ওর পড়াশোনার কষ্ট হত। কিন্তু অনেক ব্যাপারেরই খোঁজ রাখত ও। মাঝেমাঝে তো অপ্রত্যাশিতভাবে দুয়েকটা খবর দিয়ে আমাকে রীতিমতো অবাকই করে দিত।

'জার্মানদের মধ্যে কে একজন নাকি ছুতার-মিস্ত্রি আছে—অসাধারণ তার প্রতিভা। তার উপদেশ নেবার জন্য স্বয়ং রাজাই তাকে ডেকে পাঠান অনেক সময়।'

দুয়েকটা প্রশ্ন করে বুঝি সে বেবেলের* কথা বলছে।

'ওর কথা কী করে জানলে তুমি?'

ফুলো টাক-মাথাটা কড়ে আঙুল দিয়ে চুলকে ও সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'চিনি বৈ-কি।'

জীবনের শ্রান্তিহীন কলরব আর জটিলতায় সাপোশ্নিকভের আগ্রহ ছিল না। ওর একমাত্র অনলস উৎসাহ ভগবানকে বরবাদ করা আর পাদ্রি-পুরুতদের বিদ্রূপ করার ব্যাপারে। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ছিল ওর মঠের সন্ন্যাসীদের ওপর।

একদিন রুব্‌ৎসভ ওকে আপোষে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, ইয়াকভ, তুমি তো দেখি ভগবান্‌কে নিয়েই সবসময় গলাবাজি কর, আর কিছুর সম্পর্কে বলো না কেন?'

---

*অগস্ট্‌ বেবেল—জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেতা ও লেখক।

এ কথায় ও আগের চেয়েও বেশি তিক্তভাবে বলতে শুরু করল:

'আর কোন্ জিনিসটা আমার এত ক্ষতি করছে বলো দেখি? আর কী আছে যা আমার লোকসান করেছে? প্রায় কুড়ি বছর আমি ভগবানে বিশ্বাস রেখে চলেছি, তাঁকে ভয় করেছি—সহ্য করেছি, কারণ প্রশ্ন করা নিষেধ, সবকিছুই তো ওপর থেকে ওঁরই আদেশ মতো চলে কিনা! তাই শেকল-বাঁধা হয়েই জীবনটা কাটালাম। তারপর খুব সাবধানে পড়লাম বাইবেলখানা—দেখলাম এর সবটুকুই বানানো! তৈরি করা, বুঝলে হে নিকিতা!'

হাতটা একবার দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে যেন 'অদৃশ্য সুতোটাকে' ছিঁড়তে চেষ্টা করল সে, তারপর ফের বলে চলল কাঁদো কাঁদো গলায়:

'আর আজ—মরতে চলেছি মরার বয়েস হবার আগেই, একমাত্র ওই একটি কারণে!'

আরও অনেক চেনা-পরিচিত বন্ধু ছিল আমার। আগ্রহ জাগাত এদের সকলেই। মাঝেমাঝে সেমিয়নভের রুটির কারখানার বন্ধুদের ওখানেও যে ঢুঁ মারি না তা নয়। ওরা আমাকে দেখলে খুশিই হয়, আমার কথাবার্তায় উৎসাহও দেখায়। কিন্তু—রুব্‌ৎসভ থাকে আদ্‌মিরাল্‌তি পাড়ায় আর সাপোশ্‌নিকভ থাকে কাবাল নদীর ওপারে তাতার পাড়ায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে পাঁচ ভার্স্ট রাস্তা হাঁটতে হয়, তাই ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয় কদাচিৎ। আর ওদের পক্ষে আমার এখানে এসে দেখা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ওদের বসতে দেব এমন জায়গাই আমার নেই। তার ওপর নতুন যে রুটির কারিগরটি এসেছে সে আবার একজন বরখাস্ত সেপাই—যতো পুলিশদের সঙ্গে ওর পরিচয়। পুলিশদের সদরঘাঁটির পেছনের

আঙিনাটা ঘেঁষেই আমাদের বাড়ির উঠোন। তাই অহঙ্কারী 'নীল উর্দিধারীরা' বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের দোকানে আসত ওদের কর্ণেল গাংগার্ট্'এর জন্য টাট্কা রোলরুটি আর নিজেদের জন্য রুটি কিনতে। এ ছাড়া আমার নির্দেশ ছিল 'অতি প্রখর আলোর নীচে না যাবার' যাতে রুটির কারখানাটার ওপর লোকের অবাঞ্ছিত দৃষ্টি না আকর্ষিত হয়।

আমার কাজের যে কোনো অর্থই দাঁড়াচ্ছে না সে আমি বুঝতে পারছিলাম। কোনোরকম বাস্তব বিচার-বিবেচনা না করেই লোকে যেমন খুশি ক্যাশবাক্স হাতাচ্ছে — একেক সময় এমন নির্বিবাদে টাকা সরাচ্ছে যে ময়দার বিল মেটাবার পয়সা পর্যন্ত থাকছে না। কাষ্ঠহাসি হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেরেন্কভ বলে:

'দেউলে হয়ে যাব।'

সংসারযাত্রা যে কঠিন হয়ে উঠছে দেরেন্কভও তা বুঝতে পারে। লাল-চুলো নাস্তিয়া সন্তানসম্ভবা। দেরেন্কভকে দেখলেই সে রাগী বেড়ালীর মতো ফোঁসাতে থাকে। ওর সবুজ চোখজোড়ার ভেতর ফুটে ওঠে নালিশ — সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে নালিশ।

দেরেন্কভের দিকে সোজা হেঁটে যায় নাস্তিয়া, যেন ওকে দেখতেই পায়নি সে। অপরাধীর মতো হেসে দেরেন্কভ ওকে পথ ছেড়ে দেয়। তারপর পেছন থেকে ওকে তাকিয়ে দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মাঝেমাঝে ও আমার কাছে অভিযোগ করে:

'সমস্ত ব্যাপারটাই এত ছেলেমানুষী। হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে তাতেই লোকে ভাগ বসাবে। এর কি কোনো মানে হয়? মোজা কিনেছিলাম ছ-জোড়া — সেদিনই ওগুলো হাওয়া হয়ে গেল।'

মোজার গল্প! শুনলে হাসি পায়, কিন্তু আমি হাসিনি। দেখেছি—নিঃস্বার্থ বিনীত এই মানুষটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে সকলের হিতের জন্য ওর প্রতিষ্ঠানটিকে জীইয়ে রাখতে, অথচ কারখানাটার ওপর ওর বন্ধুবান্ধবদের কতোদূর অবহেলা! দেখেছি—কী নির্বোধের মতো সেটাকে ওরা ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। যাদের জন্য দেরেন্‌কভ খাটছে তাদের কাছ থেকে তো ও কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু আরও সহৃদয়, আরও সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যবহার পাবার অধিকার ওর নিশ্চয়ই আছে। পরিবারটা দেখতে দেখতে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। বাপটি ধর্মভয়ে কেমন যেন চুপচাপ মনমরা হয়ে গেছে, ছোট ভাই ধরেছে মদ আর মেয়েমানুষ, আর বোনটি তো যেন এ বাড়িরই কেউ নয়। হলদে-চুলো ছাত্রটার সঙ্গে ওর যেন একটা অস্বচ্ছন্দ প্রেমের ব্যাপার চলছে মনে হয়। প্রায়ই দেখি ওর চোখদুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে আছে। আমার ভয়ানক ঘেন্না হতে থাকে ওই ছাত্রটার ওপর।

মনে হত আমি মারিয়া দেরেন্‌কভার প্রেমে পড়েছি। আমাদের দোকানে কাজ করত যে মেয়েটা—নাদেঝদা স্‌শেরবাতভা—তাকেও ভালবাসতাম আমি। মোটাসোটা গোলাপী-গাল মেয়েটা, উজ্জ্বল ঠোঁটদুটোতে সবসময় লেগে থাকত সদয় স্মিত হাসি। প্রেমে পড়ার মতো অবস্থাতেই থাকতাম আমি সাধারণত। আমার বয়েস, চরিত্র আর জটিল জীবনের জন্যই প্রয়োজন ছিল নারীর সাহচর্য—এ প্রয়োজনটা অসময়োচিত তো ছিলই না, বরং একটু বিলম্বিতই বলা যেতে পারে। নারীসুলভ প্রীতি, কিংবা অন্তত পক্ষে একজন নারীর সৌহার্দ-ভরা আগ্রহ—এই ছিল আমার প্রয়োজন। প্রয়োজন ছিল এমন কাউকে পাওয়া যার কাছে নিজের কথা বলতে পারি

অসঙ্কোচে; জট-পাকানো নানা অসংলগ্ন চিন্তা আর এলোমেলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার মনে ভিড় করে রয়েছে, সেগুলোকে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারতাম এমনি কারুর সাহায্য পেলে।

নিকট বন্ধু বলতে আমার কেউ নেই। যে সব লোক আমায় 'গড়ে-পিটে তোলার মতো কাঁচামাল' মনে করে—তাদের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। তাদের দেখে বড়ো আস্থাও আসে না মনে। যে সব বাঁধাধরা বিষয়ে ওদের আগ্রহ, তার বাইরে কোনো কিছু নিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই ওরা সংক্ষেপে উপদেশ দেয়:

'ও সব কথা বাদ দাও!'

গুরি প্লেৎনিয়ভ ধরা পড়েছে। ওকে চালান করে দিয়েছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের 'ক্রুশ' জেলখানায়। ভোরবেলায় রাস্তায় দেখা হতে নিকীফরীচই খবরটা দিয়েছিল আমায়। ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছিল আমার দিকে ওর সব-ক'টা মেডেল বুকে ঝুলিয়ে—যেন সবে কুচকাওয়াজ থেকে ফিরছে। পুলিশটার মাথায় তখন নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সামনাসামনি হতেই হাত তুলে টুপিটা ছুঁয়ে একটা কথাও না বলে এগিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ থেমে পেছন থেকে কর্কশ গলায় বলে উঠল:

'গেল রাতে গুরি আলেক্সান্দ্রোভিচ্ গ্রেপ্তার হয়েছে…'

রাস্তাটা আগাগোড়া একবার দেখে নিয়ে এবার চাপা গলায় বলল হতাশভাবে হাতটা নেড়ে:

'বেচারা ছেলেটা এবার সত্যিই মারা পড়ল!'

ধূর্ত চোখের কোণে যেন একফোঁটা জল চক্‌চক্ করছে মনে হল।

আমি জানতাম প্লেৎনিয়ভ ধরা পড়ার আশঙ্কাই করছিল। আমাকে

আগে থাকতে সাবধান করেও রেখেছিল যাতে ওর কাছ থেকে দূরে থাকি। বলেছিল খবরটা যেন রুব্‌ৎসভকেও পৌঁছে দিই, কারণ আমার মতো রুব্‌ৎসভের সঙ্গেও ওর প্রাণের টান ছিল।

চোখটা মাটির দিকে নামিয়ে নিকীফরীচ নীরস স্বরে বলল:

'আমার ওখানে একেবারেই আসো না যে বড়?'

সেদিন সন্ধ্যেয় ওর গুম্‌টি-ঘরে গেলাম। সবে ঘুম থেকে উঠে ও বিছানায় বসেই ক্‌ভাসে* চুমুক দিচ্ছিল। নিকীফরীচের বউ জানলার কাছে গুটিশুটি বসে ওর পাৎলুন রিফু করছিল।

ঘরের ওপাশ থেকে মতলব-ভরা চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে ঘন লোমে-ঢাকা বুকখানা চুল্‌কে নিকীফরীচ বলল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো? ওরা তো ওকে ধরল। একটা পাত্তর পেল যার মধ্যে ও কালি বানাত—সম্রাটের বিরুদ্ধে ইশ্‌তেহার ছাপার জন্য কালি।'

মেঝেতে থুতু ফেলে বউকে ধমক লাগাল নিকীফরীচ:

'এই, পাৎলুনটা দে!'

মাথা না তুলেই বউ জবাব দিল, 'এক মিনিট।'

'ওর আবার দুঃখ হয়েছে ছোকরার জন্য', চোখ দিয়ে ইশারা করে বউকে দেখিয়ে বুড়োটা কৈফিয়ত দেয়, 'সারাদিন কেঁদেছে। তা, দুঃখ তো আমারও হয়েছিল। তবে—সম্রাটের সঙ্গে লড়বে সে ক্ষমতা কি একটা ছাত্রের আছে?'

জামা গায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে ফের বলে:

---

* ক্‌ভাস—রুশ পানীয় বিশেষ, রুটি থেকে তৈরী।

'একটু বাদেই ঘুরে আসছি ··· এই! সামোভারটায় আগুন দে না।'

জানলার বাইরে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল ওর বউ। কিন্তু দরজাটা ভেজিয়ে নিকীফরীচ বেরিয়ে যেতেই সে চট্ করে ঘুরে পেছন থেকে বুড়োর উদ্দেশে হাতের মুঠো নাচিয়ে শাসাতে থাকে। তিক্ত বিদ্বেষে দাঁত খিঁচিয়ে বিড়বিড় করে ওঠে:

'হতভাগা বুড়ো শয়তান। উঃ!'

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। বাঁ চোখের ওপর কালশিটে দাগ, প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে চোখটা। উঠে উনোনটার দিকে এগিয়ে যায় সে। সামোভারের ওপর ঝুঁকে জোরে জোরে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বলতে থাকে:

'তবু হতভাগাকে ঠকাব! হ্যাঁ, ঠকাবই তো। শেষকালে নেকড়ে বাঘের মতো হাউ হাউ করে চেঁচাবে! ওকে বিশ্বাস কোরো না কিন্তু, এক বর্ণও বিশ্বাস কোরো না ওর কথা! তোমাকেও পাকড়াবার ফিকিরে আছে। সব মিথ্যে, যা বলে সব ধাপ্পা। দুঃখ নেই ওর কারুর জন্যই। শুধু আছে বড়শিতে গাঁথার তালে। তোমাদের কথা ও সবই জানে। এই করেই তো খাচ্ছে। মানুষ-শিকার।'

আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে ভিখারিনীর মতো কাতর গলায় ও বলে:

'আমার ওপর কি দয়া হবে না তোমার? অ্যাঁ?'

স্ত্রীলোকটাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না, কিন্তু ওর যে চোখখানা আমার দিকে ফেরানো সেটার মধ্যে এমন তীব্র আর তীক্ষ্ণ বেদনার আকৃতি যে ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আমি ওর উস্কো-খুস্কো চুলগুলোয় হাত বুলোতে থাকি। আঠা-আঠা মোটা চুল।

'এখন উনি কার পেছনে লেগেছেন?' জিজ্ঞেস করি।

‘রিব্‌নোরিয়াদ্‌স্কায়ার ভাড়া বাড়িতে যারা থাকে তাদের পেছনে।’

‘নাম জানো কি?…’

হেসে জবাব দেয়:

‘কর্তাকে বলে দেব তুমি আমার পেট থেকে কথা বার করতে চাচ্ছ! ঐ তো উনি এসে পড়েছেন।… বেচারি গুরিকে তো উনিই ধরিয়ে দিলেন…’

আমার কাছ থেকে ছিটকে চলে যায় ও উনোনের দিকে।

রুটি, জ্যাম, ভদ্‌কা নিয়ে এসেছে নিকীফরীচ। চা খেতে বসলাম আমরা। মারিনা পাশে বসে পরিবেশন করছে আমাকে অতিরিক্ত খাতির-যত্ন দেখিয়ে। ওর ভালো চোখটা আদর করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমার মুখখানা। এদিকে ওর স্বামী সমানে নীতিকথা শোনাতে লাগল আমার উপকারের জন্য:

‘এই যে অদৃশ্য সূতো—এটা আছে প্রত্যেকটা মানুষের বুকে, হাড়ে-মজ্জায়। ছিঁড়বার চেষ্টা করেই দেখ না! চেষ্টা করো উপড়োতে। লোকের কাছে জার হলেন দেবতার মতো।’

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল:

‘বইয়ের খবর তো তুমি অনেক রাখ। বলি গোসপেল পড়েছ? আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় বলো তো: ওতে যে-সব কথা লেখা হয়েছে তার সবই সত্যি?’

‘তা জানি না।’

‘আমার মনে হয় গোসপেলে অনেক বাজে কথা লিখেছে। অজস্র বাজে জিনিস। যেমন ধরো ভিক্ষুকদের কথা: শাস্ত্রে বলছে, “গরীবরাই ধন্য”। ওদের আবার অতো ধন্য-টন্য কিসের? একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে

গেছে ব্যাপারটা! তারপর ধরো তোমার গিয়ে ওই গরীবদের কথা— অনেক কিছুই বলা হয়েছে যার মানেটা পরিষ্কার নয়। একটু তফাত করতে হবে তো! গরীবও আছে, আবার যারা গরীব হয়ে পড়েছে এমন লোকও আছে। কেউ যদি গরীব হয় তো কোন্ ভালো কাজটা তার দ্বারা হবে? কিন্তু গরীব হয়ে পড়েছে এমন যদি হয় তাহলে বুঝতে পারি সেটা নেহাৎই ভাগ্যের ফেরে। এইভাবেই তো দেখতে হবে জিনিসটা। সেইটেই তো সবচেয়ে ভালো রাস্তা।'

'কেন?'

একটুখানি চুপ করে থেকে নিকীফরীচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখে। তারপর আবার বলতে শুরু করে খুব পরিষ্কার উচ্চারণ করে বেশ জোর দিয়ে দিয়ে। বক্তব্যের পেছনে যথেষ্ট চিন্তাশক্তির ব্যয় হয়েছে বোঝা গেল।

'গোসপেলে বড্ডো বেশি দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বলেছে। করুণা জিনিসটাই বড়ো ক্ষতিকর। আমি তো এভাবেই দেখি জিনিসটাকে। দয়া মানেই নিষ্কর্মা মানুষদের পেছনে অজস্র অর্থব্যয়—শুধু নিষ্কর্মা কেন, বিপজ্জনক মানুষদের পেছনেও। দরিদ্রাবাস রে, জেলখানা রে, পাগলা গারদ রে। সাহায্য করলে শক্তিমান লোকদেরই সাহায্য করা উচিত, যাদের স্বাস্থ্য ভাল—তাহলে আর তাদের শক্তির বাজে খরচ করতে হয় না। কিন্তু না, তা তো নয়। আমরা সাহায্য করব যতো দুর্বলগুলোকেই। যেন ইচ্ছে করলেই দুর্বলদের শক্ত করে তোলা যায়! তার ফলে কি হয়—শক্তিমানরা কাহিল হয়ে পড়ে আর দুর্বলরা তাদের ঘাড়ে চেপে বসে। এই তো—এইখানেই হল আসল সমস্যাটা! অনেক কিছু জিনিস আছে যা নিয়ে ভাবা দরকার, শোধরানো দরকার।

আমাদের মাথার মধ্যে একটা জিনিস থাকা উচিত: গোসপেল থেকে আমাদের জীবন সরে গেছে, অনেকদিনই হল সরে গেছে চলেছে তার নিজের রাস্তায়। ধরো এই প্লেৎনিয়ভটা — কেন ওর এই ফ্যাসাদ হল ভেবে দেখেছ? কারণটা হল ওই করুণা। ভিখিরীকে আমরা ভিক্ষে দেব — অথচ ছাত্রদের চিন্তা মাথায় নেই। যেখানে খুশি মরুক্ গে ওরা? এর মধ্যে যুক্তিটা কোথায়?'

এমনি ধরণের দর্শনের সঙ্গে আমার আগেও পরিচয় ঘটেছে। সাধারণত যা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়মূল, অনেক বেশি ব্যাপক এই চিন্তাধারা। কিন্তু এত ধারালোভাবে আগে কখনো কাউকে তা প্রকাশ করতে শুনিনি। প্রায় সাত বছর পর যখন নীট্শের সম্পর্কে পড়াশোনা করি তখনও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে গিয়েছিল কাজানের এই পুলিশটির জীবন-দর্শনের কথা। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি একটা কথা: এমন দার্শনিক মত আমি কেতাবের পাতায় খুব কমই পেয়েছি যার সঙ্গে আগেই আমার বাস্তব জীবনে পরিচয় ঘটেনি।

বুড়ো 'মানুষ-শিকারী'টা বকেই চলেছে সমানে আর কথার তালে তালে চায়ের ট্রের ধারে আঙুল বাজাচ্ছে। রোগা মুখখানার মধ্যে একটা কঠিন বিরক্তির ছাপ, কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়ে সে সোজা চেয়ে আছে ঝক্ঝকে পালিশ-করা সামোভারের তামাটে প্রতিবিম্বটার দিকে।

ওর বউ ওকে দুবার মনে করিয়ে দিয়েছে, 'তোমার কিন্তু যাবার সময় হল'। কিন্তু জবাব না দিয়েই কথার জাল বুনে চলল সে চিন্তার সূত্র ধরে — তারপর হঠাৎ অলক্ষ্যেই কখন প্রসঙ্গটা বদলে সম্পূর্ণ নতুন একটা পথে আলোচনাটাকে ঘুরিয়ে নিল।

'তুমি তো আর বোকা ছেলে নও। পড়াশোনাও করেছ। রুটির কারখানার কাজটা কি তোমাকে মানায়? এক চেয়ে যদি সম্রাটের হয়ে অন্য ধরণের একটা কাজ করতে তাহলে হয়তো এর সমানই টাকা পেতে, কিংবা হয়তো আরো বেশি…'

আমি ওর কথা শুনছিলাম বটে তবে আমার মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল একটা সমস্যা—কী করে রিব্‌নোরিয়াদ্‌স্কায়ার সেই অপরিচিত লোকদের খবর দেব যে নিকীফরীচ তাদের পেছু নিয়েছে? সেই ভাড়া বাড়িটাতে সের্গেই সোমভ নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। সবে নির্বাসনের মেয়াদ শেষ করে ফিরে এসেছেন ইয়ালুতরোভ্‌স্ক থেকে। ভদ্রলোকের কথা আমি অনেক শুনেছি—রীতিমতো চিত্তাকর্ষক।

'যাদের মগজ আছে তাদের এককাট্টা হওয়া উচিত। ঠিক মৌচাকের মৌমাছি কিংবা বোল্‌তার-চাকের বোল্‌তার মতো। জারের সাম্রাজ্যও…'

'ঘড়িটা একবার দেখেছ? ন-টা যে বেজে গেল!' বলল ওর বউ।

'চুলোয় যাক!'

লাফ দিয়ে উঠে নিকীফরীচ তাড়াতাড়ি কোর্তার বোতাম আঁটে।

'ঠিক আছে, ঘোড়ার গাড়ি নেব'খন। চলি তা হলে, ওহে ছোকরা। মাঝে মাঝে এসো যখন খুশি।'

নিকীফরীচের ঘর থেকে বেরুবার সময় আমি মনে মনে ঠিক করলাম আর কখনো ওর বাড়িতে আসব না। বুড়োটা আকর্ষণকারী লোক বটে তবে বড়ো ঘেন্না জন্মিয়ে দেয়। করুণা জিনিসটা ক্ষতিকর বলে সে যে বক্তৃতা দিয়েছিল সেটা আমাকে ভয়ানক বিব্রত করেছে। মনের মধ্যে কথাগুলো যেন গাঁথা হয়ে গিয়েছিল, কিছুতেই ভোলা যায় না। কথাগুলোর পেছনে একটা সত্যের ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছিলাম

তবে একটা পুলিশের লোকের মুখে সেই সত্যটা শুনতে হবে সেটা যেন বরদাস্ত হচ্ছিল না।

এ বিষয়ের ওপর তর্কবিতর্ক যে হয় না তা নয়। এমনি ধরণের একটা আলোচনায়, বিশেষ করে মনে আছে, আমার মনের ভারসাম্য সাংঘাতিক রকম বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

শহরে একজন 'তল্‌স্তয়পন্থী' এসেছিলেন—ওদের দলের লোকের সঙ্গে এই প্রথম আমার সাক্ষাৎ। ভদ্রলোকের লম্বা প্যাঁকাটির মতো চেহারা, কাল-ছোপানা রঙ, কালো ছাগল-দাড়ি, আর ঠোঁটদুটো কাফ্রিদের মতো পুরু। একটুখানি ঝুঁকে চলেন মাটির দিকে তাকিয়ে, তবে মাঝেমাঝেই চট্‌ করে হঠাৎ অল্প-অল্প-টাকপড়া মাথাটা পেছন দিকে হেলান—আর তাঁর কালো আর্দ্র চোখের আবেগময় জ্যোতিতে অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টির ভেতর যেন ধূমায়িত ঘৃণার আভাস। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপকের ঘরে আলোচনা-বৈঠক হল। অনেক তরুণ যুবক এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন পাতলা-গোছের ফিটফাট দুরস্ত ছোটখাট পাদ্রি—ধর্মশাস্ত্রের প্রথম ডিগ্রীধারী। আলখাল্লার কালো সিল্‌কের ভেতর ওর সুন্দরপানা চেহারার ফ্যাকাশে ভাবটা আরো ভালো করে ফুটে উঠেছে, ওর নিরুত্তাপ ধূসর চোখে একটা হিমশীতল হাসির ঝিলিক।

গোসপেল-বর্ণিত পরমাশ্চর্য সত্য আর তাদের শাশ্বত যাথার্থ্য নিয়ে অনেক কথাই বললেন 'তল্‌স্তয়পন্থী' ভদ্রলোক। ওঁর গলার স্বরটা ভোঁতা, কথাগুলো ছোট ছোট কাটা কাটা। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ জোরালো—সম্যক্‌ উপলব্ধির শক্তির পরিচয় তাতে। লোমশ বাঁ হাতখানা বারে-বারেই একই রকমভাবে ওঠাচ্ছেন নামাচ্ছেন কুড়ুল কোপানোর ভঙ্গিতে। ডান হাতখানা পকেটে।

আমারই পাশে এক কোণ থেকে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'থিয়েটারের অভিনেতা!'

'হ্যাঁ, বড়ো নাটুকে।'

কিছুদিন আগেই একটা বই পড়ছিলাম—বোধহয় ড্রেপারের লেখা। তাতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক ধর্ম-মতের লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। 'তল্‌স্তয়পন্থী' এই ভদ্রলোকটিকেও আমার মনে হচ্ছিল ওদের দলেরই কেউ। একমাত্র প্রেমের শক্তি দিয়েই পৃথিবীর মুক্তি আনা যায় এমনি এক উন্মাদ বিশ্বাস তাদের। সত্যিকারের করুণার বশেই তারা তাদের সঙ্গীদের ছিঁড়ে টুকরো করে পুড়িয়ে মারবার জন্য তৈরি।

চওড়া হাতওয়ালা সাদা শার্ট পরেছেন উনি, তার ওপর একটা জীর্ণ ধূসর রঙের কোর্তা। ওঁর এই পোশাকটার জন্যও ঘরের আর সবার থেকে ওঁকে আলাদা মনে হয়। বক্তৃতা শেষ করে উনি সজোরে প্রশ্ন করলেন:

'তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য হল: আপনারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবেন, না ডারুইনকে?'

ঘরের কোণের দিকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল একদল তরুণ। প্রশ্নটা তাদের ভেতর যেন এক টুকরো ঢিলের মতো গিয়ে পড়ল। তরুণতরুণীদের বিস্ফারিত চোখগুলো ভয় আর বিস্ময়ে যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। 'তল্‌স্তয়পন্থীর' বক্তৃতায় যেন সকলেই হতবাক হয়ে গেছে। সবাই মাথা নিচু করে আছে, কেউ কথা বলছে না। ঘরটার ভেতর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে ভদ্রলোক কঠিন গলায় আবার বললেন:

'এই দুটো পরস্পরবিরোধী মতকে মেলাবার চেষ্টা করতে পারে

একমাত্র ইহুদী ফারিসী ধর্মধ্বজীরাই। আর মেলাতে গিয়ে তারা নির্লজ্জভাবে নিজেদেরই ধোঁকা দেয়, মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে।'

খুদে পাদ্রিটি এবার উঠে দাঁড়াল। জোব্বার হাতদুটো আলগোছে গুটিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে শুরু করল বক্তৃতা—মিষ্টি-মিষ্টি কথায় বিষ ঢেলে অনর্গল বলে চলল:

'ফারিসীদের সম্পর্কে আপনিও যে হীন ধারণাই পোষণ করে থাকেন সে তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু এ ধারণাটা শুধু স্থূলই নয়, রীতিমতো ভ্রান্ত…'

অসীম বিস্ময়ে শুনলাম পাদ্রি যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে—জুডিয়ার জনসাধারণের আইন-কানুন সত্যিকারের চোখের মণির মতো রক্ষা করেছিল তো ফারিসীরাই এবং সেইভাবেই তাদের বিচার করতে হবে, জনসাধারণ সবসময়ই শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরই অনুসরণ করেছে।

'উদাহরণ হিসেবে ফ্লেভিয়াস জোসিফাসের ইতিহাস পড়ে দেখুন…'

'তল্স্তয়পন্থী' তড়াক করে উঠে জোসিফাসকে হাতের এক মারাত্মক তলোয়ার-চালানো ভঙ্গিতে নাকচ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'জনসাধারণ তো এখনও সত্যিকারের বন্ধুকে ছেড়ে দুশমনেরই পেছনে চলে। লোকে তো আর নিজের বুদ্ধিমতো চলে না। তাদের জোর করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আপনার ওই জোসিফাসের কী দাম আছে আমার কাছে?'

পাদ্রি এবং বিরুদ্ধমতের আরো অনেকে মিলে মূল প্রশ্নটাকে ছিঁড়েখুড়ে একেবারে কুটিকুটি করে ফেলল যেন। তর্কের আসর থেকে সে প্রশ্ন একেবারেই উধাও হল।

'তল্‌স্তয়পন্থী' চেঁচালেন, 'সত্যই—প্রেম', চোখদুটো ওঁর ঘৃণা আর বিদ্রূপে জ্বলে উঠল।

কথার তোড়ে আমার ভিরমি যাবার জোগাড়, একটু বাদে কোনো শব্দেরই আর অর্থ মাথায় ঢুকছিল না। কথার ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে খেয়ে সারা পৃথিবীটাই যেন ঘুলিয়ে উঠতে লাগল আমার পায়ের নিচে। হতাশ হয়ে অনেকবার ভাবছিলাম আমার মতো নির্বোধ আকাট মূর্খ বোধহয় দুনিয়াতে আর নেই।

গোলাপী গালের ওপর থেকে ঘাম মুছে 'তল্‌স্তয়পন্থী' ভদ্রলোক পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন:

'গোসপেল ছুঁড়ে ফেলে দিন, ভুলে যান সুসমাচার। তা হলে আর মিথ্যে বলতে হবে না আপনাদের! আরেকবার ক্রুশে দিন খ্রীষ্টকে। সেটা বরং বেশি নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেবে!'

শূন্য একটা দেয়ালের মতো আমার সামনে প্রশ্ন এসে দেখা দিল: এ কী ব্যাপার? পৃথিবীতে সুখ শান্তি আনতে হলে অবিরত লড়তে হবে এইটেই যদি জীবনের অর্থ হয়, তাহলে সে-লড়াইয়ে দয়াদাক্ষিণ্য আর ভালোবাসা কি নেহাতই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না?

তল্‌স্তয়ের এই শিষ্যটির নাম জোগাড় করেছিলাম—ক্লপ্‌স্কি। ঠিকানাটাও জেনে নিয়েছিলাম। পরদিন সন্ধ্যের সময় গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দুটি জমিদারনী তরুণীর বাড়িতে উনি আস্তানা নিয়েছেন। গিয়ে দেখলাম মেয়েদুটির সঙ্গে উনি বাগানে বসে রয়েছেন—প্রকাণ্ড একটা বুড়ো লিণ্ডেন-গাছের ছায়ায় টেবিলের ধারে। হাড়-জিরজিরে, রোগা, কাঠখোট্টা চেহারা, সাদা পোশাক পরেছেন, বুক খোলা শার্টের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কালো লোমশ বুকটা—সত্যধর্মের

প্রচারক একজন গৃহত্যাগী সাধুপুরুষ যেমনটি হবেন বলে আমার ধারণা ছিল তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ভদ্রলোকের চেহারা।

সামনে রাস্পবেরি আর দুধের একটা বাটি। রুপোর চামচে দিয়ে তুলে তুলে উনি খাচ্ছেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে পুরু ঠোঁটে শব্দ করে। একেকটা চামচ শেষ হচ্ছে আর বেড়ালের মতো ফাঁক-ফাঁক গোঁফের ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে সরাচ্ছেন সাদা-সাদা দুধের ফোঁটাগুলো। দু'বোনের একজন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওঁকে পরিবেশন করবে বলে তৈরি হয়ে। আরেকজন গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে—হাতদুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে স্বপ্নাতুর চোখে গরম ধূলোভরা আকাশের দিকে চেয়ে। দুটি মেয়েই পরেছে হাল্‌কা লিল্যাক্‌-রঙা পোশাক। দেখতেও দুজন প্রায় হুবহু একরকম, একজনকে আরেকজনের থেকে তফাত করা যায় না বললেই হয়।

ভদ্রলোক বেশ উৎসুক আর সদয়ভাবেই কথা বললেন আমার সঙ্গে—প্রেমের সৃজনীক্ষমতার কথা বললেন, বললেন কেমন করে হৃদয়ে এ প্রেমের বিকাশ ঘটানো যায় 'বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সংযোগ' স্থাপনের একমাত্র শক্তি হিসাবে—জীবজগতে যে প্রেম ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে সংযোগের একমাত্র শক্তি হিসাবে।

'প্রেমই হল একমাত্র শৃঙ্খল যা দিয়ে মানুষকে বাঁধা যায় এ সংসারে! প্রেম বিনা জীবনের তাৎপর্যই বোঝা অসম্ভব। যারা বলে জীবনের ধর্ম হল সংগ্রাম—তারা অন্ধ, ধ্বংস তাদের অবশ্যম্ভাবী। আগুন দিয়ে কি আগুন নেভানো চলে? পাপের শক্তি দিয়েও তাই পাপকে দমন করা চলে না!'

পরে অবশ্য মেয়েদুটি যখন কোমর ধরাধরি করে বাগানের

ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল ঘরের দিকে, ভদ্রলোক মিট্‌মিটে চোখে পেছন থেকে চেয়ে দেখলেন ওদের। জিজ্ঞেস করলেন:

'তা, তোমার পরিচয়টা কী শুনি?'

নিজের কথা বললাম। উনি আঙুলের ডগা দিয়ে টেবিল বাজিয়ে তালে তালে বলে চললেন—মানুষ যেখানেই থাক্ সে মানুষই, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত সংসারে নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে বরং মানবতার প্রেমের দ্বারা নিজের আত্মাকে সুসংযত করে রাখা।

'মানুষ যতোই নিচের দিকে থাকবে জীবনের খাঁটি সত্যেরও ততোই কাছাকাছি আসবে সে, জীবনের সবচেয়ে পবিত্র জ্ঞান ততোই তার নাগালে এসে পড়বে।'

এই 'পবিত্র জ্ঞানের' সঙ্গে ভদ্রলোকের নিজের কতোটুকু পরিচয় আছে সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ থাকলেও কোনো মন্তব্য করলাম না। বুঝতেই পারছিলাম ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। দৃষ্টিতে একটা বিমুখতার ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, হাই তুলে মাথার পেছনে হাত রেখে পাদুটো টান-টান করলেন। তারপর ক্লান্তভাবে চোখের পাতা বুজে যেন ঘুমের ঘোরেই বিড়বিড় করতে লাগলেন:

'প্রেমের কাছে বশ মানা… এই তো জীবধর্ম…'

চমকে উঠে হাতদুটো ছড়িয়ে যেন শূন্যেই কিছু আঁকড়ে ধরতে গেলেন উনি, তারপর সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কী হল? মাফ করো, বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

আবার চোখদুটো বুজলেন। দাঁতে দাঁত চেপে যেন যন্ত্রণায় সেগুলো

বার করলেন। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, ওপরের ঠোঁট কুঁচকে গিয়ে ছাড়া-ছাড়া নীলচে-কালো গোঁফ যেন রোঁয়া খাড়া করে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে এলাম লোকটার সম্পর্কে একটা প্রতিকূলতার মনোভাব নিয়ে, ওঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে অস্পষ্ট সন্দেহ নিয়ে।

কিছুদিন বাদে আমার পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে গিয়েছি ভোরবেলার দিকে কিছু রোলরুটির যোগান দিয়ে আসতে। ভদ্রলোক অবিবাহিত, মাতাল। সেখানেও দেখি ক্লপ্স্কি। মনে হল যেন বিনিদ্র রাত জেগেছেন। মুখখানা পিঙ্গল, চোখের পাতা লাল, ফোলা-ফোলা। সন্দেহ হল নিশ্চয় মাতাল। মোটাসোটা অধ্যাপকটি নেশার ঝোঁকে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তর্বাস সম্বল করে বসে আছেন মেঝের ওপর। হাতে একখানা গিটার। চারদিকে এলোমেলো ছড়ানো আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় আর বীয়ারের খালি বোতল। এপাশ ওপাশ টলে উনি ঘড়ঘড় করে উঠলেন:

'কর্-রু-ণা…'

চটে উঠে কড়া গলায় ধমক লাগালেন ক্লপ্স্কি:

'করুণা-টরুণা চলবে না। হয় প্রেমের ভেতরেই আমরা তলিয়ে যাব, নয়তো প্রেমের লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে যাব। আমাদের কিন্তু এক রাস্তা— আমাদের মৃত্যু অনিবার্য…'

আমার ঘাড় ধরে ঘরের ভেতরে ক্লপ্স্কি টানতে টানতে নিয়ে গেলেন অধ্যাপকটির কাছে।

'এই দেখ! এই ছেলেটিকেই জিজ্ঞেস কর—জিজ্ঞেস কর তো কী চায় ও? জিজ্ঞেস কর তো—মানুষকে ভালোবাসতে চায় কিনা ও?'

জল-ভরা চোখে অধ্যাপক আমার দিকে চাইলেন, তারপর হেসে উঠলেন।

'ও তো সেই রুটির দোকানের ছোকরা। আমার কাছে পয়সা পাবে।'

টলতে টলতে পকেটের ভেতর হাত গুঁজে একটা চাবি বের করলেন উনি। আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন:

'এই নাও! যা আছে সব নিয়ে নাও!'

কিন্তু তল্স্তয়ের চেলা তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে আমাকে ইশারা করে বললেন:

'যাও, কেটে পড়। অন্য সময় পয়সা পাবে।'

যে রোলরুটিগুলো এনেছিলাম সেগুলো উনি ছুঁড়ে দিলেন কোণের সোফার দিকে।

আমাকে চিনতে পারেননি উনি। খুশিই হলাম। ফিরে এলাম, শুধু মনে করে রাখলাম প্রেমের মাধ্যমে ওঁর আত্মবিলুপ্তির তত্ত্ব আর আমার বুকের ভেতর জমে থাকল লোকটার সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ঘৃণা।

ক-দিন বাদেই শুনলাম, যে মেয়েদুটোর বাড়িতে উনি থাকতেন তাদের একজনকে নাকি উনি প্রেম নিবেদন করেছিলেন—এবং সেই একই দিনে একইরকমভাবে নাকি উনি আরেক বোনকেও ভালোবাসা জানিয়েছিলেন। দু'বোন গোপনে পরস্পরকে ব্যাপারটা জানাতেই ওদের পূর্বরাগের আনন্দটা প্রেমপ্রার্থীর প্রতি তিক্ত বিরাগে পরিণত হল। দেউড়ির দরোয়ানকে ওরা বলতে বলল যেন সেই মুহূর্তেই প্রেম-প্রস্তাবক বাড়ি ছেড়ে চলে যান। শহর থেকে অদৃশ্য হলেন উনি।

অনেক আগে থেকেই একটা জটিল আর যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা আমাকে বিব্রত করেছে—সমস্যাটা প্রেম আর করুণা নিয়ে, মানুষের জীবনে তাদের স্থান কোথায় তাই নিয়ে। প্রথম দিকে এ প্রশ্ন আমার সামনে এসেছিল খুব অস্ফুট হলেও তীব্র একটা অন্তর্বিরোধী রূপ নিয়ে, পরে তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে অত্যন্ত সরল আর দ্ব্যর্থহীন একটা জিজ্ঞাসার মধ্যে:

'জীবনে প্রেমের ভূমিকা কী?'

এতকাল যতো বই পড়েছি সবের মধ্যেই দেখেছি শুধু খ্রীষ্টীয় তত্ব, মানবতাবাদ আর মানুষকে করুণা দেখাবার জন্য সকলের কাছে অশ্রুবিগলিত আবেদন। সে সময়টায় আমি যতো গুণী জ্ঞানী মানুষের পরিচয় পেয়েছি প্রত্যেককেই দেখতাম আবেগময়ী আর বাগ্মিতায় এই একই ভাবধারা প্রকাশ করতে।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আমার আশেপাশে যা কিছু দেখতে পেতাম তার প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই পরদুঃখকাতরতার স্থান ছিল না। জীবনটাকে আমার মনে হত শত্রুতা আর নিষ্ঠুরতার একটা অন্তহীন ধারাবাহিকতা, সামান্য ছাইপাঁশের জন্য একটা ইতর অবিশ্রান্ত খেয়োখেয়ি লড়াইয়ের মতো। আমার নিজের অবশ্য একমাত্র নেশা—বই। আমার কাছে আর যে কোনো জিনিসই মনে হত নিরর্থক।

শুধু ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘরের বাইরে আমাদের ফটকটার পাশে বসে রাস্তার মানুষদের লক্ষ্য করলেই আমি বুঝতে পারতাম, এই গাড়োয়ান, দরোয়ান, মজুর, কর্মচারী, ব্যবসায়ী—এদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রাই আমার থেকে কতো আলাদা, আমার শ্রদ্ধাভাজন মানুষদের থেকে কতো আলাদা; ওদের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, ওদের কামনা-বাসনাও অন্য ধরণের। যে সব লোককে আমি সম্মান করি, যাদের ওপর রয়েছে আমার আস্থা—তারা যেন এদের থেকে অনেক দূরের মানুষ, একাকী, নিঃসঙ্গ। বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠের মধ্যে তারা যেন নেহাতই অবাঞ্ছিত বাইরের জীব। উইপোকার দল প্রাণপণ কসরত করে, তুচ্ছ আবর্জনা আর নগণ্য চাতুর্যের সদ্ব্যবহার করে উইয়ের ঢিবি গড়ছে, যার নাম দিয়েছে ওরা জীবন—আর সেই উইপোকার দলে তাদের স্থান নেই। আমার চোখে এ জীবনের আগাগোড়াই

অর্থহীন মূঢ়তা। একটা প্রাণান্তকর একঘেয়েমি হল এ জীবনের মূল কথা। আর প্রায়ই দেখতাম যে-সব লোক দয়াদাক্ষিণ্য ভালোবাসা ইত্যাদির কথা বলে তাদের দৌড় ওই কথাটুকু অবধিই, কাজের প্রশ্ন এলে এরা অজ্ঞাতসারেই নিজেদের সঁপে দেয় জীবনের গড্ডলিকা প্রবাহে।

সবটাই বড়ো পীড়াদায়ক আমার কাছে।

পশু-চিকিৎসার বিদ্যালয়ের ছাত্র লাভ্‌রোভের উদরী হয়েছে। হলদে ফুলোফুলো শরীর। হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন বলল:

'নিষ্ঠুরতা দিনদিন বেড়ে ওঠাই উচিত যতোদিন-না লোকে একেবারে হন্যে হয়ে ওঠে সব জায়গায়—যতোদিন-না পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণী ঘেন্না করতে শুরু করে নিষ্ঠুরতাকে, ঠিক যেমন করে এই হতচ্ছাড়া শরৎকালটার ওপর লোকে খেপে উঠেছে।'

এ বছর শরৎকালটা এসে পড়েছে আগেভাগেই। যেমন বর্ষা তেমনি ঠাণ্ডা। চারদিকে রোগ ব্যায়রাম আর আত্মহত্যার হিড়িক লেগে গেছে। অবশেষে লাভ্‌রোভও পটাশিয়াম সায়ানাইড্ খেল—উদরী রোগে ওর শ্বাসরোধ হবার আগেই।

'পশুর ডাক্তার! জানোয়ারদের ওষুধ দিয়ে দিয়ে শেষে নিজেই কিনা পটল তুলল জানোয়ারের মতো', বলল দর্জি মেদ্‌নিকভ। লাভ্‌রোভের সঙ্গে একঘরেই থাকত মেদ্‌নিকভ, সে এই ঘরের মালিক—রোগা চিম্‌ড়ে মানুষ, বেজায় ধার্মিক ভগবৎজননীর প্রত্যেকটা স্তোত্র সে গড়গড় করে মুখস্ত বলে যেতে পারত। মেদ্‌নিকভ তার ছেলেপিলেদের নিয়মিত মারধর করত তিন-মুখো একটা চামড়ার চাবুক দিয়ে। ওর মেয়েটার বয়েস সাত আর ছেলের বয়েস এগারো। বউটাকে পেটাত পায়ের ডিমের ওপর বাঁশের লাঠি দিয়ে। মাঝেমাঝে অনুযোগ করত:

'হাকিম সায়েব গালমন্দ দিয়ে বলেছেন আমি নাকি আমার এই কায়দাটা চীনেদের কাছ থেকে শিখেছি। তা চীনে তো আমি জীবনে কখনো দেখিনি —সাইনবোর্ডে আঁকা ছবিতে ছাড়া।'

মেদ্‌নিকভের দোকানের একজন কর্মচারী, লোকে তাকে ডাকে 'দুষ্কার স্বামী' বলে—মনমরা ধনুক-ঠেঙ্গো লোকটা বলত তার মনিবের কথা:

'যারা খুব মিন্‌মিনে, তার ওপর আবার ধার্মিক—সেই সব লোককেই তো আসল ভয়। গুণ্ডা হলে তো নিশ্চিন্ত, ঝট্‌ করে তাদের চিনে নিতে পারবে, পালাবার ফুরসৎও পাবে। কিন্তু এই মিন্‌মিনেগুলো ঠিক ঘাসের ভেতর সাপের মতো, গুটিগুটি এগিয়ে আসে, যেমন চুপিসারে চলে তেমনি ত্যাঁদোড়, তারপর তুমি টের পাবার আগেই দেখবে বিষদাঁত বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক যে-জায়গাটায় তোমার বুকটা সবচেয়ে খোলা সেই জায়গায়। আমি তো ভয় করি ওই লোকগুলোকেই—যারা কিনা এমনিতে খুব নিরীহ।'

'দুষ্কার স্বামী' নিজেও একটি মিন্‌মিনে আর ধূর্ত গোয়েন্দা—মেদ্‌নিকভের পেয়ারের লোক। তবে যা বলেছিল তার মধ্যে সত্যিও অনেকখানি।

একেক সময় আমার মনে হত জীবনের পাথর-কঠিন বুকে এই নিরীহ গোবেচারা প্রাণীগুলো বোধহয় শেওলার মতোই বেড়ে ওঠে, এরাই বোধহয় পাথরের বাঁধুনি আল্‌গা করে দেয়, নরম করে দেয়, আরো উর্বর করে তোলে তাকে। বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য এদের অঢেল প্রাচুর্য, নীচতার সঙ্গে এদের স্বচ্ছন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে থাকা, এদের পিচ্ছিল অস্থিরতা ও আত্মার নম্রতা, আর একঘেয়ে প্যান্‌প্যানানি দেখে এদের ভেতর আমার নিজেকে মনে হত এক-ঝাঁক ডাঁশমাছির ভেতর একটা পা-বাঁধা ঘোড়ার মতো।

নিকীফরীচের গুম্‌টি-ঘর থেকে বাড়ি ফেরার পথে এইসব কথাই ভাবছিলাম আমি।

বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। রাস্তার বাতিগুলোর আলো টিমটিম করে কাঁপছিল হাওয়ায়, অথচ মনে হচ্ছিল যেন ঘন ধূসর আকাশটাই কাঁপছে আর চালুনির ফাঁক দিয়ে মাটির ওপর ঝর-ঝর করে ঝরিয়ে দিচ্ছে ধূলোর মতো মিহি বৃষ্টি—অক্টোবরের বর্ষণ। রাস্তার ওপর দিয়ে একটা মাতালকে হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছিল এক বেশ্যা, ভিজে চুপ্‌সে গেছে সে। বিড়বিড় করে কেঁদে কেঁদে লোকটা কী যেন বলছিল। স্ত্রীলোকটা ক্লান্ত ভোঁতা গলায় বলল:

'তোমার ভাগ্য এই রকমেরই…'

আমি ভাবলাম, 'এই তো! আমারও তো সেই একই ব্যাপার। আমাকেও কে যেন টেনে নিয়ে চলেছে—কুৎসিত অলিগলির মোড়ে ধাক্কা মেরে—ক্লেদ, পঙ্কিলতা, দুঃখবেদনা, আর নানা বিচিত্র ছাঁদের নরনারীর মুখোমুখি আমায় টেনে দাঁড় করিয়ে। বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।'

হুবহু হয়তো এই কথাগুলো ভাবিনি, তবে মোটামুটি প্রায় এমনি ধরণের চিন্তাই আমার মনে জেগেছিল সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যাটিতে। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম আমার অন্তরের ক্লান্তিটাকে, প্রথম টের পেয়েছিলাম একটা জ্বালা-ধরা জারক-রস আমার বুকটাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। সেদিন থেকেই আমার মনটা ভেঙে পড়তে শুরু করল। নিজেকে দেখতে শুরু করলাম বাইরের একজন দর্শকের চোখে—কঠিন, সমবেদনাহীন শত্রুতার চোখে।

প্রায় প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি পরস্পরবিরোধী মনোভাবের একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খল সংমিশ্রণ—মিলের অভাব শুধু

যে কাজে আর কথায় তাই নয়, অন্তরের আবেগের বেলাতেও মিলের অভাব। বিশেষ করে এই ভাবাবেগের খামখেয়ালীপনাটাই আমাকে পীড়া দেয়। আমার নিজের অন্তরেও লক্ষ্য করেছি এই খামখেয়ালীপনা— সবচেয়ে খারাপ কথা সেইটেই। আমার প্রাণের টান ছিল সবদিকেই: মেয়েদের দিকে, বই পড়ার দিকে, খেটে খাওয়া মানুষ আর ফূর্তিবাজ ছাত্রদের দিকেও; কিন্তু সব রকমের ঝোঁককে তৃপ্তি দেব এমন অবসর আমার ছিল না। পাক-খাওয়া লাটিমের মতো তাই এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে চরকি দিয়ে বেড়াতাম। আর, একটা অজানা হাত, অদৃশ্য হলেও সবল সে হাতখানা, যেন অদেখা এক চাবুক দিয়ে আমাকে ঘা কষাত সজোরে।

ইয়াকভ সাপোশ্‌নিকভ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে শুনে আমি তাকে দেখতে গেলাম। কিন্তু মোটা, মুখ-বেঁকা এক চশমা-পরা মহিলা আমাকে উদাসীনভাবে বললেন:

‘সে তো মরে গেছে।’

মহিলাটির লাল, ঝুলঝুলে, ফোস্কা-ওঠা কানদুটোর পেছনে একখানা সাদা রুমাল বাঁধা।

চলে না গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম ওঁর রাস্তা জুড়ে। এই দেখে উনি চটে উঠে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন:

‘আর কী চাই? অ্যাঁ?’

আমিও মেজাজ গরম করে বলে ফেললাম:

‘আপনি একটি বোকা হাঁদা।’

‘নিকোলাই, ছুঁড়ে বের করে দাও তো লোকটাকে!’

নিকোলাই একটা নেকড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তামার শিক না কি

যেন পালিশ করছিল। ঘোঁত-ঘোঁত করে একখানা শিক তুলে নিয়ে সে সোজা আমার পিঠের ওপর ঘা কষিয়ে দিল। আমি তখন লোকটাকে পাঁজাকোলা করে টেনে নিয়ে এলাম বাইরে। হাসপাতালের সিঁড়ির কাছে জল জমে ছিল একজায়গায়, সেইখানে বসিয়ে দিলাম তাকে। সমস্ত ব্যাপারটা সে নির্বিবাদে মেনে নিল। যেখানে বসিয়ে দিয়েছিলাম সেখানেই দু-এক মুহূর্ত বসে থেকে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, মুখে একটি কথাও সরল না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'এঃ! কুত্তীর বাচ্চা...'

দেরজাভিন পার্কে গিয়ে কবির স্মৃতিস্তম্ভের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। আমার তখন দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল একটা কুৎসিত কেলেঙ্কারীর কাজ করি যাতে লোকজন দল বেঁধে আমাকে মারতে আসে আর তারা আমার গায়ে হাত তুলেছে এই অজুহাতে আমিও তাদের ধোলাই দেবার অধিকারটা পাই। কিন্তু ছুটির দিন হলেও পার্কটা সেদিন জনশূন্য। কাছে-পিঠে রাস্তায় মানুষ-জনের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। খালি দমকা বাতাস এসে গাছের ঝরা পাতাগুলোকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর কাছেই একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে সাঁটা ইশ্‌তেহারের আল্‌গা কোণা হাওয়ায় ফরফর করছে।

বিকেল হয়ে আসে। বাতাসটা ঠাণ্ডা হতে থাকে আর আকাশের রঙ ঘোলাটে ঘষা কাঁচের মতো নীল হয়ে আসে। স্মৃতিস্তম্ভটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা পেতলের মূর্তির মতো। সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমি নিজের মনেই ভাবি: এ পৃথিবীতে সেদিনও একটা মানুষ বেঁচেছিল—ইয়াকভ। একাকী প্রাণী, মনের সমস্ত জোর দিয়ে লড়ে গেছে ঈশ্বরের সঙ্গে, আর তারই কিনা ঘটল

এত সাধারণ মৃত্যু—একেবারেই মামুলি। ওর এই মৃত্যুর মধ্যে যেন অত্যন্ত অমর্যাদাকর কিছু রয়েছে। এমন কিছু যা সহ্য করা কঠিন।

'আর ওই নিকোলাইটা একটা গাড়ল। লোকটার উচিত ছিল মারামারি করা, কিংবা পুলিশ ডেকে আমাকে জেলে পাঠানো…'

রুব্‌ৎসভকে দেখতে গেলাম। সে ওর গর্তের মতো ঘরে বসে টেবিলের সামনে ঝুঁকে টিম্‌টিমে বাতির আলোয় নিজের কোর্তাখানা মেরামত করছিল।

'ইয়াকভ মারা গেছে।'

বুড়ো হাতখানা তুলল, ছুঁচটা তখনো ধরা রয়েছে আঙুলে। নিশ্চয়ই ক্রুশ-প্রণাম করতে যাচ্ছিল—কিন্তু মাঝপথেই ক্ষান্তি দিল। ছুঁচের সূতোটা বুঝি কোথায় আটকে গিয়েছিল, তাই খুব চাপা গলায় বুড়ো খিস্তি করে উঠল।

একটু বাদে বিড়বিড় করে বলল:

'সে কথা যদি বলিস্, তো আমরা সবাই তো একদিন মরবই সময় হলে। মানুষের এ একটা বড়ো বাজে অভ্যেস। হ্যাঁ, এইটেই তো রেওয়াজ কিনা। ইয়াকভ মরে গেছে। তারপর ধর, এ পাড়ায় একজন তামা-মিস্তিরি ছিল সেও তো গেল। গত রোববার। পুলিশরা নিয়ে গেল তাকে। লোকটাকে চিনতাম, গুরিই চিনিয়ে দিয়েছিল। বড়ো চালাক-চতুর মানুষ ছিল মিস্তিরিটা। ছাত্রদের সঙ্গে খাতিরও ছিল। ছাত্ররা কী যেন একটা হট্টগোল তুলেছে—শুনিস্‌নি সে কথা? এই নে, আমার এই কোর্তাটা একটু সেলাই করে দে তো। আমি আবার চোখেও দেখতে পাইনে…'

ধুকড়ি জামা, ছুঁচ আর সূতো আমার হাতে দিয়ে ও ঘরের

ভেতর পায়চারি শুরু করে দিল। হাতদুটো পেছনে রেখে, বিড়বিড় করে বলতে লাগল কাশির ফাঁকে ফাঁকে:

'এখানে ওখানে মাঝেমাঝে দু-একটা আলো জ্বলে ওঠে। আর তারপরেই শয়তানটা এসে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় সে আলো। আবার যে একঘেয়েমি সেই একঘেয়েমি। এ শহরটাই বড়ো অপয়া। নদী জমে গিয়ে জাহাজ বন্ধ হবার আগেই আমি চলে যাব এখান থেকে।'

কথার মাঝখানেই থেমে টাকমাথাটা চুলকে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু কোথায় যাব? এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি গিয়ে থাকিনি। একটিও না। হ্যাঁ, ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক—ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছি। উপকার যা হবার তা ওইটুকুই।'

থুতু ফেলে ফের বলে চলল:

'জীবনটার কোনো মানে হয় না, চুলোয় যাক। বেঁচে থাকো, কাজ করো, খাটো, ব্যস্—কিচ্ছু ফল নেই, না দেহের না মনের…'

দরজার কোণে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে, যেন কান পেতে কিছু শুনছে। তারপর তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে আমার পাশে টেবিলটার ওপর পা তুলে বসল।

'কী বলছি বুঝলি তো রে আলেক্সেই আমার মাক্সিমিচ্ রে: ইয়াকভ এত বড়ো ওর দিলটা ভগবানের জন্যে অযথা ক্ষয় করে গেল। আমি মানি না বলে কী আর ভগবান কিংবা জার ভালোমানুষটি হয়ে যাবেন? আসল কথাটা হল, প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের ওপর খেপে ওঠা, খেপে উঠে বলা—না! এ পচা গলা জীবন আর নয়। এইটেই তো দরকার! বুড়ো তো হয়ে গেছি, এ্যাঃ? বড্ডো দেরিতে জন্মেছি

তো। আর ক-দিন বাদেই একেবারে পুরো অন্ধ হয়ে যাব। বড়ো বিচ্ছিরি রে ভাই। কী রে, জামাটা হল? বেঁচে থাক্…। চল্ যাই সরাইখানায় গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক্…'

সরাইখানার রাস্তায় অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে টাল সামলাবার জন্য আমার কাঁধে হাত রেখে সে বিড়বিড় করে বলল:

'আমার কথাটা তুই খেয়াল রাখিস্। লোকের ধৈর্য একদিন টুটবেই। গরম হয়ে উঠে তারা একদিন সবকিছু ভাঙতে শুরু করবে—তাদের সব কিছু পচা বাজে জিনিস ভেঙে চুরমার করবে। লোকের ধৈর্যের একদিন শেষ হবেই।'

সরাইখানায় আর যাইনি আমরা আদপেই। নদীর ইস্টিমারের একদল খালাসীকে দেখলাম একটা বেশ্যালয়ের দরজার ওপর চড়াও হয়েছে আর সেই দরজাটাকে পাহারা দিচ্ছে আলাফুজভ্ কারখানার মজুররা।

চোখের চশমাটা নামিয়ে রুব্‌ৎসভ বেশ তারিফ করেই বলল, 'ছুটির দিন হলেই এখানে একচোট লড়াই হয়ে যায়।' বেশ্যালয় রক্ষাকারীদের দলে নিজের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে চিনতে পেরে ও তৎক্ষণাৎ যোগ দিল লড়াইয়ে। উৎসাহ দিয়ে হাঁক পাড়তে লাগল:

'চালিয়ে যাও, তাঁতী ভাইরা! ব্যাঙগুলোকে পিষে চ্যাপ্টা করে দাও! মাছের পোনাগুলোর ঘিলু বার করে দাও! এঃ!'

চালাক-চতুর বুড়োটার উৎসাহ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। খালাসীদের ভেতর দিয়ে যেভাবে লড়তে লড়তে পথ কেটে এগুচ্ছিল সে কৌশল দেখলে তাক লেগে যায়: তাদের ঘুষির আঘাত নিবারণ করছে কাঁধের একেকটা ধাক্কা মেরে শত্রুদের নিপাত করেছে। গোটা

দলটাই লড়ছে বেশ ফূর্তির সঙ্গে। বিদ্বেষের ভাব নেই—যেন মজার জন্যই লড়ছে, বাড়তি শক্তিটাকে নির্গম পথ করে দেবার জন্য। কালো কালো একগাদা মানুষের দেহ কারখানা-মজুরদের ঠেলে নিয়ে গেল পেছনের দিকে যতোক্ষণ-না তক্তার ফটকটা সপ্রতিবাদে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো। ফূর্তিতে চীৎকার উঠল:

'টেকো সেনাপতিকে ঘায়েল করো তো!'

লড়িয়েদের দুজন বাড়িটার ছাদের ওপর উঠেছিল। ফূর্তিবাজ তালে গান জুড়ে দিল ওরা:

'আমরা নই চোর-ছ্যাঁচড়
আমরা নই ডাকাত গো:
আমরা সবাই খালাসী
আমরা সবাই জেলে গো।

পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল, অন্ধকারে চক্‌মকিয়ে উঠল তামার বোতামগুলো। পায়ের নিচে কাদার প্যাচপ্যাচানি। ছাদের ওপর তখনো গান চলেছে:

'জাল ফেলি আর জাল তুলি সেই,
শুকনো ডাঙ্গায় নিয়ে গো,
মোটা বুড়ো বণিকের দোকান, ঘরে, গোলায় গো।

'এই থাম্‌! হেরো লোককে মারিস্‌ না।'

'ও দাদু! সামাল!'

অবশেষে শত্রু বন্ধু মিলিয়ে আরও পাঁচ ছ-জনের সঙ্গে রুব্‌ৎসভ আর

আমিও চললাম থানার দিকে। শরতের প্রথম নিঃঝুম রাতে শুধু পেছন থেকে গান ভেসে আসতে লাগল:

হেই! চাল্লিশখানা মাছ ধরেছি জালে,
কাঠবেড়ালি, নকুল আর গন্ধগোকুল মিলে।

অনেকবার নাক ঝেড়ে, থুতু ফেলে, রুব্‌ৎসভ এবার খুব বুক ফুলিয়ে বলল, 'ভল্‌গার লোক বাবা, কাবু করা শক্ত!' আমার কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'তুই ভেগে পড়্‌। সুযোগ বুঝলেই দিবি দৌড়! কেন শুধু শুধু হাজত যাবি?'

পাশের রাস্তাটায় মারলাম ছুট। একটা রোগা খালাসীও পেছু নিল আমার। একটা বেড়া, দুটো বেড়া টপকে চলে গেলাম—আমার পেয়ারের সেয়ানা বন্ধু নিকিতা রুব্‌ৎসভের সঙ্গে সেই রাতেই আমার শেষ দেখা।

আমার জীবনটা ক্রমেই যেন বেশি করে ফাঁকা হয়ে আসছিল। ছাত্রদের মহলে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আমি এসবের মানে বুঝতাম না, ওদের বিক্ষোভের লক্ষ্য বা কারণ কিছুই ধরতে পারতাম না। ফূর্তিবাজ হুড়-হাঙ্গামটা নজরে পড়ত ঠিকই, কিন্তু পেছনের সত্যিকারের লড়াইটা লক্ষ্য করতে পারিনি। আমার মনে হত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আনন্দটুকু পাবার জন্য অত্যাচারও সওয়া যায়। আমাকে যদি কেউ বলত:

'পড়তে পারো। তবে তার জন্য প্রত্যেক রোববার তোমায় নিকোলায়েভ্‌স্কায়া স্কোয়ারে মুগুর-পেটা করা হবে', তবু বোধহয় রাজি হয়ে যেতাম।

সেমিয়নভের রুটির কারখানায় উঁকি মেরে একদিন বুঝতে পারলাম ওখানকার কারিগররা মতলব ভাঁজছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে দল বেঁধে গিয়ে ছাত্রদের পেটাবে।

কারিগররা শয়তানী করে ফূর্তির সঙ্গে জানিয়ে দিল, 'সঙ্গে কয়েকটা লোহার বাটখারা নিয়ে যাব'।

তাদের ধমক দিলাম, তর্ক করে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ, বলতে গেলে ভয়ে-ভয়েই, আবিষ্কার করলাম—ছাত্রদের হয়ে লড়ার ইচ্ছে আমার আর নেই, ওদের সপক্ষে বলার মতো কিছু খুঁজেও পাচ্ছি না।

মনে আছে, ক্লান্তভাবে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলাম ওদের তল-কুঠরিটা থেকে—বুকের মধ্যে একটা বশ-না-মানা মন-ভেঙে-দেওয়া যন্ত্রণা নিয়ে।

অনেক রাত অবধি বসেছিলাম কাবান্ নদীর ধারে। কালো জলে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভাবছিলাম একঘেয়েভাবে একটি কথাই, একই ভাষায় বারবার, হাজার বার:

'কী করা যাবে এখন?'

শূন্যতাটাকে পূরণ করবার জন্য বেহালা বাজানো ধরলাম। রোজ রাতে দোকানে বসে বাজাতাম পাহারাদার আর ইঁদুরগুলোর বিরক্তি জন্মিয়ে। গানবাজনা ভালোবাসতাম আমি, তাই সোৎসাহে লেগে পড়লাম নতুন কাজে। কিন্তু এক রাত্তিরে বেহালা শিখতে শিখতে দোকান ছেড়ে একটুখানি বাইরে বেরিয়েছি, সেই ফাঁকে আমার গুরুমশাই—থিয়েটারের অর্কেস্ট্রাদলের বেহালাবাদক উনি—টাকাপয়সার দেরাজটা খুলে ফেললেন। দেরাজটায় তালা দিতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। দোকানে ফিরে এসে দেখি ভদ্রলোক টাকাগুলো পকেটে গুঁজছেন। দরজার গোড়ায় আমাকে দেখে উনি নিজের মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন—দাড়িগোঁফ কামানো বিষণ্ন মুখখানা যেন ঘুষি খাবার অপেক্ষায় এগিয়ে দিলেন আমার দিকে আস্তে আস্তে বললেন:

‘বেশ তো। মারো।’

ঠোঁটদুটো কাঁপছে, অদ্ভুত রকম বড়ো বড়ো ফোঁটায় ওঁর বর্ণহীন চোখদুটো থেকে নেমে আসছে তেলতেলে জল।

প্রথমে একটা ঝোঁক এসেছিল ওঁকে মারার। সেটা দমাবার জন্য আমি মেঝেতেই হাতের মুঠোদুটোর ওপরে বসে পড়লাম, বললাম দেরাজে ফের টাকাটা রেখে দিতে। পকেট খালি করে দিয়ে উনি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—কিন্তু তারপরেই থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বোকা-বোকা মতো চড়া গলায় বললেন:

‘আমাকে দশটা রুব্‌ল দাও!’

দশ রুব্‌ল দিলাম ওঁকে। কিন্তু আমার বাজনা শেখাও বন্ধ হল সেদিন থেকে।

ডিসেম্বর মাসে আমি ঠিক করলাম—আত্মহত্যা করব। পরে অবশ্য চেষ্টা করেছি ‘মাকারের জীবনের একটি ঘটনা’ নামে এক গল্পের মারফত আমার সেই সিদ্ধান্তটার পটভূমি বর্ণনা করতে। কিন্তু সফল হতে পারিনি। গল্পটা যেমন আনাড়ীর মতো, তেমনি অপ্রীতিকর, আসল সত্যিটা এতে বলাই হয়নি মোটে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় ভেতরকার আসল সত্যিটা যে এতে অনুপস্থিত সেইটেই এ-গল্পের প্রধান গুণ। তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে যথার্থ, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা যেন মনে হয় আমার নয়, গোটা কাহিনীটার সঙ্গেই যেন আমার কোনো যোগ নেই মনে হয়। কোনোরকম সাহিত্যিক মূল্যের প্রশ্ন বাদ দিলেও গল্পটার মধ্যে একটা কিছু আছে যা আমার কাছে সুখকর, নিজের ওপর জয়লাভের আনন্দ যেন পেয়েছি এতে।

এক ড্রাম-বাজিয়ে পল্টনের রিভলভার কিনেছিলাম বাজার থেকে—চারটে কার্তুজ-ভরা। বুকের ভেতর চালিয়ে দিলাম একটা গুলি। চেয়েছিলাম হৃৎপিণ্ডটা অবধি পাঠাতে কিন্তু পারলাম শুধু ফুসফুসটা ফুটো করতে, তারপর এক মাস বাদে নিজেকে দারুণ নির্বোধ মনে হতে লাগল, খুব লজ্জা পেয়ে শেষে আবার রুটির কারখানার কাজেই ফিরে এলাম।

তবে বেশি দিনের জন্য নয়। মার্চের শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় খখলকে দেখলাম দোকানের পেছনের ঘরে জানলার পাশে চেয়ারে বসে থাকতে। একটা মোটা সিগারেট টানছিল সে আর চিন্তিতভাবে তাকিয়ে ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে।

আমাকে দেখে কোনোরকম সম্ভাষণ না জানিয়েই সে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার একটু অবসর হবে?'

'কুড়ি মিনিট।'

'বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

যথারীতি ওর মোটা কাপড়ের কোট আঁটসাঁট করে বোতাম আঁটা, চওড়া বুকের ওপর কটা রঙের দাড়ি, একগুঁয়ে কপালের ওপর ছোট করে ছাঁটা খাড়াখাড়া কড়্‌কড়ে চুল। চাষীদের মতো ভারী জুতো পায়ে, তা থেকে দারুণ আলকাতরার গন্ধ বেরুচ্ছে।

আস্তে আস্তে ও বলতে শুরু করে, 'এখন ব্যাপার হল—আমার ওখানে আপনার আসার ইচ্ছে-টিচ্ছে আছে? ক্রাস্‌নোভিদোভো গ্রামে আছি এখন, ভল্‌গা ধরে আরও পঁয়তাল্লিশ মাইল ভাঁটার দিকে। ওখানে দোকান খুলেছি। দোকানটার কাজে আপনি সাহায্য করবেন—ওতে খুব বেশি সময় নষ্ট হবে না আপনার, তাছাড়া আমার ভালো লাইব্রেরি আছে, কিছু পড়াশোনার সাহায্যও করতে পারি। রাজি?'

'হ্যাঁ।'

'শুক্রবার সকালে ঠিক ছ-টার সময় কুরবাতভের জেটিতে আসুন। ক্রাস্‌নোভিদোভোর নৌকোটার খোঁজ করে নিন—মালিক ভাসিলি পান্‌কভ। অবশ্য জিজ্ঞেস করার কোনো দরকারই হবে না। আপনার আগেই আমি সেখানে হাজির থাকব। যাক্, এখন আসি।'

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে ও তার চওড়া হাতখানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, তারপর কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভারি রূপোর ঘড়ি বের করে বলল:

'ছ-মিনিট হল। ও , হ্যাঁ—আমার নাম হচ্ছে রমাস্। মিখাইলো আন্তোনোভিচ্ রমাস্। ব্যস্।'

পেছন দিকে আর না তাকিয়ে লম্বা লম্বা ভারি পা ফেলে ও চলে গেল সবল সুঠাম প্রকাণ্ড দেহের স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে তাল রেখে।

দু-দিন বাদে আমি ক্রাস্‌নোভিদোভো রওনা হলাম।

সবে শৃঙ্খল-মুক্ত হয়েছে ভল্‌গা। ঘোলাটে জলে দুলেদুলে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে তল্‌তলে পাঁশুটে বরফের চাঁই। আমাদের নৌকো ছুটল ওগুলোরও আগে আগে, নৌকোর গায়ে মট্-মট্ করে ঠেকল ওদের গা। গুঁতো লাগতে দুয়েকটা আবার চৌচির হয়ে ছিটিয়ে দিল ধারালো স্ফটিকের দানা। জোর হাওয়া দিচ্ছে, নদীর পাড়ে অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউগুলো, বরফের চাঁইগুলোর কাঁচ-নীল পাশে পড়ে ঝল্‌মলে রোদ ঠিকরে যাচ্ছে সাদা আলোর ছটার মতো। বাক্স বস্তা পিপেতে বোঝাই নৌকাটা পাল তুলে দিয়ে ছুটেছে। হাল ধরেছে পান্‌কভ। পান্‌কভ অল্পবয়েসী চাষী, একটু যেন ভড়ং দেখিয়ে পোশাক পরেছে। ট্যান্-করা ভেড়ার চামড়ার কোর্তাটার বুকের নানা রঙের সুতো দিয়ে ছুঁচের কাজ করা।

পান্‌কভের মুখখানা শান্ত। চোখদুটো নিরুত্তাপ। সে নীরব, একটু যেন চাষীদেরই মতো। পান্‌কভের ঠিকা-মজুর কুকুশ্‌কিন নৌকোর গলুইয়ের ওপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে নৌকোর আঁকড়াটা ধরে। কুকুশ্‌কিন একটু অগোছালো বেঁটেখাটো মানুষ, ছেঁড়া কোটের কোমরে এক টুকরো দড়ি বেঁধেছে বেল্‌টের মতো করে, মাথায় একটা ভাঁজ-লড়া কোঁচকানো টুপি, কোনো পাদ্রির সম্পত্তি ছিল এক কালে। কুকুশ্‌কিনের মুখখানা বিশ্রীরকম কাটা আর ছড়ে-যাওয়া। লম্বা লম্বা আঁকড়াটা দিয়ে মাঝে-মাঝে বরফের চাঁইগুলোকে খুঁচিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলছে:

'যা পালা! কোথায় চলেছিস আমাদের সঙ্গে। অ্যাঁ?'

পালের নিচে গাদা-করা বাক্সগুলোর ওপর আমি আর রমাস্‌ বসি, নিচু গলায় ও বলে:

'চাষীরা আমায় পছন্দ করে না, বিশেষ করে ওদের মধ্যে ধনী যারা। তুমিও অবশ্য ওদের অপছন্দের ভাগীদার হতে যাচ্ছ।'

গলুইয়ের আড়াআড়ি আঁকড়াটা নামিয়ে রেখে কুকুশ্‌কিন ওর থ্যাবড়ানো মুখখানা আমাদের দিকে ফিরিয়ে যেন বেশ রসিয়ে রসিয়েই ফোঁড়ন কাটে:

'তোমার ওপর সবচেয়ে বেশি খাপ্পা হবে কিন্তু আন্তোনিচ্‌, পাদ্রি।'

পান্‌কভও বলে, 'ঠিক কথাই'।

'লোকটার গলায় তুমি কাঁটা হয়ে বিঁধবে যে! বসন্তের দাগওয়ালা কুত্তা সে।'

'কিন্তু বন্ধু তো আমারও আছে। তারা আপনারও বন্ধু হবে।' খখল বলেই চলে।

বাতাসটা ঠাণ্ডা। মার্চ মাসের উজ্জ্বল সূর্য হলেও রোদের তাপ

তেমন নেই। নদীর পাড়ে হাওয়ায় দুলছে পাতা-ঝরা গাছ্গুলোর কালো কালো শাখা, এখানে ওখানে ফাটলের আড়ালে কিংবা খাড়া পাড়ের কিনারা দিয়ে ঝোলঝাড়ের নিচে-নিচে এখনও জমে আছে বরফের মখমল চিল্‌তে। ভেসে-চলা বরফের চাঁইগুলো নদীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, মনে হয় যেন একপাল ভেড়া চরছে মাঠে। আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছিল দৃশ্যটা।

পাইপে তামাক ঠেসে কুকুশ্‌কিন আরম্ভ করল দর্শনের কথা:

‘সত্যি কথা, তুমি হয়তো ওর—মানে ওই পাদ্রিটার—ঘরের বউ নও। কিন্তু ওর কাজটা তো হল ভালোবাসা, তাই না? বইতে যে-রকম লেখা আছে সকল প্রাণীকে সেই রকম ভালোবাসা।’

চুম্‌কুড়ি কেটে রমাস্‌ ওকে জিজ্ঞেস করে, ‘তাহলে ওভাবে তোমায় ধোলাই দিল কে শুনি?’

‘তেমন কেউ নয়। বদমায়েশ লোক-টোক হবে, চোরচোট্টা, যাদের কাজই এই। অবাকের কী আছে এতে?’ সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সুরে জবাব দেয় কুকুশ্‌কিন। তারপর বুক ফুলিয়ে আরো বলে:

‘কয়েকজন সেপাই একবার আমায় পিটিয়েছিল—গোলন্দাজ সেপাই। হ্যাঁ, সে একটা মারের মতো মার বটে! কীভাবে যে বেঁচে এলাম সেটাই আশ্চর্য।’

পান্‌কভ জিজ্ঞেস করল, ‘কেন ও কাজ করল ওরা?’

‘কবে—কালকের কথা বলছ? না ওই গোলন্দাজদের কথা?’

‘গতকালের কথাটা।’

‘কেন এসে ঘাড়ে পড়ল কে বলতে পারে। আমাদের লোকগুলো—বুঝলে না, সব একেকটা পাঁঠা। সামান্য কিছু হয়েছে তাই নিয়েই গুঁতোগুঁতি। আরে বাবা ঘুষোঘুষি করা কি তোদের কম্ম!’

রমাস্ বলে, 'আমার মনে হয় তোমাদের ওই জিভের জন্যই যতো উত্তম-মধ্যম জোটে। কী যে বল তোমরা খেয়াল থাকে না মোটে।'

'খুবই সম্ভব কথা। আমি আবার একটু জানতে বুঝতে ভালোবাসি। এ আমার অভ্যেস—সবাইকে খালি প্রশ্ন করি। নতুন কথা শুনতে পেলে আমার ভারি আনন্দ হয়।'

নৌকোর মাথাটা খুব জোরে গিয়ে ধাক্কা খায় একটা বরফের চাঁইয়ের সঙ্গে। আরেকটা চাঁই সাংঘাতিকভাবে নৌকোর গা ঘেঁষে চলে যায়। কুকুশ্‌কিন মুহূর্তের জন্য টাল খেয়ে আঁকড়াটা চেপে ধরে। পান্‌কভ ওকে বকনি দেয়:

'নিজের কাজটার ওপর নজর রাখো স্তেপান।'

'তাহলে আমাকে দিয়ে কথা বলিও না', কুকুশ্‌কিন বিড়বিড় করে বলে বরফের চাঁইগুলো খোঁচাতে খোঁচাতে, 'নিজের কাজও করব আবার তোমার সঙ্গে গপ্পোও করব—এত কাজ একসঙ্গে চলবে না বাপু…'

আপসে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় ওদের রমাস্ আমার দিকে ঘুরে বলে:

'উক্রেইনে আমাদের দেশ-গাঁ থেকেও এখানকার মাটি খারাপ। কিন্তু লোকগুলো খুব ভালো। যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দক্ষ!'

খুব মন দিয়ে শুনি, বিশ্বাস করি ওর কথা। লোকটার শান্ত ভাবভঙ্গী, সহজ অথচ সবল ধীরাস্থির কথাবার্তা আমার ভালো লাগে। বুঝতে পারি, এই একজন লোক যার অগাধ পড়াশোনা আছে, তার ওপর লোকদের সম্পর্কে বিচারের নিজস্ব মাপকাঠি রয়েছে ওর। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম সে কথা ও জিজ্ঞেস করেনি—এ ব্যাপারটাও আমার খুবই ভালো লেগেছিল। ওর জায়গায় অন্য যে কেউ হলে অনেক আগেই এ প্রশ্ন তুলত সন্দেহ নেই। প্রশ্নটা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা

হয়ে গেছে—অথচ জবাব দেওয়াও বড়ো চাট্টিখানি কথা নয়। শয়তানই জানে কেন আত্মঘাতী হতে গিয়েছিলাম। খখল যদি জিজ্ঞেস করত তাহলে হয়তো জবাব দিতাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোকার মতো। যাই হোক, এখন আর ওসব কথা ভাবার ইচ্ছে নেই আমার। এত চমৎকার, এত উদার, এত আলোভরা এই ভল্‌গা।

নদীর উঁচু পাড়ের আড়ালে-আড়ালে চলতে থাকে আমাদের নৌকো। বাঁ দিকে ছড়িয়ে আছে নদীর বিরাট বিস্তার, ওপারের নিচু বালির চড়ায় আছড়ে পড়ছে জল। নদী ফেঁপে ফুলে উঠে বালির ওপাশে ঝোপঝাড়গুলো দুলিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে, আর বসন্তের চিক্‌চিকে কল্‌কলানো জল খানা-খন্দ-নালা ভরে ভরে ছুটে আসছে নদীর সঙ্গে মিশে যেতে। সূর্যের হাসি ঝরে পড়ছে, রোদের মধ্যে হলদে ঠোঁটওয়ালা নীলচে কালো দাঁড়কাকগুলোকে দেখায় পালিশ-করা ইস্পাতের মতো চক্‌চকে—কা-কা করে চেঁচাচ্ছে ওরা, বাসা বানাতে ব্যস্ত সবাই। ফাঁকা জমিগুলোয় জ্বল্‌জ্বলে সবুজ ঘাসের শিষ বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সূর্যের মুখোমুখি। হাত-পা আমার ঠাণ্ডা, কিন্তু বুকের ভেতর বেশ একটা আনন্দ, উজ্জ্বল আশার নরম কচি শিষও গজিয়ে উঠছে সেখানে। বসন্তের দিনে পৃথিবীটা বড়ো চমৎকার জায়গা।

দুপুরে ক্রাস্‌নোভিদোভো পৌঁছলাম। উচু, খাড়ো সমতল মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল-গম্বুজওয়ালা গির্জা; পাড়ের কিনারা ধরে গির্জার থেকেই শুরু হয়েছে এক সার শক্তপোক্ত চাষীবাড়ি। চালের তক্তার হলুদে আভায় কিংবা ছাউনির খড়ের উজ্জ্বল জাফরি-নক্সায় ধরা পড়েছে সূর্যের কিরণ। সাদামাটা ছবি, তৃপ্তি দেয় চোখকে।

ভল্‌গার স্টীমবোটে যেতে যেতে এ গ্রামটা আমি এর আগেও দেখেছি—আমার বেশ ভালো লাগত।

কুকুশ্‌কিন আর আমি নৌকার সওদা নামাতে লেগে গেলাম। নৌকার কিনারায় দাঁড়িয়ে আমার হাতে বস্তা তুলে দিতে দিতে রমাস্‌ বলল:

'গায়ে আপনার সত্যিই বেশ জোর আছে!'

আমার দিকে নজর না রেখেই ও জিজ্ঞেস করল:

'বুকে ব্যথা নেই তো?'

'একেবারেই না।'

ওর প্রশ্ন করার কৌশল আমার মনটাকে খুবই স্পর্শ করল। আমি যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম সে খবরটা চাষীরা জানুক এ আমার মোটেই ইচ্ছে নয়।

'হ্যাঁ, বেশ শক্ত লোক তুমি। এ কাজ তোমার পাঁচ বলা যেতে পারে', বাচালের মতো ফোঁড়ন কাটল কুকুশ্‌কিন, 'কোন্‌ জেলা থেকে এসেছ বলো তো হে ছোকরা? নিঝ্‌নি-নোভ্‌গরদ? তাহলে তো তুমি জল খাবার যম—লোকে তোমাদের তাই বলে। কিংবা ধরো—"বলতে পারো গাংচিলেরা কোথায় গেল আজ?"—একথাটাও তো সেই নিঝ্‌নি-নোভ্‌গরদের লোকদের নিয়েই।'

সূতীর জামা আর পাৎলুন-পরা লম্বা রোগা একজন চাষী হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে এল ঢাল পাড় ধরে লোকটার কোঁকড়া দাড়ি, মাথায় চাল-ধরা লালচে চুল। প্যাচ্‌পেঁচে কাদায় তার খালি পাদুটো পিছলে যাচ্ছিল আর ছোট অসংখ্য রূপোলি জলের ধারা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তার পায়ের চাপে।

জলের ধারে এসে পরিষ্কার গলায় সস্নেহে বলল:

'এসো বাপুরা, ঘরে এসো।'

পেছন দিকে তাকাল সে। তারপর নিচু হয়ে দুটো মোটা লগি তুলে নিয়ে ডাঙ্গা থেকে নৌকোর ধার অবধি আড়াআড়ি পাতল। হাল্‌কা পায়ে নৌকোর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হুকুম করল:

'লগিটা পা দিয়ে চেপে ধর, যেন হড়কে না যায়। এইয়ো বাচ্চা, এখানে এসে এদের সঙ্গে লেগে পড়ো তো।'

লোকটা দেখতে ছবির মতো সুন্দর, আর শরীরে খুব শক্তিও আছে বোঝা যায়। হাল্‌কা-নীল চোখের দৃষ্টি কঠিন। লাল গাল আর প্রকাণ্ড খাড়া নাক।

রমাস্‌ ওকে বলল, 'তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে, ইজত্‌।'

'কে? আমি? ঘাবড়াও মৎ!'

এক পিপে কেরোসিন ডাঙ্গায় গড়িয়ে নিয়ে গেলাম আমরা। ইজত্‌ আমার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করল:

'দোকানের কাজে সাগরেদী করবে বুঝি?'

কুকুশ্‌কিন ওকে জানিয়ে দিল, 'এসো না, একবাব এর সঙ্গে কুস্তি লড়েই দেখ!'

'কে যেন মেরে বদন ফের বিগড়ে দিয়েছে দেখছি?'

'তা ওরকম সব লোকের সঙ্গে তুমি কী করতে পারো শুনি?'

'কি রকম সব লোক?'

'ওই যারা মেরে বদন বিগড়ে দেয়।'

'হুঁঃ', নিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় ইজত্‌, তারপর বমাসের দিকে ফিরে বলে, 'গাড়িগুলো এখানে সিধে এসে পড়বে। নদীর অনেকটা উজানেই আমি তোমাদের দেখতে পেয়েছিলাম পাল তুলে আসছ। তা বেশ ভালো সময়েই এসে পড়েছ। তুমি ঘুরে যাও আন্তোনিচ্‌। মালগুলো আমিই দেখছি।'

রমাসের প্রতি ওর মনোভাবটা সাগ্রহ সৌহার্দের, এমন কি খানিকটা খবরদারির ভাবও আছে। সেটা পরিষ্কার দেখা যায়। যদিও অবশ্য রমাস্ ওর চেয়ে বছর দশেকের বড়ো।

আধ-ঘণ্টা বাদে আমরা গাঁয়ের একটা বাড়িতে এসে ঢুকলাম। নতুন বাড়ি, দেয়ালে এখনো রজন আর শনের গন্ধ লেগে আছে। ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক। একজন চাষী বউ চট্‌পট্ ঘুরে ঘুরে খাবার টেবিলটা সাজিয়ে ফেলছিল। নজর তার বড়ো কড়া। একটা খোলা স্যুটকেশ থেকে বই বের করে চুল্লির পাশের তাকের ওপর সেগুলোকে সাজাচ্ছে খখল।

বলল, 'আপনার কামরাটা হল চিলের ছাতে।'

চিলে-কোঠা থেকে গাঁয়ের একটা অংশ নজরে পড়ে। আমাদের বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকেই একটা নিচু খাত, ঝোপঝাড়ে ভরা। স্নানঘরের ছাদ এখান ওখান থেকে উঁকি দিচ্ছে। মাঠের ওপাশে ফল-বাগান আর কালো মাটির খেত গাড়য়ে গড়িয়ে গিয়ে মিশেছে দিগন্তের নীল বন-রেখায়। একটা স্নানঘরের ছাদের মট্‌কায় দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নীল জামা-পরা এক চাষী, হাতে তার কড়ূল। অন্য হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে লোকটা ভল্‌গার দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ির চাকার ক্যাঁচ্‌ক্যাচ্ আওয়াজ উঠছে। একটা গরুর হাম্বা ডাক শোনা গেল মোটা ভারি গলায়। জলের কল্‌কল্ শব্দে বাতাস ভরে উঠেছে। আগাগোড়া কালো পোশাক-পরা এক বুড়ি একটা ফটকের বাইরে এসে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারস্বরে বলে উঠল:

'চুলোয় যা!'

বুড়ির গলার আওয়াজ পাওয়ামাত্র ছোট দুটি ছেলে লাফ দিয়ে উঠে

দুদ্দাড় যতো জোরে পারে ছুটে পালাল পড়ি-মরি করে। ওরা এতক্ষণ পাথর আর কাদা দিয়ে মহা উৎসাহে একটা জলের সোঁতার ওপর বাঁধ বানাচ্ছিল। বুড়িটা এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে সেটার ওপর থুতু ফেলে সোঁতাটার ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর ভারি পুরুষালি জুতো-পরা পা-খানা চাপিয়ে দিল বাচ্চা ছেলেদুটোর তৈরি সেই বাঁধটার ওপর। ঢালু পাড় বেয়ে নেমে এবার সে চলল ভল্‌গার দিকে।

কী ধরণের জীবন এখানে আমায় কাটাতে হবে কে জানে?

খাবার ডাক পড়ল। নিচের তলায় এসে দেখি ইজত্‌ বসেছে টেবিলের ধারে লম্বা-লম্বা পাদুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে। খালি পায়ের তলাদুটো নীলচে লাল। রমাসের সঙ্গে আলাপ করছিল। আমি আসতেই কিন্তু চুপ করে গেল।

রমাস্‌ গম্ভীর হয়ে বলল, 'আরে, কী হল? থামলে কেন, বলে যাও!'

'বললাম তো। তাহলে এই কথা রইল আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেব। যখনই বাইরে যাবে কাছে রিভলভার রেখো কিংবা একটা মোটা ভালো লাঠি নেবে। বারিনভ কাছেপিঠে থাকলে কথাবার্তা বেশি বোলো না। বারিনভ আর কুকুশ্‌কিন—এ দুজনের জিভ বড়ো আল্‌গা, মেয়েমানুষদের মতো। ওহে ছোকরা, মাছ্‌ ধরতে ভালোবাসো?'

'না।'

ফল-পাকড়ের ছোটচাষীদের নিয়ে সমিতি গড়া দরকার—সেই কথাই বলতে শুরু করেছে রমাস্‌। সমিতি হলে বড়ো মহাজনদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে ওরা। মন দিয়ে শুনছিল ইজত্‌। অবশেষে বলল :

'ও সব করতে গেলে পেটমোটার দল কিন্তু আর শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেবে না।'

'সে দেখে নেব।'

'আমার কথাটা তুমি খেয়াল রেখো।'

ইজত্‌কে দেখে আমার মনে হল:

'কারোনিন আর জ্‌লাতোভ্‌রাৎস্কি বোধ হয় এমনি ধরণের চাষীদের আদলেই নিজেদের গল্পের চরিত্রগুলো খাড়া করেছেন…'

এও কি হতে পারে যে এখানে আমি এমন কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছি যার পেছনে সত্যিকারের নিষ্ঠা আছে? এখন কি তাহলে আমি কাজ করব এমন লোকদের সঙ্গে যারা বাস্তবিকই কিছু কাজের কাজ করছে?

খাওয়া শেষ করে ইজত্‌ বলল:

'অত হুড়মুড় করার কিছু নেই মিখাইলো আন্তোনোভিচ্‌। ভালো জিনিস কখনো এত তাড়াতাড়ি হয় না। ধীরে সুস্থে চলতে হবে।'

ও চলে যাবার পর রমাস্‌ কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল:

'এই একজন চালাক চতুর মানুষ। সৎ লোক, তবে দুঃখের বিষয়, প্রায় অক্ষর-জ্ঞান নেই—কিছু কিছু পড়তে পারে। কিন্তু খুব চেষ্টা আছে। এ বিষয়ে আপনি ওকে সাহায্য করতে পারেন।'

দোকানের জিনিসপত্রের দামের ফর্দ নিয়ে সন্ধ্যে অবধি ব্যস্ত রইলাম আমরা। ও আমাকে বলল:

'এখানকার আর দুজন দোকানীর চেয়ে অনেক শস্তায় জিনিস বেচি আমি। কাজে কাজেই ওদের সেটা পছন্দ নয়। যতোরকমের বজ্জাতি খাটায় আমার ওপর। এখন মতলব ভাঁজছে আমাকে মারার। আমি যে এখানে রয়েছি সে তো আর ব্যবসার জন্য নয়, মুনাফাও জোটে না দোকান থেকে। অন্য কারণ আছে। দোকানটা অনেকটা তোমাদের সেই রুটির দোকানের মতো…'

বললাম আমি ওইরকমই আন্দাজ করেছিলাম।

‘হ্যাঁ তো, সত্যি কথাই। যেমন করে হোক লোককে শেখাতে পড়াতে হবে তো—তাই না?’

তালা মেরে দোকানের খড়খড়ি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। হাতে বাতি নিয়ে আমরা এ-তাক থেকে ও-তাকে ঘুরতে লাগলাম। ওদিকে বাইরে কে যেন ঠিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ওপর নীচ করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম কাদার ভেতর ছপ্‌ছপ্ করে সাবধানে পা ফেলছে, মাঝেমাঝে আবার দুপ্‌দাপ করে দরজার বারান্দা পর্যন্ত হেঁটে আসছে।

‘ওই, শুনতে পাচ্ছেন? ও হল মিগুন। একা মানুষ, সাত কূলে কেউ নেই। লোকটা একটা বজ্জাত জানেয়ার। শয়তানি করতে ভালোবাসে, সুন্দরী মেয়েরা যেমন ছেনালি করতে ভালোবাসে তেমনি। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধানে বলবেন, আর—শুধু ওর সঙ্গেই নয়, সকলের সঙ্গেই...।’

নিজের ঘরে ফিরে এসে রমাস্ ফের গুছিয়ে আরাম করে বসল। চওড়া পিঠটা চুল্লির পাশে হেলিয়ে পাইপখানা ধরাল সে। ছোট ছোট ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে লাগল দাড়ির ভেতর। চোখদুটো কুঁচকে কী যেন ভাবছিল। আস্তে আস্তে পরিষ্কার সহজ ভাষায় শুরু করল কথাগুলো। বলল অনেকদিন থেকেই ও নাকি লক্ষ্য করছিল কী অনর্থক আমি আমার তারুণ্যের অপচয় ঘটাচ্ছি।

‘আপনার যোগ্যতা আছে, লেগে থাকার ক্ষমতাও আছে। আপনার লক্ষ্যেরও তারিফ করতে হয়। শুধু দরকার পড়াশোনার—তবে এমন পড়াশোনা নয় যার ফলে আপনি আর আপনার আশেপাশের মানুষদের মাঝখানে কেতাবটাই একটা ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো

এক ভদ্রলোক—গির্জের ধার ধারত না লোকটা—একবার আমাকে বলেছিল একটা খাঁটি কথা: "জানবার বা শেখবার যা কিছু সবই মানুষের কাছ থেকে।" বই পড়ে যা শেখো তার চেয়ে অনেক বেশি রক্ত জল করে মানুষের কাছ থেকে শিখতে হয়। তাদের শিক্ষাটাও একটু কড়া গোছের। তবে যা শিখবে তা একেবারে শেকড় গেড়ে বসে যাবে।'

তারপর, যে কথাটা আমি অনেকবার শুনেছি সেইটেই ফের সে বলল: প্রথম আর প্রধান কাজেই হল চাষীদের সমাজকে জাগাতে হবে। কিন্তু এই পুরনো কথাগুলোর মধ্যেই এবার যেন একটা নতুনতর, গভীরতর তাৎপর্যের আস্বাদ পেলাম।

'সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে হবে—এই নিয়ে তোমাদের শহরের ছাত্ররা আলোচনাই করে। বেশ, কিন্তু আমি ওদের বলি: না, ওটি সম্ভব নয়। লোককে তোমরা ভালোবাসতে পারো না। ওরকম ভালোবাসা নেহাৎই কথার কথা…'

আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দাড়ির আড়ালে মুচ্‌কি হাসল ও। তারপর ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে সাগ্রহে জোরের সঙ্গে বলে চলল:

'ভালোবাসার মানে হল—মিলেমিশে থাকা, বিনীতভাবে মানিয়ে চলা, দোষ উপেক্ষা করে যাওয়া, ক্ষমা করা। মেয়েমানুষকে ভালোবাসার বেলায় এ সবে কোনো আপত্তি নেই—খুবই ভালো কথা। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলায়? লোকের অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করতে পারবেন আপনি? পারবেন ওদের ভ্রান্ত মোহের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে, ওদের প্রত্যেকটা ইতরতাকে মাথা নিচু করে মেনে নিতে, ওদের পশুত্বকে ক্ষমা করতে? সে কি আমরা পারি?'

'না।'

'তাহলেই দেখুন! আপনার শহরের বন্ধুরা তো সবাই নেক্রাসভের লেখা পড়ে। নেক্রাসভের লেখা গান গায়। আমি বলতে পারি একটা কথা: নেক্রাসভকে নিয়ে বেশিদূর এগোতে তোমরা পারবে না! চাষীকে বলতে হবে: দেখ ভাই! তুমি তো আর লোক খারাপ নও এমনিতে, তবে যে জীবনটা তুমি কাটাচ্ছ সেটা খারাপ, জীবনটাকে আরো সহজ, আরো ভালো করতে হলে যে সামান্য জিনিসগুলো করা দরকার সেটা করতে জানো না। বরং, সত্যি কথা বলতে কি তোমার চেয়ে একটা জানোয়ার অনেক বেশি বোঝে তার কোথায় কী প্রয়োজন। তোমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে সে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানে। তবু তোমরা চাষীরা—তোমরাই তো হলে সব কিছুর মূলে। অভিজাত, পাদ্রি, বিদ্বান, জার—এরা সবাই একসময় চাষীর ঘরেরই ছেলে ছিল। তাহলেই বুঝলে? ব্যাপারটা পরিষ্কার? বেশ। তাহলে—এমনভাবে বাঁচতে শেখো যাতে কেউ তোমাদের পায়ের নিচে না দলতে পারে...'

রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনীকে সামোভার গরম করতে বলে এল রমাস্। ফিরে এসে এক এক করে ওর বইগুলো দেখাতে শুরু করল। বেশির ভাগই কোনো-কোনো ধরণের বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা। বাক্‌ল্, লায়েল্, লেকি, লাবক্, টেলর, মিল, স্পেন্সার, ডারুইনের লেখা আছে; রুশ লেখকদের মধ্যে আছেন: পিসারেভ, দব্‌রোলিউবভ, চের্নিশেভ্‌স্কি, পুশকিন, গন্‌চারোভের 'পাল্লাদা যুদ্ধজাহাজ' বইখানা আছে, আর আছে নেক্রাসভের রচনা।

বইয়ের বাঁধাইয়ের ওপর আদর করে চওড়া হাতের তেলোটা

বুলোচ্ছিল রমাস্—ঠিক যেমন করে লোকে বেড়ালের বাচ্চার গায়ে হাত বুলোয়। অনেকটা যেন আবেগভরেই বলে চলল সে বিড়বিড় করে:

‘সবগুলোই ভালো ভালো বই! যেমন ধরো এই বইখানা: এখন দুষ্প্রাপ্য। সরকারী হুকুম ছিল পুড়িয়ে ফেলার। যদি জানতে চান রাষ্ট্র জিনিসটা সত্যি সত্যি কী—তাহলে এটা পড়!’

হবস্’এর ‘লেভিয়াথান’ বইখানা এগিয়ে দিল সে।

‘এটাও রাষ্ট্র নিয়েই লেখা, তবে একটু হাল্কা মজাদার ধরণের!’

মজাদার বই মানে মাক্কিয়াভেলির ‘ইল্ প্রিন্সিপে’।

চা খেতে বসে নিজের সম্পর্কে সামান্য দু-চার কথা বলল রমাস্। চের্নিগভের এক কামারের ছেলে সে। কিয়েভ রেলস্টেশনে ট্রেনের চাকায় তেল দেবার কাজ করত। বিপ্লবীদের সঙ্গে তখন থেকেই তার পরিচয়। নিজে একটা মজুর-পাঠ-চক্রও খুলেছিল। তারপর ধরা পড়ে গিয়ে বছর দুয়েক জেলে খাটে। ইয়াকুৎস্ক অঞ্চলে দশ বছর নির্বাসনে কাটায়।

‘প্রথমে মনে হয়েছিল ওই বুঝি আমার শেষ—ইয়াকুৎ যাযাবর দলের ভেতরেই আমার প্রাণটা বুঝি যাবে। কি প্রচণ্ড শীত সেখানে—মানুষের মাথার ঘিলু অবধি জমিয়ে দেয় রে বাবা! তবে হ্যাঁ, মাথার ঘিলুর তো সেখানে দাম নেই, ওটা ফালতু জিনিস। কিন্তু পরে দেখলাম ওদের এক-আধটা দলে রাশিয়ানও আছে দু-একজন। কালে-ভদ্রে হলেও পাওয়া যায় কাউকে কাউকে! তারপর আর একা মনে হত না, ক্রমেই বেশি করে এনে হাজির করা হচ্ছিল ওদের। লোকগুলোর কিন্তু খুব বিবেচনা আছে! চমৎকার মানুষ। বিশেষ করে

একটি ছাত্র ছিল—নাম তার ভ্লাদিমির করোলেঙ্কো। আমার অল্প ক-দিন বাদে তারও মেয়াদ ফুরোল। প্রথম দিকে আমরা দুজন বন্ধুই ছিলাম, তবে শেষে আলাদা আলাদা পথ ধরলাম। আমরা অনেকটা এক ধরণের ছিলাম। কিন্তু নিছক মিলের ওপর বন্ধুত্ব বোধহয় টেঁকে না। তবে ছেলেটার খুব নিষ্ঠা ছিল, লেগে থাকতে পারত, যে কোনো কাজই বুদ্ধি খাটিয়ে করত। দেব-দেবীর পটও আঁকতে চেষ্টা করত। আমার কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। এখন নাকি সাহিত্য সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় লেখে, বেশ ভালোই লেখে শুনি।'

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ আলাপ করল রমাস্, একবারে মাঝরাত অবধি। গোড়া থেকেই আমাকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে আমার স্থান ওর পাশেই। এত গভীর সাহচর্যের আনন্দ আমি এর আগে কখনো পাইনি। সেদিন আত্মহত্যা করতে যাওয়ার পর থেকেই আমি আমার নিজের কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকে আমার মনে হয়েছে শূন্যগর্ভ অযোগ্য একটা প্রাণী। মনের মধ্যে চেপে বসেছিল একটা অপরাধবোধ। বেঁচে থাকতেই লজ্জা হয়েছে আমার। এই রমাস্ বোধহয় সেটা অনুধাবন করেছিল। তাই প্রাণ দিয়ে সুকৌশলে সে তার নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত মেলে ধরেছে আমার সামনে, ফিরিয়ে এনেছে আমার মনের ভারসাম্য। এ দিনটি ভুলবার নয়।

রোববারদিন গির্জার উপাসনা হয়ে যাবার পর আমরা দোকান খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে লোক এসে জমল আমাদের বারান্দায়। প্রথম এল মাৎভেই বারিনভ: নোংরা উস্‌কো-খুস্‌কো চেহারা, লম্বা-লম্বা বনমানুষের মতো হাত, সুন্দর-পানা মেয়েলি ধরণের চোখদুটোতে শূন্যদৃষ্টি।

রমাস্‌কে নমস্কার জানিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'শহরের নতুন খবর

কী?' ঠিক সেই সময় কুকুশ্‌কিনকে এগিয়ে আসতে দেখে জবাবের জন্য আর অপেক্ষা না করেই হেঁকে বলল:

'ওহে স্তেপান! তোমার বেড়ালগুলো তো আরেকটা মোরগ মেরেছে!'

পরমুহূর্তেই আমাদের সে জানাল: রাজ্যপাল মশাই নাকি কাজান থেকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ গেছেন জারের সঙ্গে দেখা করতে। সমস্ত তাতারকে খেদিয়ে ককেসাস আর তুর্কিস্তানে পাঠাবার হুকুম করিয়ে নেবেন সম্রাটের কাছ থেকে রাজ্যপালের খুব তারিফ করল সে:

'চালাক লোক! নিজের কাজটি ঠিক বোঝেন…'

রমাস্‌ ওকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এ সব তোমার বানানো কথা।'

'কে? আমি? কখন বানালাম?'

'সে আমি জানি না…'

মাথা নেড়ে তিরস্কারের সুরে বারিনভ বললে, 'মানুষকে তো কোনো কালে বিশ্বাসই করো না আন্তোনিচ্‌। অবিশ্যি তাতারগুলোর জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হয়। ককেসাসে ওদের একটু মানিয়ে চলা দরকার।'

•

বেঁটেখাটো রোগা একটা লোক সাবধানে হেঁটে আসছিল। লোকটার পরনে একটা জীর্ণ কোট, নিশ্চয়ই এমন কারুর যে ওর চেয়ে বহরে বড়ো। মেটে মেটে চেহারা— স্নায়বিক দোষে মুখের পেশী কোঁচকানো, কালচে ঠোঁটদুটো রুগীর হাসির মতো ফাঁক হয়ে আছে। বাঁ দিকের তীক্ষ্ণ চোখটা সবসময় পিট্‌পিট্‌ করছে, আর প্রত্যেকবারই নাচছে বাঁচোখের জখমের দাগওয়ালা ধূসর ভুরুটা।

ঠাট্টা করে বারিনভ বলল, 'এই যে মিগুন! কাল রাতে কী চরি করেছ?'

‘তোর টাকা’, পরিষ্কার সুরেলা গলায় পাল্টা দিল মিগুন। রমাসের দিকে ফিরে টুপি খুলল সে।

এবার আমাদের মালিক আর প্রতিবেশী পান্‌কভ বেরিয়ে এল একটা শহুরে কোর্তা গায়ে দিয়ে। গলায় লাল উড়ুনি বাঁধা, পাদুটোর ওপর চক্‌চকে রবারের জুতো। একজোড়া লাগামের মতো লম্বা রুপোর চেন ঝুলছে বুকের আড়াআড়ি। মিগুনকে একবার কঠিন চোখে আপাদমস্তক দেখে বলল:

‘ফের যদি আমার শব্জি খেতে ঢুকবি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব, হ্যাঁ। হতচ্ছাড়া শয়তান!’

মিগুন ঠাণ্ডা মেজাজে ফোঁড়ন দিল, ‘সেই একঘেয়ে ব্যাপার।’ তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার জুড়ে দিল, ‘কারুর মাথা ফাটাতে পারলে জীবনটাই বড়ো জোলো হয়ে যায়।’

পান্‌কভ চটে গিয়ে ধমকাতে থাকে মিগুনকে। মিগুন কিন্তু এদিকে বলেই চলেছে:

‘কে বলে বুড়ো হয়েছি? মাত্র ছেচল্লিশ—বুড়ো হলাম?’

বারিনভ বলে, ‘গেল বড়োদিনের সময় না তিপ্পান্ন ছিলে? তুমি নিজেই তো বলেছ তিপ্পান্ন? মিছে কথা বল কেন?’

এবার আসে সুস্‌লভ*। দাড়িওয়ালা বুড়ো, বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে চলে। তারপর একে একে আসে জেলে ইজত্‌ এবং আরো অনেকে—সব মিলিয়ে জনা দশেক। দোকানের দরজার পাশে বারান্দায় বসে

---

* চাষীদের পদবীগুলো আমার ঠিক মনে নেই। বোধহয় গুলিয়ে ফেলেছি কিংবা বিকৃত করেছি।—লেখক।

পাইপ টানতে টানতে খখল নীরবে চাষীদের কথা শুনতে থাকে। বারান্দার সিঁড়ি আর দু-পাশের বেঞ্চিতে বসেছে চাষীরা।

মেঘ-রোদের ঠাণ্ডা দিন। নীল আকাশে তর্‌তর্‌ করে ছুটেছে মেঘ। শীতের তুষারপাত শেষ হবার পরও যেন মেঘগুলো জমাট বেঁধে রয়েছে। এখানে ওখানে জমা জল আর ছোট ছোট নালা-সোঁতার ভেতর আলো ছাওয়ার ছোপ—একবার জ্বলছে আবার নিবছে, এই ঝলমল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার এই জুড়িয়ে দিল চোখদুটোকে মখমল-নরম ছায়ায়। মেয়েরা সব ছুটির দিনের ঝকমকে পোশাক পরে সগর্বে ভল্‌গার রাস্তা ধরে চলেছে। জল নালা পার হতে গিয়ে ওরা ঘাগরা তুলছে, দেখা যাচ্ছে শক্ত মোটা চামড়ার জুতোগুলো। বাচ্চা-কাচ্চার দল দৌড়োচ্ছে লম্বা মাছ-ধরার ছিপ কাঁধে ফেলে। ধীরে ধীরে চলেছে চাষীরা, যাবার সময় আড়চোখে দোকানের বাইরে আমাদের দলটাকে দেখে নিচ্ছে আর নীরবে টুপি কিংবা মোটা ফেল্ট-হ্যাটের ডগা তুলে ধরছে।

মিগুন আর কুকুশ্‌কিন আপোসে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে—প্রশ্নটার ফয়সালা হয়নি এখনো: কে বেশি আঘাত করতে পারে—ব্যবসাদার, না কুলীন জমিদার?—এই হল ওদের সমস্যা। ককুশ্‌কিনের মতে ব্যবসাদার, মিগুনের মতে জমিদার। তবে কুকুশ্‌কিনের কাঁপা কাঁপা গলা তলিয়ে যাচ্ছে মিগুনের পরিষ্কার সুরেলা নিচে।

'ফিঙ্গেরভ মশাইয়ের বাপ, বুঝলে কিনা, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দাড়ি ধরে টেনেছিল এক সময়। আর ফিঙ্গেরভ মশাই নিজে—দু-দুটো লোককে দুদিকে রেখে কোটের কলার ধরে তাদের মাথা ঠুকে দিত—ব্যস্‌, দফারফা। কাঠের গুঁড়ির মতো উল্টে পড়ত তারা।'

‘তোমাকে উল্টে ফেলার পক্ষে ওই যথেষ্ট!’ একমত হল কুকুশ্‌কিন, তবে এটুকুও জুড়ে দিল, ‘কিন্তু যাই বল, জমিদারদের চেয়ে ব্যবসাদারদের খাই অনেক বেশি…’

একেবারে উঁচু সিঁড়িটাতে বসেছিল চমৎকার দেখতে সেই বুড়ো লোকটা—স্থস্‌লভ। সে বিলাপ করে উঠল:

‘মিখাইলো আন্তোনোভিচ্! চাষীরা কিন্তু আর থই পাচ্ছে না। জমিদারদের আমলে বেকার থাকার উপায় ছিল না। যার যার নিজের কাজ নিয়েই থাকতে হত প্রত্যেককে…’

ইজত্ পাল্টা জবাব দিল, ‘এবার তাহলে একটা দরখাস্ত করে দাসচাষীর বন্দোবস্তটা আবার ফিরিয়ে আনো না কেন?’ রমাস্ ওর দিকে নীরবে একবার চেয়ে দেখল শুধু, তারপর রেলিংএর ওপর পাইপটা ঠুকে তামাক বের করতে লাগল।

আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম কখন রমাস্ কথা বলে। মন দিয়ে চাষীদের ছাড়া-ছাড়া ধরণের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমি কেবলই আঁচ করতে চেষ্টা করছিলাম খখলের বক্তব্য কী হতে পারে। এর মধ্যেই অনেকগুলো সুযোগ সে হাতছাড়া করেছে আলোচনায় যোগ দেবার—মনে হচ্ছিল আমার। কিন্তু একটা উদাসীন মৌন বজায় রেখে চলেছে সে। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে লক্ষ্য করছে এখানে ওখানে জমা জলের বুকে বাতাস কেমন শিহরণ তুলেছে, একটা অখণ্ড ঘন ধূসর স্তূপের ভেতর মেঘগুলো কেমন বাতাসের তাড়া খেয়ে এসে জমছে। নিচে, নদীর ওপর স্টীমবোটের সিটি। ঢালু পাড় বেয়ে ভেসে আসছে মেয়েদের সরু গলার আওয়াজ—অ্যাকর্ডিয়নের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইছে ওরা। চেঁচাতে চেঁচাতে আর হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে একটা মাতাল

রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। পাগলের মতো হাতদুটো দোলাচ্ছে সে। পাগুলো অদ্ভুত রকম বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে আর মাঝেমাঝে হড়কে যাচ্ছে জলা-জায়গাগুলোর ভেতর। চাষীরা কথা বলছিল খুব ধীরে ধীরে। ওদের কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা বিষণ্ন হতাশার সুর। আমিও টের পাই নিজের ভেতর অস্পষ্ট একটা বিষণ্নতার আমেজ: ঠাণ্ডা আকাশে আসন্ন বর্ষণের সঙ্কেত বলেই হয়তো; আমার মন চলে গেছে শহরের সেই নিরবচ্ছিন্ন কলরবের দিকে—হয়তো সেইজন্যে। কেবলই মনে পড়ছে শহরের সেই রকমারি আওয়াজ, রাস্তায় রাস্তায় মানুষের চঞ্চল আনাগোনা, চট্‌পটে কথাবার্তা আর চিন্তার খোরাক-জোগানো নানা শব্দের প্রাচুর্য।

সন্ধ্যেয় চা খেতে বসে খখলকে জিজ্ঞেস করলাম কখন সে চাষীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

'আলাপ-আলোচনা? কিসের?'

আমি বুঝিয়ে বললাম। গভীর মনোযোগ দিয়েই শুনল ও। তারপর বলল, 'ও, তা দেখুন, এসব বিষয় নিয়ে আমাকে যদি এদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়, তাও আবার এই প্রকাশ্য রাস্তায়—তাহলে তো ফের আমাকে যেতে হবে সেই ইয়াকুৎদের দেশে…'

পাইপে তামাক ঠেসে ফের ধরাল ও। ধোঁয়া ছাড়তে লাগল যতোক্ষণ না ওকে ঘিরে একটা ঘন মেঘ দাঁড়িয়ে যায়। তারপর ও আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল, মনে রাখার মতো কথা। বলল, চাষীরা খুব সতর্ক আর সন্দিগ্ধ মানুষ। তাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস নেই, প্রতিবেশীকেও বিশ্বাস করে না তারা—সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস ওদের বাইরের লোককে। তিরিশ বছরও হয়নি তারা মুক্তি পেয়েছে, চল্লিশ বছর বয়েসের যে-

কোনো চাষীর কাছেই গোলামিটা ছিল জন্মগত, সে কথা তারা ভোলেনি। এ স্বাধীনতার যে মানে কী তা বোঝা শক্ত। সোজাসুজি যদি জিনিসটাকে দেখ, স্বাধীনতার মানে তাহলে দাঁড়ায়: আমি আমার মর্জিমাফিক চলি। কিন্তু যেদিকেই ফেরো না কেন, মোকাবিলা সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে, কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে। তোমার খুশিমতো বাঁচার পথে তারা কাঁটা। জমিদারদের গ্রাস থেকে কৃষককে বাঁচিয়েছিলেন জার। সুতরাং এখন মনে হবে জারই বুঝি গোটা কৃষক-সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা। কিন্তু কথা হল: এ তাহলে কী ধরণের স্বাধীনতা? একদিন হয়তো আসবে যখন—বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ সম্রাট বুঝিয়ে বলবেন এই স্বাধীনতার আসল মানেটা কী। সারা দেশ আর সমস্ত ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র মালিক এই জারের ওপর চাষীদের বিপুল আস্থা। জারই তো জমিদারদের হাত থেকে চাষীকে বাঁচিয়েছিলেন, ব্যবসাদারদের হাত থেকেও উনি দোকান আর জাহাজ কেড়ে নেবেন। চাষীরা হল জার-ভক্ত। তাদের মতে, অনেক মনিব থাকাটাই খারাপ—একজন মনিব থাকলে সেটা বরং মন্দ নয়। চাষী অপেক্ষা করছে সেই দিনটার জন্য যেদিন জার তাকে স্বাধীনতার আসল তাৎপর্যটা বুঝিয়ে বলবেন। তারপর—যে যা পারো লুটেপুটে নাও। সেদিনটার জন্য সবাই হা-পিত্যেশ করছে, অথচ—মনে মনে প্রত্যেকের ভয়ও আছে; ভেতরে ভেতরে সবাই কাঁপছে এই বুঝি সেই সর্বজনীন ভাগবাঁটোয়ারার দিনটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল। এদিকে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে প্রত্যেকেরই। চাই অনেক কিছু, নেওয়ারও আছে অনেক, কিন্তু—কেমন করে নেব? এই একই জিনিস তো প্রত্যেকেই চাইছে। তার ওপর যেদিকেই ফেরো—সরকারী আমলাদের আর নিকেশ নেই, চাষীদের

সঙ্গে তো ওরা সরাসরিই দুশ্‌মনি করে, এমন কি জারের সঙ্গেও। অথচ, আমলা না থাকলেও এদিকে চলে না, সকলেই তখন সকলের টুঁটি চেপে ধরবে।

ঘরের জানলাগুলোর ওপর বসন্তের তুমুল বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগে চড়্‌বড়্‌ করে। বাইরের পৃথিবীটা যেন ধূসর ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। আমার মনটাও কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। নিচু, নরম গলায় রমাস্‌ তখনও বলে চলেছে সচিন্তিতভাবে:

'চাষীকে বোঝাতে হবে যে একটু একটু করে জারের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে শিখতে হবে তাদেরই। নিজেদের ভেতর থেকে সরকারি কর্মচারী নির্বাচন করার ক্ষমতা লোকের থাকা দরকার—এইটে তাদের বোঝাতে হবে। তারা তাদের থানার দারোগা, তাদের রাজ্যপাল, এমন কি জারকেও নির্বাচিত করবে…'

'ওভাবে তো একশো বছর লেগে যাবে!'

'তবে কি আপনি ভেবেছিলেন সামনের এই 'ট্রিনিটী রবিবারের' ভেতরেই সব হয়ে যাবে?' গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল খখল।

সন্ধ্যের সময় ও যেন কোথায় গেল। গোটা এগারোটা নাগাদ রাস্তায় একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম—বাড়ির খুব কাছেই। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে দেখি মিখাইলো আন্তোনোভিচ্‌ হেঁটে আসছে ফটকের দিকে—প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি যেন সাবধানে পা টিপে-টিপে সামনের জলের স্রোতগুলো ধীরে ধীরে এড়িয়ে এগিয়ে আসছে।

'বাইরে বেরিয়েছেন কেন, অ্যাঁ? গুলির আওয়াজ শুনেছেন? আমিই ছুঁড়েছিলাম।'

‘কী হয়েছিল?’

‘এই কতগুলো লোক, লাঠিসোঁটা নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল রাস্তার ওই দিকটাতে। বললাম, লাঠি ফেলে দাও, নইলে গুলি করব। কোনো ফল হল না তাতে। ব্যস্, তখন গুলি চালিয়ে দিলাম ওপরের দিকে। বাতাসের তো আর চোট্ লাগবার ভয় নেই…’

ভিজে জামা জুতো খুলতে খুলতে দরজার কাছে দাঁড়াল ও। হাত দিয়ে দাড়ি থেকে জল নিংড়ে বের করে দিল ঘোড়ার মতো ভঁস্-ভঁস্ করে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে।

‘এই হতভাগা জুতোজোড়া বুঝি ঝাঁঝরা হয়ে গেল! বদলাতে হবে। আপনি রিভলভার সাফ করতে জানেন? তাহলে মরচে ধরার আগেই দয়া করে ও কাজটি করে দিন না। কেরোসিন মাখিয়ে নিন, ব্যস্…’

ওর এই নিরুদ্বেগ প্রশান্তি, ধূসর চোখের মধ্যে নীরব একগুঁয়েমি দেখে আমি আর তারিফ না করে পারি না! ভেতরে ঢুকলাম দুজন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে চিরুণী চালাতে চালাতে ও আমায় হুঁশিয়ারী জানাল:

‘বাইরে যাবার সময় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখবেন, বিশেষ করে ছুটির দিনে সন্ধ্যের সময়। মনে হচ্ছে আপনাকেও ওরা ধোলাই দেবার ফিকিরে আছে। তবে সঙ্গে লাঠি নিয়ে বেরুবেন না কিন্তু। ও সব জিনিস দেখলে গুণ্ডাগুলোর মাথায় মেজাজ খিচড়ে যায়। তাছাড়া ওরা হয়তো ভাবতে পারে আপনি ভয় পেয়ে গেছেন। আসলে কিন্তু ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। সব বেটা কাপুরুষ…’

বেশ মজার এক জীবন আরম্ভ হল আমার। রোজই কিছু নতুন

আর অত্যাবশ্যক জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই পড়তে শুরু করলাম পরম আগ্রহ নিয়ে। রমাস্ আমায় উপদেশ দিয়েছিল:

'এই জিনিসটাই আপনার সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে ভালোভাবে জানা দরকার, মাক্সিমিচ। মানুষের সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।'

সপ্তাহে তিনটি সন্ধ্যে আমি ইজত্‌কে সাহায্য করতাম ওর লেখাপড়ায়। প্রথম প্রথম আমার সম্পর্কে ওর খট্‌কা ছিল, একটু যেন শ্লেষের সঙ্গেই আমার গুরুমশাইগিরিটা মেনে নিয়েছিল; কিন্তু দুয়েকটা পাঠ হয়ে যাবার পর রসিকতা করে একদিন বললে:

'বেশ ভালো বোঝাতে পার। গুরুমশাই হলেই তোমায় ঠিক মানাবে ছোকরা…'

তারপর হঠাৎ ও প্রস্তাব করে বসল:

'দেখ, তোমাকে তো বেশ শক্ত-সমর্থই মনে হয়। এসো একবার টানাটানি খেলা যাক।'

রান্নাঘর থেকে একটা লাঠি নিয়ে আসা হল। মেঝেতে বসে আমরা একজন আরেকজনের পায়ে পা ঠেকিয়ে দু-হাতে চেপে ধরলাম লাঠিটা। কিছুক্ষণ ধরে বৃথাই দুজন চেষ্টা করলাম পরস্পরকে মেঝে থেকে টেনে তুলতে। এদিকে খখল তখন মিটমিটিয়ে হাসছিল আর ওস্‌কাচ্ছিল আমাদের:

'বেশ! এই তো! মারো টান, হ্যাঁ!'

শেষ পর্যন্ত ইজত্ আমায় টেনে তুলল। মনে হল এবার থেকে যেন আমার ওপর ওর টানটাও আরো বেড়ে গেল।

বলল, 'ঘাবড়াও মৎ। বেশ জোর আছে তোমার গায়ে। মাছ্ ধরা ভালোবাসো না এইটেই যা দুঃখ, নইলে আমার সঙ্গে ভল্গায় আসতে পারতে। রাতে, ভল্গার পাড়ে—সে এক স্বর্গ, বুঝলে হে!'

খুব পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে লাগল ও, বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। নিজের জ্ঞান বেড়েছে দেখে ও ভারি অবাক হয়ে যেত, আর ওর সেই মনোভাবটাকে প্রকাশ করত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। মাঝেমাঝে পড়তে পড়তেই হঠাৎ উঠে গিয়ে বইয়ের তাক থেকে যে-কোনো একটা বই টেনে নিয়ে বসত। ভুরুজোড়া তুলে, কষ্টকৃত উচ্চারণে জোরে জোরে দু-তিনটে ছত্র পড়ত—তারপরেই উত্তেজনায় লাল হয়ে আমার দিকে ফিরে অবিশ্বাসভরে বলত:

'আমি পড়তে পারি! এমন আশ্চর্য ব্যাপার কখনো শুনেছ?'

তারপর চোখদুটো বুজে, বইয়ের সেই লাইনগুলোই ফের আবৃত্তি করত:

ধুধূ মাঠের ওপর দিয়ে পানকৌড়ি বিলাপ করে,
মায়ের হৃদয় যেমন কাঁদে মৃত ছেলের কবর পরে···

'কেমন লাগল, বলো তো?'

কখনো কখনো আবার সাবধানে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলত ইজত্:

'একটু বুঝিয়ে বলতে পারো, ভাই? কেমন করে এমনটা হয়? এই যে সব ছোট ছোট টান, মাত্রা, প্যাচগুলোর দিকে কেউ চাইলেই সেগুলো কথা হয়ে যায়! আর সে সব কথা আমি জানি! আমাদের নিজেদেরই কথা ওগুলো, যে-সব কথা আমরা হরদমই বলছি! কিন্তু কেমন করে চিনলাম তাদের? কেউ তো আমার কানে কানে বলে

দেয়নি। হ্যাঁ, যদি ছবি হত—তাহলে নয় বুঝতাম। কিন্তু এ যে একেবারে—মনে হয় যেন কারুর মনের ভাবগুলোই আমি জ্বলজ্যান্ত চোখে দেখতে পাচ্ছি; একেবারে নাকের ডগায় ছাপার অক্ষরে। কেমন করে এটা হয়?'

কী জবাব আমি তাকে দেব? 'আমি জানি না' বললে ও আবার দুঃখ পায়।

ও বলে, 'একেবারে ভেল্কি!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছাপা কাগজটা আলোর দিকে তুলে ধরে।

লোকটার ভেতর বেশ একটা মজাদার, মর্মস্পর্শী সারল্য আছে, এমন কিছু আছে যা স্বচ্ছ, শিশুসুলভ। বইয়ের পাতায় যে-সব মনগড়া চরিত্রের কথা লোকে পড়ে, ওকে দেখলে আমার তাদেরই কথা মনে পড়ে যায় বেশি করে। জেলেরা সাধারণত কবি হয়, তাই কবির মতোই ভালোবাসে ও ভল্গাকে, ভালোবাসে রাতের নিস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা আর ভাবাবেগময় জীবন।

আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ও আমায় প্রশ্ন করে:

'খখলের মুখে শুনেছি ওখানেও নাকি এই পৃথিবীর মতোই এক ধরণের জীবন্ত প্রাণী থাকা সম্ভব। তোমার কী মনে হয়? হতে পারে তা? যদি কেউ ওদের ইশারা করতে পারত—কেমনভাবে তারা জীবন কাটায় জিজ্ঞেস করতে পারত! খুব সম্ভব আমাদের চেয়েও ভালোভাবে বাঁচে ওরা। আরো বেশি ফূর্তিতে…'

মোটের ওপর নিজের জীবনটা নিয়ে ও সন্তুষ্ট। বাপ-মা বেঁচে নেই, অবিবাহিত। নিজের নির্ঝঞ্ঝাট আর মনের মতো পেশা মাছ ধরা নিয়েই ও

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আছে। কিন্তু গাঁয়ের পাড়াপড়শীদের ও পছন্দ করে না। আমাকে হুঁশিয়ার করে দেয়:

'ওদের নরম নরম কথায় কিন্তু কান দিও না। সব শেয়ালের জাত, ভয়ানক ধড়িবাজ। বিশ্বাস কোরো না ওদের! আজ হয়তো এক মুখে এক কথা বলছে, কাল আরেক মুখে আরেক কথা বলবে। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারুর জন্য ওদের কোনো ভাবনা নেই। সকলের যাতে মঙ্গল তা নিয়ে ওরা মাথাই ঘামায় না—এইটেই হল সবচেয়ে বড়ো আপদ!'

গাঁয়ের 'পেটমোটাদের' নিয়ে যেভাবে ঘৃণার সঙ্গে কথা বলে, ওর মতো একজন নরম-সরম মানুষের মুখে সেটা অদ্ভুতই শোনায়:

'আর সকলের চেয়ে ওদের টাকা পয়সা এত বেশি হল কী করে? কারণ ওরা বেশি চালাক। বেশ, চুলোয় যাক তারা; অতোই যদি ওরা চালাক তাহলে একটা জিনিস ওদের বুঝতে হবে: চাষীদের আসল শক্তিটা হল একদলে এক-কাঠ্ঠা হয়ে মিলেমিশে থাকা, কোনো ঝগড়াঝাঁটি না করে। ওইভাবে থাকলে জোর বাড়ে। কিন্তু তা তো নয়, ওরা সব গাঁটাকে দু-ভাগ করবে, গাছের গুঁড়ি চিরে জ্বালানি কাঠ বানাবার মতো। এই তো ওদের কাজ! নিজেদের সঙ্গেই দুশ্‌মনি। শয়তানের ঝাড় সব। খখলকে কি আন্দাজ নাকাল করছে দেখতে পাচ্ছ তো…'

চেহারাটা সুন্দর, সবল; তাই ওর সম্পর্কে মেয়েদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, ওকে তারা শান্তিতে থাকতে দেয় না।

সহজ রসিকতার সুরেই ও স্বীকার করে, 'মেয়েরা আমাকে গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে, সত্যি কথা। ওদের স্বামীরা ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করে না। ওদের জায়গায় হলে হয়তো আমিও করতাম না।

তবে, একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কোন্ মুখে তুমি খারাপ ব্যবহার করবে বল? মেয়েরা হল পুরুষের দ্বিতীয় আত্মার মতো। অথচ যেভাবে তারা জীবন কাটায়—নেই তাতে কোনো আনন্দ, নেই কোনো মায়া-মমতা। ঘোড়ার মতো খাটে, ব্যস্—ওই পর্যন্তই। স্বামীদের তো আর ভালোবাসাবাসির অবসর নেই, আমি কিন্তু এদিকে—বাতাসের মতো মুক্ত। ওদের অনেকেই বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতেই স্বামীর কিল ঘুষির আস্বাদ পায়। হ্যাঁ, আমি ওদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করি। স্বীকার করি সে কথা। আমি শুধু ওদের একটা কথাই বলি: নিজেদের ভেতর খুনসুটি কোরো না। তোমাদের সকলকেই আমি সমান যত্ন করি! একজন আরেকজনকে হিংসে কোরো না। তোমাদের সকলেই আমার নজরে সমান। প্রত্যেকের জন্যই আমার মনে দরদ আছে…'

তারপর মুখে লজ্জার হাসি টেনে ফের বলতে থাকে:

'একবার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রায় পাপ কাজ করে ফেলেছিলাম আর কি! শহর থেকে ভদ্রমহিলাটি এসেছিলেন এখানে, গ্রীষ্মের সময়টা কাটাবেন বলে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। দেখতে বড়ো সুন্দর—দুধের মতো সাদা গায়ের রঙ, চুলগুলো সোনালি। চোখগুলো একেবারে নীলার মতো নীল, দরদ উথলে উঠছে চাউনিতে। মাছ বেচতে যেতাম তাঁর কাছে, আর প্রত্যেকবারই হাঁ করে চেয়ে দেখতাম, ফেরাতে পারতাম না চোখ। উনি বললেন, "তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো?" আমি বললাম, "আপনিই ভালো জানেন।" উনি তখন বললেন, "বেশ, তাই হবে। রাতে তোমার কাছে আসব। অপেক্ষা কোরো।" আর সত্যি, সত্যি,

এলেনও। শুধু মশাগুলোই যা বিরক্ত করতে আরম্ভ করল ওঁকে। কাম্‌ড়ে একেবারে শেষ করে দিল। তা যা হোক, আমাদের ব্যাপার কিছু এগোলো না। উনি বললেন, "যেভাবে কামড়াচ্ছে, আর পারছি না।" প্রায় কেঁদেই ফেলেন আর কি। পরদিন তাঁর স্বামী এলেন। জজ কিংবা হাকিম টাকিম হবেন। তা, ভদ্রমহিলারা তো এই ধরণের মানুষ।' বিষণ্ন ভর্ৎসনার সুরে ইজত্‌ সিদ্ধান্ত টানল, সামান্য মশার ভয়েই জীবনটা ওঁদের ব্যর্থ হয়ে যায়…'

কুকুশ্‌কিনের দারুণ প্রশংসা করে ইজত্‌:

'লক্ষ্য কোরো লোকটাকে। সত্যিকারের প্রাণ আছে ওই মানুষটার, চমৎকার মনটা! লোকে পছন্দ করে না ওকে, কিন্তু—ভুল করে তারা! অবশ্য একটু বক্‌বক্‌ করে বেশি, এই যা—কিন্তু পুরোপুরি নিখুঁত কেই-বা আছে বলো?'

কুকুশ্‌কিনের জমিজমা ছিল না। পান্‌কভের ঘরে কৃষি-মজুরের কাজ করত সে। ওর বউও ছিল কৃষি-মজুর—মাতাল মেয়েমানুষ, ছোটখাটো, তবে খুব শক্ত-সবল আর চট্‌পটে, মেজাজটা তিরিক্ষি। বাড়িটা ওরা এক কামারকে ভাড়া দিয়েছিল। নিজেরা থাকত স্নানঘরটায়। কুকুশ্‌কিনের নেশা ছিল খবর রটানো, আর খবর যখন ফুরিয়ে যেত তখন নিজেই যতো নানা গল্প তৈরি করত—গল্পের সুরগুলো সব একই ধরণের, গৎ বাঁধা।

'শুনেছ হে, মিখাইলো আন্তোনোভিচ্‌? তিন্‌কোভো থানার পুলিশটা নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে। বলছে—চাষীদের আর দিক করতে চাইনে বাপু। অনেক হয়েছে।'

পরোদস্তর গাম্ভীর্য বজায় রেখে খখল মন্তব্য করে:

'এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে যে সমস্ত আমলাই দেখতে দেখতে দেশ থেকে উজাড় হয়ে যাবে।'

উস্‌কো-খুস্‌কো সোনালি চুল থেকে খড়, ঘাস, মুরগির পালক বাছতে বাছতে কুকুশ্‌কিন এই মন্তব্যটাকে বিচার করতে লেগে যায়:

'আমি বলছি না ওদের সবাই এমনটা করবে। শুধু যাদের একটু বিবেক আছে তারাই। এভাবে কাজ করা তাদের পক্ষে কঠিন কিনা। তুমি তো আবার বিবেকে বিশ্বেস করো না, আন্তোনিচ্‌। বিশ্বেস যে করো না সে তো দেখতেই পাই। কিন্তু যাই বলো, বিবেক বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, তা সে যতো চালাকই হোক না কেন। যেমন ধরো, এক ভদ্রমহিলা ছিল...'

বলেই সে কোনো এক 'সাঙ্ঘাতিক রকমের চালাক' জমিদারনীর গল্প শুরু করে দেয়:

'এমন পাজি আর নিষ্ঠুর ছিল সে যে স্বয়ং রাজ্যপাল পর্যন্ত নিজের অতো বড়ো মান-মর্যাদার আসন ছেড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। বলত—হুজুরানী, একটু সামলে, মানে যদি বুঝলেন না কোনো রকমে। কারণ আপনার শয়তানী কাজকর্মের খবর শুনছি সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ অবধি পৌঁছে গেছে! তা অবশ্য, সেও একটু মদ-টদ ঢেলে দিয়ে, শুধু জানিয়ে দিত—ঠাণ্ডা মাথায় বাড়ি ফিরে যান। আমার স্বভাব বদলাতে পারব না! তিন বছর কেটে গিয়ে আরো এক মাস গেল। একদিন হঠাৎ সে তার চাষীদের এক জায়গায় ডেকে বলল—এই নাও, আমার সমস্ত জমিজমা বুঝে নাও, বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা কোরো। আমি চললাম...'

খখল ফোঁড়ন দিলে, 'আশ্রমবাসিনী হতে।'

কুকুশ্‌কিন ওর মুখটা খুঁটিয়ে দেখে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ল।

‘ঠিক কথা। গেল আশ্রমের মাতাঠাকুরাণী হয়ে। তাহলে ওর কথা তুমিও শুনেছ দেখছি?’

‘না। কোনোদিনও এমন ধারা কিছু শুনিনি।’

‘তাহলে কীভাবে জানলে?’

‘তোমায় তো জানি।’

মাথা নেড়ে জল্পনাবিলাস। লোকটা বিড়বিড় করে বলে:

‘কখনো কোনো মানুষকে তুমি বিশ্বেস কর না…’

এই ব্যাপারই ঘটত প্রত্যেকবার: ওর গল্পের পাজি নিষ্ঠুর লোকগুলো খারাপ কাজ করে করে শেষ অবধি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারপর ‘প্রস্থান’ করে, কিংবা বেশিরভাগ সময়ই ও তাদের ঠেলে দেয় কোনো মঠ বা আশ্রমে—আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার মতো।

উদ্ভট ধরণের সব অপ্রত্যাশিত খেয়াল ওর মাথায় ঢুকত। হঠাৎ হয়তো নাক মুখ সিটকে বলে বসল:

‘তাতারদের হারিয়ে দেওয়াটা আমাদের উচিত হয়নি। ওরা আমাদের চেয়ে লোক ভালো।’ বলল এমন সময় যখন কেউ তাতারদের নিয়ে কোনো কথাই তোলেনি—কথা হচ্ছিল ফল-চাষীদের সমবায় সমিতি গড়ার ব্যাপার নিয়ে।

কিংবা, রমাস্‌ হয়তো সাইবেরিয়া আর ধনী সাইবেরিয়ান চাষীদের নিয়ে কোনো কথা বলছে, এমন সময় হঠাৎ কী ভেবে যেন বিড়বিড় করে বলে উঠল কুকুশ্‌কিন:

‘দু-তিন বছর যদি কেউ হেরিং মাছ না ধরে, তাহলে সমুদ্দুর একেবারে বোঝাই হয়ে উপ্‌চে পড়বে, আবার একটা জল-প্লাবন হয়ে যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার, মাছগুলোর বংশ বাড়ে কি রকম!’

গাঁয়ের সবাই ওকে জানে বাজে ওঁচা ধরণের লোক বলে। ওর গাল-গল্প, অদ্ভুত খেয়াল চাষীদের মেজাজ খিচড়ে দেয়। কিন্তু তবু, গালাগাল আর ঠাট্টা করলেও মন দিয়ে শোনে ওর কথাগুলো, রীতিমতো আগ্রহ নিয়েই শোনে—যেন আশা করছে ওর আজগুবি গল্পের ভেতর থেকেও যদি কিছু সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

মাননীয় লোকেরা ওকে বলে, 'কথার জাহাজ', শুধু ফিট্‌ফাট পান্‌কভই গম্ভীর চালে বলত:

'স্তেপান হেঁয়ালি করে কথা কয়...'

কুকুশ্‌কিন কিন্তু খুব করিৎকর্মা লোক। পিপে তৈরি করে, ইটের উনুন বানায়, মৌমাছিদের গতিবিধি বোঝে, মেয়েদের হাঁস-মুরগি পালতে শেখায়। কাঠমিস্তরির কাজেও সে ওস্তাদ। যে কোনো জিনিসই ওর হাতে পড়লে চমৎকার দাঁড়িয়ে যায়, তবে কাজ করে ঢিলে দিয়ে, খালি গাঁইগুঁই করে। বেড়াল ভালোবাসে খুব, প্রায় দু-গণ্ডা বেড়াল রেখেছে ওর স্নানঘরটার ভেতর—বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেশ খেয়েদেয়ে পুষ্ট হয়েছে প্রাণীগুলো। কাক আর ফিঙে শালিক এনে দেয় কুকুশ্‌কিন, পাখির মাংস খাওয়া ওদের তাই একটা অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকদের বিরক্তি এই কারণেই আরো বেশি বেড়েছে, কারণ পাড়াপড়শীদের মুরগির বাচ্চা, মুরগি, সব খেয়ে শেষ করে ওর ওই বেড়ালগুলো। স্তেপানের জানোয়ারগুলোকে পাড়ার মেয়েমানুষরা শিকার করে, ধরে ধরে ঠ্যাঙায় দয়া মায়া না দেখিয়ে। ওর স্নানঘরটায় তাই মাঝে মাঝেই শোনা যায় পাড়াপড়শীদের ক্রুদ্ধ নালিশের চিৎকার। কিন্তু এত সবের পরও ও নির্বিকার।

'মগজে সব গোবর পোরা! বেড়াল হল শিকারী জীব—কুকুরের

চেয়ে ওস্তাদ। এখন পাখি শিকার করতে শেখাচ্ছি, বেড়ালগুলোর যখন বাচ্চা হবে—শ'য়ে শ'য়ে বিয়োবে—তখন বেচে দেব। তাতে তো তোদেরই পকেটে টাকা আসবে—বোকা গাধার দল!'

একসময় লিখতে পড়তেও শিখেছিল, কিন্তু পরে সব ভুলে গিয়েছে, নতুন করে স্মরণশক্তিটাকে ঝালাই করে নেবারও ওর ইচ্ছে নেই। ওর সহজাত বুদ্ধি এত বেশি যে আর সকলের আগেই ও খখলের কথাবার্তার আসল বক্তব্যগুলো ধরে ফেলে।

বাচ্চা ছেলে তেতো ওষুধ খেলে যেমন মুখ বেঁকায় তেমনি করে ও বলত, 'তাহলে, বোঝা যাচ্ছে সম্রাট ইভান গ্রজ্‌নি ছাঁপোষা মানুষদের শত্তুর ছিলেন না।'

সন্ধ্যের দিকে একেকদিন কুকুশ্‌কিন, ইজত্‌ আর পান্‌কভ এসে অনেক রাত অবধি কাটিয়ে দিত। খখলের মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাঠামোর কথা শুনত, দেশবিদেশের জীবনযাত্রার কথা, সাধারণ মানুষের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা শুনত। পান্‌কভের মনে দাগ কেটেছিল ফরাসী বিপ্লব।

তারিফ জানিয়ে ও বলত, 'ওই হল জীবনের সত্যিকারের পরিবর্তন।'

এর প্রায় বছর দুয়েক আগে পান্‌কভ তার বাপের কাছ থেকে ওদের পারিবারিক সম্পত্তির ভাগ চেয়ে নিয়েছিল। পান্‌কভের বাপ ধনী-চাষী। গলায় বিরাট গলগণ্ড আর চোখগুলো ভয়ানক ঢেলা-ঢেলা। ইজতের এক অনাথা ভাগ্নীকে প্রেমের তাগিদে বিয়ে করে পান্‌কভ স্বাধীনভাবে সংসার পেতেছিল। বউকে ও কড়া শাসনে রাখলেও তাকে শহুরে মেয়েদের মতো পোশাক পরাত। পান্‌কভের একগুঁয়েমির

জন্য ওর বাপ ওকে শাপমন্যি দিত। যতোবারই ছেলের নতুন বাড়িটার কাছ দিয়ে যেত, ভয়ানক রেগে থুতু ছুঁড়তে ছুঁড়তে যেত সে। গাঁয়ের ধনীমানীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পান্‌কভ রমাস্‌কে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিল, দোকানের জন্য একটা চালাও তুলে দিয়েছিল। এইজন্যেই পান্‌কভের ওপর চটা ছিল ওরা। কিন্তু পান্‌কভ যেন গায়েই মাখত না। ওদের সম্পর্কে অবধারিতভাবেই ব্যঙ্গ করে কথা বলত সে, আর ওদের সঙ্গে কথা বলত খোঁচা দিয়ে, রূঢ় ভাষায়। গাঁয়ের জীবনের ওপর ভয়ানক অশ্রদ্ধা ছিল ওর।

'যদি ব্যবসা জানতাম, শহরেই আস্তানা করে নিতাম একটা…'

সুগঠিত দেহ, ছিমছাম পোশাকও পরত পান্‌কভ। গম্ভীর চলচলন, রীতিমতো মর্যাদা নিয়ে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়াত। ওর মনের গতিটা ছিল সন্দিগ্ধ, সতর্ক ধরনের।

রমাস্‌কে বলত, 'এ ধরনের ব্যবসায় নেমেছ কিসের তাগিদে বলো তো? ব্যবসা বুদ্ধি, না হৃদয়ের আবেগ?'

'তোমার কোন্‌টা মনে হয়?'

'আমি জানি না। তুমিই বলো।'

'কোন্‌টা হলে ভাল হত মনে হয়?'

'তা জানি না। তোমার কী মনে হয়?'

খখলের জিদ চেপে যায়। শেষ পর্যন্ত কথা টেনে বের করে চাষীর পেট থেকে।

'তোমার বুদ্ধির তাগিদেই, নিশ্চয়! সেইটেই তো ভালো রাস্তা কিনা। বুদ্ধি খাটালে মানুষের কোনো-না-কোনো দিক থেকে লাভ হবেই হবে, আর লাভ যেটা হবে সেটা একেবারে খাঁটি। কিন্তু

যদি প্রাণের তাগিদে চলো তাহলে ভরসা কম। আমি আমার হৃদয়ের হুকুম শুনে যদি চলতাম—উঃ, কী ঝামেলার মধ্যেই না পড়ে ছিলাম! তাহলে নিশ্চয় পুরুতটার বাড়িতে আগুনই লাগিয়ে দিতাম—ওকে শিখিয়ে দিতাম যেখানে সেখানে নাক গলানো ওর চলবে না।'

ছুঁচোর মতো ছোট্ট ছুঁচলো-মুখওয়ালা কুচুটে বুড়ো পাদ্রিটার ওপর পান্‌কভের দারুণ ঘেন্না—ওর বাপের সঙ্গে ওর ঝগড়ার ব্যাপারে সে মাথা গলিয়েছিল বলে।

আমার ওপর প্রথম প্রথম পান্‌কভ অতটা সদয় ছিল না, একটু যেন শত্রুতার চোখেই দেখত। এমন কি তম্বি করতেও ছাড়ত না। সেটা অবশ্য শীগ্‌গিরই বন্ধ হল। কিন্তু ওর ব্যবহারে আমার ওপর একটা চাপা অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে টের পেতাম। ওর এই অপছন্দের আমিও পাল্টা জবাব দিয়েছিলাম সে কথা অবশ্য স্বীকার করব।

ছোট্ট ছিমছাম ছাল ছাড়ানো কেঠো-দেয়ালের ঘরখানার ভেতর সেই সন্ধ্যাগুলো—সে আমি কোনোদিনই ভুলব না: জানলার খড়খড়ি বন্ধ, এক কোণে টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা বাতি, আর সেই বাতিটার ওপাশে বসে একমুখ লম্বা দাড়ি, উঁচু খাড়া-কপালওয়ালা এক মাথা কামানো লোক কথা বলে চলেছে:

'জীবনের আসল বিষয়টা হল—পশুত্বকে ছাড়িয়ে মানুষকে অনেক, অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে...'

আর তিনজন চাষী মন দিয়ে শুনছে: চোখগুলো ওদের চক্‌চকে, মুখগুলো বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ইজত্ সব সময় সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে যেন বহুদূরের কোনো শব্দ শুনছে যা ও ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। মশার কামড় খেয়ে উস্‌খুস্ করার

মতো কুকুশ্‌কিন খালি গা মোড়ামুড়ি দেয়। কটা রঙের ছোট ছোট গোঁপে তা দিয়ে পান্‌কভ হয়তো কী ভেবে আস্তে করে মন্তব্য ছাড়ে:

'তাহলে মোটের ওপর বোঝা যাচ্ছে মানুষদের একেকটা শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যাওয়াটা প্রয়োজন ছিল।'

পান্‌কভের একটা জিনিস আমি খুব তারিফ করতাম। ওর কৃষি-মজুর কুকুশ্‌কিনের ওপর ও কখনো রূঢ় ব্যবহার করত না, জল্পনা-বিলাসী কুকুশ্‌কিনের কপোল-কল্পনায় কান দেবার মতো একজন মনোযোগী শ্রোতা ছিল পান্‌কভ।

সান্ধ্য আলোচনার পর আমি আমার চিলেকোঠায় উঠে খোলা জানলাটার কাছে খানিকক্ষণ বসে ঘুমন্ত গ্রামখানার দিকে চেয়ে থাকতাম, দেখতাম দূরের প্রান্তর, নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে সেখানে। রাতের আঁধার ঠেলে আসছে তারার ঝিকিমিকি, আমার কাছ থেকে ওরা যতো দূরে, মনে হচ্ছে যেন ততোই ওরা মাটির কাছাকাছি। সুগভীর নিস্তব্ধতায় আমার অন্তর যেন কুঁকড়ে আসে, আমার চিন্তা ছড়িয়ে যায় অসীম শূন্যের মধ্যে — যেখানে আরো হাজারটা গ্রাম এমনি নিস্তব্ধ হয়ে মিশে রয়েছে মাটির চ্যাটালো বুকের সঙ্গে। অনড় আর নিশ্চুপ।

রাতের অন্ধকার শূন্যতা আমাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধেছে, যেন হাজারটা অদৃশ্য জোঁকের মতো লেগে রয়েছে আমার বুকে, যতোক্ষণ-না ধীরে ধীরে একটা তন্দ্রাতুর গ্লানি বোধ করি আমি, আর আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের এই পৃথিবীতে আমি কতোটুকু, কতো নগণ্য…

আমার কাছে পল্লীজীবন নিরানন্দ একটা অস্তিত্ব টেনে নিয়ে চলার সামিল। আগে তো কতোবারই শুনেছি, বইয়েও পড়েছি— শহরের চেয়ে গ্রামদেশের জীবনযাত্রা নাকি অনেক সুস্থ, অনেক আনন্দময়। অথচ দেখলাম চাষীরা অবিশ্রাম অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে। অনেকেই অসুস্থ, অনেকেই অতিরিক্ত খাটুনির ফলে অকর্মণ্য, হাসিভরা মুখ এদের ভেতর দেখাই যায় না বলতে গেলে। বরং শহরের মজুর কারিগররা এদের চেয়ে কম পরিশ্রম না করলেও অনেকটা ফূর্তিতে জীবন কাটায়। মনমরা এই গাঁয়ের লোকদের মতো বিষণ্ণ একঘেয়েভাবে তারা তাদের জীবন সম্পর্কে নালিশ জানায় না। কৃষকের জীবন আমার কাছে সহজ মনে হয়নি। একটানা অতিরিক্ত মনোযোগ রাখতে হয় জমির দিকে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে তাদের যথেষ্ট চালাকি খেলতে হয়। তা ছাড়া মস্তিষ্ক-বর্জিত এই অস্তিত্বের ভেতর আনন্দেরও কোনো চিহ্ন নেই। মনে হয় গাঁয়ের সমস্ত মানুষ যেন অন্ধ জীবের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে চলেছে। সবার মনেই যেন একটা কিছুর ভয়, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করে, নেকড়ের মতো মনোভাব রয়েছে এদের প্রত্যেকের ভেতরে।

খখল, পান্কভ এবং 'আমাদের' সমস্ত লোককেই ওরা যে কেন জেদের বশে ঘৃণা করে চলত আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। অথচ এরা তো ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

শহরের থাকার সুবিধাগুলো আমার কাছে এখন পরিষ্কার: সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে ব্যগ্র কামনা, উৎসাহশীল জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তি, লক্ষ্য ও সমস্যার বহুধা-বিচিত্রতা। আর এমনি একেকটা রাতে অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে যায় দু-জন শহরবাসীর কথা:

'ফ. কালুগিন ও জ. নেবেই'

'সর্বপ্রকারের ঘড়ি নির্মাতা। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি, শল্যচিকিৎসার অস্ত্র, সেলাইকল যে-কোনো কোম্পানীর তৈয়ারি কলের গান ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসও মেরামত করিয়া থাকি।'

ছোট দোকানের ধূলো-ভরা দুই জানলার মাঝখানে সরু একটা দরজার মাথায় ঝুলত সাইন-বোর্ডখানা। একটা জানলার পেছনে বসত ফ. কালুগিন — গাঁট্টাগোঁট্টা চাঁদপানা মুখ, প্রায় সব সময়ই হাসত সে। হলদে টাকমাথায় একটা আবের মতো ছিল, চোখে সব সময় থাকত পরকলার কাঁচ। মাঝে মাঝে ঘড়ির যন্ত্রপাতির আনাচে-কানাচে একটা সরু চিম্‌টে চালিয়ে ও গান ধরে দিত আর কড়কড়ে পাকা গোঁপের নিচে ঠোঁটদুটো ওর গোল আর হাঁ হয়ে উঠত। আরেকটা জানলায় বসত জ. নেবেই — সে হল রোগা কালো মানুষ, একটা শয়তানের মতো। কোঁকড়া ঢেউখেলানো চুল, ছুঁচলো দাড়ি, প্রকাণ্ড বাঁকা নাক আর আলুবখরার মতো বড়ো বড়ো চোখগুলো। সেও সব সময় ব্যস্ত থাকত নানা রকমের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি জোড়াতালির কাজে। মাঝে মাঝে হঠাৎ মোটা হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠত:

'ট্রা-টা-টাম্, টাম্, টাম্!'

ওদের পেছনে মেঝের ওপর লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখতাম নানান জিনিস — বাক্স, কলকব্জা, ফালতু চাকা, কলের গান, স্কুলঘরের গ্লোব। নানা বিচিত্র আকারের ধাতব বস্তু তাকগুলোর মধ্যে সাজানো থাকত। দেয়ালে টাঙানো থাকত দোলনো পেণ্ডুলামওয়ালা সারি সারি ঘড়ি। ওখানে হয়তো দিনের পর দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কাজকর্ম দেখতেও আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার লম্বাটে

দেহটা আলোর ব্যাঘাত জন্মাত বলে ঘড়িওয়ালারা ভয়ানক মুখ ভেংচে হাত তুলে ইশারা করে আমার বেরিয়ে যেতে বলত। সরে গিয়ে আমি মনে মনে খুব ঈর্ষার সঙ্গে ভাবতাম:

'এদের কপালটা ভালো। যেমন খুশি যে কোনো কাজ চালিয়ে নিতে জানে।'

ঘড়িওয়ালা দুজনের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতাম যে সমস্ত রকম মেশিন আর কলকব্জার গোপন রহস্য ওদের জানা, পৃথিবীর যে-কোনো বস্তু ওরা মেরামত করতে পারে। এরাই হল মানুষ।

কিন্তু গ্রামের জীবন আমার পছন্দ হল না। চাষীদের বোঝা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। বিশেষ করে নিজেদের খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে: মেয়েদের নালিশ অফুরন্ত: এই 'বুকের ভেতরটা হা-হা করছে', এই 'কেমন যেন ভার ভার লাগে', আর প্রায় সর্বদাই লেগে আছে 'পেটের ভেতর খিল্ ধরা'। অন্য যে-কোনো বিষয়ের চেয়ে এইসব রোগ-লক্ষণ নিয়ে আলোচনাতেই ওরা বেশি ব্যগ্র, বেশি মুখর-রবিবার কি ছুটির দিন হলে ভল্‌গার পাড়ে কিংবা বাড়ির সামনে বেঞ্চিতে বসে এইসব আলোচনাই চলত। চাষীরা সবাই ভয়ানক রকমের রগ্-চটা; যে কোনো সামান্য ব্যাপারেই ভয়ানক শাপমন্যি করতে থাকে। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি নিয়ে তিন-তিনটে পরিবার লাঠিসোটা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করেছিল, হাঁড়িটার দাম নতুন অবস্থাতে ছিল মাত্র বারো কোপেক। এক বুড়ির হাত ভেঙে আর একটা ছোকরার মাথা ফাটিয়ে তবে ওদের লড়াই ঠাণ্ডা হয়। এমনি ধরনের মারামারি বোধহয় একটি সপ্তাহও বাদ যায় না।

জোয়ান ছেলেরা মেয়েদের নিয়ে নির্লজ্জ লুচ্ছামি করত, যতো রকমের ইতর চালাকি খেলত ওদের সঙ্গে। মাঠের মধ্যে কোনো মেয়েকে ধরে হয়তো তার ঘাগরাটা মাথার ওপর তুলে দিয়ে গাছের বাকল দিয়ে গিঁট বেঁধে দিল। এটাকে ওরা বলত 'ফুল-বাঁধুনি' খেলা। কোমর থেকে পা অবধি উলঙ্গ হয়ে মেয়েগুলো চেঁচাত, গালিগালাজ করত, কিন্তু খেলাটা ওদের খুব যে অপছন্দ হত তা মনে হয় না। অন্তত, গিঁট খুলতে যতোটা সময় লাগা উচিত তার চেয়ে অনেক আস্তে আস্তেই খুলত। সান্ধ্য উপাসনার সময় গির্জের ভেতর ছেলে-ছোকরাদের একমাত্র কাজ ছিল মেয়েদের পাছায় চিম্‌টি কাটা। মনে হত যেন ওই উদ্দেশ্য নিয়েই ওরা আসে। রবিবার পুরুতমশাই বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করতেন:

'জানোয়ার সব! অশ্লীলতার আর জায়গা পেলে না!'

রমাস্‌ আমায় বলেছিল, 'উক্রাইনীয় মানুষরা ধর্মের ব্যাপারে এদের চেয়ে অনেক বেশি—মানে অনেক বেশি কাব্যিক আর কি। এখানে শুধু দেখি ঈশ্বর-বিশ্বাসের আড়ালে রয়েছে ভয় আর লোভের স্থূল মনোবৃত্তি। ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের আন্তরিক ভক্তি, তাঁর শক্তি ও সৌন্দর্যের সম্পর্কে আনন্দবিহ্বল বিস্ময়—এ সব জিনিস এদের মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে না। হয়তো ব্যাপারটা ভোলোই। ধর্মের হাত থেকে এরা রেহাই পাবে আরো সহজে। আর এই ধর্ম জিনিসটা হল সবচেয়ে মারাত্মক কুসংস্কার—সে কথাটা আমি তোমায় বলে রাখলাম।'

গাঁয়ের যুবকদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সাহস নেই। এর মধ্যে তিনবার ওরা আমায় রাতে রাস্তায় ধরে মার দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছে। একবার শুধু আমার পায়ের ওপর

একটা মুগুরের ঘা পড়েছিল। এসব ঘটনার কথা অবশ্য রমাসের কাছে আমি চেপে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই আঘাতটার ফলে খোঁড়া হয়েছিলাম বলে ও আন্দাজ করতে পেরেছিল ব্যাপারটা।

'শিক্ষা হয়েছে তো? বললাম সাবধানে থাকুন!'

যদিও ও আমায় সন্ধ্যের পর গাঁয়ের ভেতর না ঘুরতে উপদেশ দিয়েছিল, আমি কিন্তু মাঝে মাঝে পেছনের শব্জি-খেতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে ভল্‌গার ধারে চলে যেতাম। সেখানে উইলোগাছ্‌গুলোর নিচে বসে রাতের স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম উল্টোদিকের ঢালু পাড়ের দিকে। মন্থর উদার ভল্‌গা বয়ে চলেছে সামনে দিয়ে—অদৃশ্য সূর্যের কিরণ মরা চাঁদের বুকে প্রতিফলিত হয়ে ভল্‌গার জলকে সোনায় মুড়ে দিয়েছে। চাঁদ আমার ভালো লাগে না। চাঁদের ভেতর যেন অশুভ কিছু একটা আছে। কুকুরের মতো আমারও খারাপ লাগত চাঁদের আলো, ইচ্ছে হত করুণ আর্তনাদ করে উঠি। যেদিন জানলাম চাঁদের আলো তার নিজস্ব নয়, চাঁদ হচ্ছে মৃত, সেখানে কোনো প্রাণ নেই—প্রাণ সেখানে সম্ভবই নয়—সেদিন ভারি খুশি হয়েছিলাম। এটা জানার আগে চাঁদকে আমি কল্পনা করতাম একজাতীয় তাম্র-মানবের বাসভূমি বলে। এই জীবগুলো যেন ত্রিভুজাকৃতি, লম্বা কম্পাসের কাঁটার মতো পায়ে ভর দিয়ে চলে, আর লেণ্টের গির্জা-ঘণ্টার মতো সাঙ্ঘাতিক ঠং ঠং আওয়াজ তোলে। চাঁদের সবকিছুই যেন তামা—আর উদ্ভিদ, প্রাণী, সবকিছু যেন অনবরত একটা দম-আটকানো ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে চলেছে পৃথিবীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন কলরবে। পৃথিবীর বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্রে যেন সবকিছুই গভীরভাবে লিপ্ত। জেনে খুশি হয়েছিলাম যে আকাশমণ্ডলে চাঁদটা আসলে অতি নগণ্য,

কিন্তু আরো ভালো হত যদি কোনো প্রকাণ্ড উল্কা এসে আঘাত করত চাঁদকে—এমন কঠিন আঘাত হানত যে চাঁদ ফেটে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসত, চাঁদের নতুন একটা নিজস্ব আলো ঠিকরে পড়ত পৃথিবীর বুকে।

মন্থর ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোলে চাঁদের আলোর জরি-দেওয়া টুকরো, দূরের আবছায়া থেকে ঢেউগুলো বেরিয়ে এসে ফের মিলিয়ে যায় খাড়া পাড়ের কালো ছায়ার আড়ালে—এইসব দেখে আমার প্রাণে জাগে এক নতুন সজীবতা, নতুন প্রতীতির স্বচ্ছতা। বিনা আয়াসেই অনির্বচনীয় এক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় আমার মন, সে চিন্তা আমার সারাদিনের জীবন-ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জলরাশির রাজকীয় ধারা প্রায় নিঃশব্দ। চওড়া কালো স্রোতের উজানে কিংবা ভাঁটিতে হয়তো এক-আধটা স্টীমার ছুটেছে—মনে হচ্ছে যেন আগুনের পালকওয়ালা রূপকথার পাখি, পেছনে রেখে যাচ্ছে যেন ভারি ডানা-সাপ্টানো একটা কোমল ছপ্ছপ্ শব্দ। হয়তো বা নদীর ঢালু পাড়ে একটা আলো জ্বলে উঠল জলের ওপর লম্বা সিঁদুর-রঙা কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে। নেহাতই কোনো এক মেছো-জেলের মশাল হয়তো, কিন্তু তবু মনে হবে যেন একটা কক্ষচ্যুত তারা, আকাশ থেকে নেমে এসেছে, আগুনের ফুলের মতো নদীর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

বইয়ে যে-সব জিনিস পড়েছি তারা যেন অদ্ভুত কল্প-কাহিনীর রূপ নিয়েছে, একের পর এক কল্পনায় জেগে উঠছে অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। রাতের হাল্‌কা হাওয়ায় ভর দিয়ে যেন আমি ভেসে চলেছি, ভেসে চলেছি স্রোতের পিছু পিছু।

ইজতের সঙ্গে এখানে আমার দেখা হয়ে গেল। রাতের আঁধারে ওকে অনেক লম্বা, অনেক আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে।

ও বলে, 'আবার বেরিয়েছ?' তারপর আমার পাশে বসে একটা দীর্ঘ চিন্তাকুল নীরবতায় ডুবে যায়, তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে কিংবা আকাশের দিকে, আর রেশমের মতো সোনালী দাড়িতে হাত বুলোয়। মাঝে মাঝে আবার বাঙ্‌মুখর হয়ে ওঠে ওর স্বপ্ন:

'কিছুটা পড়াশোনা করব, সমস্ত রকমের বই পড়ে নেব। তারপর ধরব একেকটা নদীর রাস্তা! যে-কোনো জিনিস আমার কাছে তখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে! অন্য মানুষদেরও আমি শেখাব! হঁ্যা, নিশ্চয়। নিজের বুকখানা যখন মেলে ধরতে পারব তখন এত ভালো লাগবে ভাই যে কী বলব! এমন কি মেয়েরাও—ওদের মধ্যে কেউ তো ভালোই বুঝতে পারে যদি অবশ্য মনপ্রাণ দিয়ে বলো। এইতো সেদিন আমার সঙ্গে নৌকোয় বেড়াচ্ছিল একটি মেয়ে। সে জানতে চায় মরার পরে আমাদের কী গতি হয়! বলে—নরকে আমি বিশ্বেস করি না, স্বর্গেও নয়। তোমার কাছে কেমন মনে হয় ব্যাপারটা? মেয়েরাও ভাই, বুঝলে ওরাও...'

কথা হাতড়াতে গিয়ে কিছুক্ষণ থামে সে, তারপর ফের বলে:

'হঁ্যা, প্রাণ বলে জিনিসটা ওদেরও আছে...'

ইজত্‌ রাত্রিচর প্রাণী। ওর সৌন্দর্যবোধ সূক্ষ্ম, তা নিয়ে কথা বলার ধরণটাও ভারি চমৎকার—স্বপ্ন দেখা শিশুর মতো পেলব ভাষায় সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয় সে। ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস আছে, তবে ঈশ্বর-ভীতি নেই, যদিও ওর ঈশ্বর-বোধটা গির্জার মামুলি ধারণার বাইরে নয়। ঈশ্বর হলেন বিরাটকায় সুপুরুষ বৃদ্ধ, বিচক্ষণ আর করুণাময়

বিশ্ব-বিধাতা। মন্দের ওপর তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেননি শুধু এই কারণে যে: 'সবকিছু করার তাঁর সময় কোথায়? আমাদের মানুষের সংখ্যাও তো বড়ো কম নয়, রে বাপু। কিন্তু উনি ঠিক সামলে নেবেন, দেখে নিও, হঁ্যা—একটু সবুরই করো তারপর দেখতে পাবে! তবে ওই যে খ্রীষ্টের ব্যাপারটা—ওইটেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে। উনি যে আবার কোত্থেকে এসে জুড়ে বসলেন সে আমার বোঝার বাইরে। ঈশ্বর তো একজন রয়েছেনই, তাই না? বেশ তো, সেই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা নয়, আবার একজন মানুষকে এনে ঢোকানো হচ্ছে। ঈশ্বরের পুত্র নাকি উনি। আর যদি হলেনই বা ওঁর পুত্র, কী হয়েছে তাতে? ঈশ্বর তো যতোদূর জানি এখনও মারা যাননি…'

অবশ্য বেশির ভাগ সময় ইজত্ আমার পাশে চুপচাপই বসে থাকে, নিজের কী এক ভাবনায় ডুবে থাকে যেন। মাঝে মাঝে দুয়েকবার শুধু নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে:

'হঁ্যা, এইভাবেই ঘটে…'

'কী?'

'কিছু না। নিজের মনেই কথা বলছিলাম…'

তারপর আবার নিশ্বাস ফেলে অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চোখ তুলে দেখে ইজত্।

'ভারি সুন্দর জিনিস—এই জীবন!'

এ ব্যাপারটায় আমি একমত:

'হঁ্যা, জীবনটা সত্যিই সুন্দর।'

আমাদের সামনে ছায়া-শ্যামল জলের মখমল ফিতে– সবেগে বয়ে চলেছে নদী। নদীর ওপর আবার ধনুকের মতো বাঁকা ছায়াপথের

রূপোলি ফিতেটা। কালো আকাশের বুকে দুলছে বড়ো বড়ো তারা—উজ্জ্বল সোনালী পাখির মতো। ধীরে ধীরে হৃদয় আমাদের গান গেয়ে ওঠে—জীবনের গোপন রহস্য নিয়ে কল্পনার পাখা মেলে। যুক্তির ধার ধারে না।

মেঠো ঢালু জমি ছাড়িয়ে অনেকটা উঁচুতে লাল-হয়ে-ওঠা মেঘ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ব্যগ্র আলোর রেখা, তারপরই হয়তো সারা আকাশে ময়ূরপুচ্ছ মেলে দিয়ে সূর্য ওঠে।

ইজত্ খুশির হাসি হেসে অস্ফুত স্বরে বলে, 'সূর্যটা যেন একটা জাদু!'

আপেল গাছে ফুল ফুটেছে। সারা গাঁ যেন ডুবে গেছে গোলাপী মেঘের আড়ালে। পিচফল আর সারের গন্ধ ছাপিয়ে উঠে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে একটা তেতো তেতো গন্ধ। খেত আর বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ—গোলাপী রেশমী মুকুলের উৎসব-সাজ পরে। জোছনা রাতে যখন হাল্কা হাওয়া ওঠে আর ফুলের-বসন-পরা ডালগুলো দোলে চাপা চুপি-চুপি আওয়াজ তুলে, তখন মনে হয় যেন ভারি ভারি নীল সোনালী ঢেউ এসে লাগছে গোটা গ্রামটার বুকে। অক্লান্ত আবেগ দিয়ে গান গায় রাতের নাইটেঙ্গেল। সারাদিন ধরে ফুর্তিতে কিচ্‌মিচ্ করে শুকপাখিগুলো আর অদেখা স্কাইলার্কের অফুরন্ত মিষ্টি গানে ভরে ওঠে পৃথিবী।

ছুটির দিন সন্ধ্যের সময় মেয়ে আর যুবতীরা রাস্তায় পায়চারি করে আর সবে ডানা-গজানো পাখির বাচ্চার মতো মুখ হাঁ করে করে গান গায়, অলস নেশা-ভরা হাসিতে ওদের চোখগুলো বুজে আসে যেন। ইজত্ও আজকাল মাতালের মতো হাসে। ওর ওজন কমে যাচ্ছে,

কালি-পড়া চোখদুটো কোটরে বসেছে। ওর মুখের রেখাগুলো আগের চেয়েও দৃঢ় আর সুন্দর হয়ে উঠেছে—আগের চেয়েও বেশি সাত্ত্বিক ভাব এসেছে চেহারায়। সারাদিন ঘুমিয়ে যখন সন্ধ্যে লাগতে থাকে তখন সে গাঁয়ের ভেতর আসে অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবতে ভাবতে। কুকুশ্কিন ওকে বন্ধুভাবেই অসভ্য রসিকতা করে খোঁচায়। লাজুক কাষ্ঠহাসি হেসে ইজত্ জবাব দেয়:

'চুপ করো তো তুমি! এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে শুনি?'

তারপর উল্লাসের আবেশে বলে চলে:

'আহা, জীবনটা কিন্তু ভারি মিষ্টি! আর—ভেবে দেখ একটিবার—যতোরকমের বুক-ভরা ভালোবাসা হতে পারে, দুজনের মনকে খুশি করার জন্য যতোরকমের মন-গলানো কথা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—সব। ওদের মধ্যে কয়েকটা কথা আছে, যাদের তুমি মৃত্যুর দিনটি অবধি ভুলতে পারবে না; তারপর যেদিন মৃতদের পুনরুত্থান হবে সেদিন এই কথাই তোমার মনে হবে সব প্রথম।'

'ওহে সামলে! ওদের স্বামীরা টের পেলে কিন্তু ছাল ছাড়িয়ে নেবে', সস্নেহে মুচ্কি হেসে খখল ওকে সাবধান করে দেয়।

ইজত্ একমত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, তার অবশ্য কারণ আছে বটে।'

প্রায় রোজ রাতেই, নাইটেঙ্গেলের গানের ফাঁকে-ফাঁকে ভেসে আসে মিগুনের চড়া গলার প্রাণ-মাতানো গান—ফল বাগান, খামারের খেত কিংবা নদীর ধার থেকে। অদ্ভুত সুন্দর গান গায় ও, আর ওর এই গানটুকুর জন্যই চাষীরা পর্যন্ত ওর সাতখুন মাপ করে দেয়।

শনিবারের সন্ধ্যেগুলোতেই আমাদের দোকানের কাছে বেশি বেশি করে লোক জমতে থাকে—ওদের মধ্যে বুড়ো সুস্লভ, বারিনভ,

ক্রুতভ কামার আর মিগুন তো থাকবেই। ছড়িয়ে বসে আসর জমায় ওরা, নানান কথা ভাবতে ভাবতে গল্প করে, একজন উঠে যায় তো আরেকজন আসে; এইভাবেই চলতে থাকে প্রায় মাঝরাত অবধি। মাঝে মাঝে এক আধজন মাতাল এসে চেঁচামেচি শুধু করে দেয়—সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কস্তিনকে। কস্তিন প্রাক্তন সৈনিক, একচোখ কাণা, আর বাঁ হাতের দুটো আঙুল নেই। এই হয়তো লড়ুয়ে মোরগের মতো পালোয়ানী চালে দোকানের দিকে এগিয়ে এল জামার হাতা গুটিয়ে, পাগলের মতো হাতদুটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে। তারপর হয়তো ভাঙা ঘঁ্যাসঘেসে গলায় জুড়ে দিল চিৎকার:

'ওরে খখল! বজ্জাতের জাত, তুর্কি কাফের! আমরা জানতে চাই কেন তুই গির্জেয় যাস্‌নে? কেন? বিধর্মী! ঝামেলা-বাজ! আমরা জানতে চাই তুই কী ধরনের মানুষ?'

লোকে তামাশা শুরু করে দেয়:

'মিশ্‌কা রে! গুলি চালাতে গিয়ে আঙুলদুটো উড়িয়ে দিলি কেন? তুর্কিদের দেখে বুঝি ভয় পেয়েছিলি?'

এই কথা শুনে কস্তিন লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু চাষীরা ওকে পাকড়ে ধরে। চেঁচাতে চেঁচাতে, হো-হো করে হাসতে হাসতে খানাটার ধারে নিয়ে গিয়ে ওকে উল্টে ফেলে দেয়। ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে ও অসহ্য রকম আর্তনাদ করতে থাকে:

'খুন! খুন! বাঁচাও...'

তারপর আপাদমস্তক ধূলি-ধূসরিত হয়ে উঠে আসে ওপরে, এক গ্লাস ভদ্‌কার দাম চেয়ে বসে খখলের কাছে।

'কেন?'

'সকলকে আনন্দ দিলাম বলে', জবাব দেয় কস্তিন। চাষীরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

এক ছুটির দিনের সকালে রাঁধুনী স্ত্রীলোকটা সবে রান্নাঘরের উনোনে আগুন দিয়ে উঠোনে বেরিয়েছে; আমি কাজ করছিলাম দোকানে, এমন সময় ফঁস করে একটা দমকা আওয়াজ উঠল রান্নাঘরের ভেতরে। গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল। তাক থেকে উল্টে পড়ল মিছরি টিনগুলো। ভাঙা কাঁচের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ উঠল, আরো সব কী কী জিনিস যেন হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। অন্দরের ঘরে ছুটে গেলাম আমি। রসুইঘর থেকে ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছিল। ওপাশে ধোঁয়ার আড়ালে কী যেন হিস্‌হিস্ করে ফাট্‌ছিল। খখল আমার কাঁধটা চেপে ধরে বলল:

'দাঁড়াও…'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল রাঁধুনী।

'হাঁদা মেয়েমানুষ…'

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল রমাস্। রান্নাঘরে কী যেন খুট্‌খুট্ করতে লাগল সে। চেঁচিয়ে গালাগাল ঝেড়ে হঠাৎ তারস্বরে বলে উঠল:

'তোমার ওই কান্না থামাও তো। যাও জল নিয়ে এস!'

মেঝের ওপর পড়ে-থাকা কাঠের ডাণ্ডাগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছিল। ওগুলোর ভেতর ছড়িয়ে রয়েছিল ইট, জ্বলন্ত কাঠের টুকরো। উনোনের কালো গহ্বরটা ফাঁকা, যেন ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে এগিয়ে গেলাম আমি জলের জায়গায়। মেঝের আগুনের ওপর জল ঢেলে দিলাম এক বাল্‌তি। তারপর উনোনের ভেতর ফের কাঠগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগলাম।

খখল আমায় বলল, 'সাবধান!' আবর্জনার ওপর দিয়ে রাঁধুনীকে টেনে এনে তাকে অন্দরের ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে হুকুম করল,

'যাও তো, দোকানে তালা দিয়ে এসো।' তারপর আমাকে বলল, 'সাবধান কিন্তু মাক্সিমিচ! আবার ফাটতে পারে…।' গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে খুব সাবধানে ও প্রত্যেকটা কাঠের ডাণ্ডা পরীক্ষা করতে লাগল। ডাণ্ডাগুলো গোল গোল, ছিমছাম করে কাটা। তারপর কাঠের যে টুকরোগুলো আমি সবে উনোনের মধ্যে ফেলেছি সেগুলো টেনে তুলতে লাগল।

'ও কী করছেন আপনি?'

'এই যে—এই দেখুন!'

কাঠের যে রলাটা ও আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটা দেখলাম অদ্ভুত রকমভাবে ফাটা। আরো ভালো করে চেয়ে দেখতেই দেখি তুরপুন দিয়ে ভেতরটা ফুটা করা হয়েছে, ফোকরের ভেতরের দিক পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

'দেখলেন তো? এটার ভেতর কোনো শয়তান বারুদ ঠেসে রেখেছিল। যতোসব গাধা! আরে, মাত্র আধ সের বারুদ দিয়ে কি কারুর কোনো লোকসান করা যায়?'

রলাটা সরিয়ে রেখে ও হাতদুটো ধুতে লাগল। ফের বলল:

'ভাগ্যিস্ আক্সিনিয়া ঘরের বাইরে বেরিয়েছিল। নয়তো জখম হয়ে যেত…'

ঝাঁঝালো ধোঁয়াটা উপরে উঠে গেছে। এবার দেখতে পেলাম তাকের ওপর বাসনগুলো সব ভাঙা, জানলার কাঁচ উধাও। উনোনের মুখের কাছ থেকে বেশ কয়েকটা ইট ছিটকে বেরিয়ে গেছে।

খখলের এখনকার এই নির্বিকার ভাবটা আমার কিন্তু পছন্দ হল না। এমনভাবে ও চলাফেরা করছে যেন এই বোকা-চালাকিতে ওর মনে বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। বাচ্চা-কাচ্চাদের দল বাইরে দৌড়োদৌড়ি করছিল। কয়েকজনকে চেঁচাতে শোনা গেল:

'আগুন! আগুন! খখলের ঘরে আগুন লেগেছে!'

একজন স্ত্রীলোক হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। অন্দরের ঘরে আক্সিনিয়া ব্যাকুল হয়ে চেঁচাতে লাগল:

'মিখাইলো আন্তোনিচ! ওরা যে দোকানঘরের ভেতর এগোতে চেষ্টা করছে!'

'চুপ্! আসছি', ভিজে দাড়িটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে খখল বলল।

ভয় আর রাগে বিকৃত লোমশ মুখগুলো ভেতরের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল—ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় চোখগুলো তাদের কুঁচকে গেছে। কে যেন উত্তেজিত তীক্ষ্ণ সরু গলায় চিৎকার করে উঠল:

'গাঁয়ের বাইরে ভাগিয়ে দে ওদের! তাদের ঘরে ঝগড়ার আর শেষ নেই!'

লাল মাথা খুদে-চেহারার একটি লোক প্রাণপণ চেষ্টা করছিল জানলার ওপর উঠতে, প্রত্যেকবার গুঁতো দেবার সময় সে ক্রুশ-প্রণাম করছিল আর বিড়বিড়িয়ে কী যেন বলছিল। কিন্তু কিছুতেই পারল না। লোকটার ডান হাতে একটা কুড়ুল। মরিয়া হয়ে বাঁ হাতে যতোবার জানলার চৌকাঠটা পাকড়াতে যাচ্ছে ততোবারই ফস্কে যাচ্ছে।

ফাঁপা কাঠের রলাটা হাতে নিয়ে রমাস্ তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কিসের তালে আছ শুনতে পারি কি?'

'আগুল নেভাব, বাবা...'

'আগুন-টাগুন লাগেনি কোথাও...'

সভয়ে হা করে চেয়ে থেকে চাষীটা এবার বিদায় হল। রমাস্ গেল দোকানের বারান্দার নিচে। কাঠের রলাটা হাতে উঁচু করে ধরে সে জনতাকে উদ্দেশ করে বলল:

'তোমাদের ভেতরেই কেউ এই জিনিসটার মধ্যে বারুদ পুরে আমাদের জ্বালানি কাঠের ভেতর রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু ক্ষতি করার মতো যথেষ্ট বারুদ ছিল না...'

খখলের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি ভিড়ের দিকে চেয়েছিলাম। কুড়ুল হাতে সেই চাষীটি খুব যেন ভয় পেয়েছে মনে হল। পাশের লোকদের সে বলছিল:

'যেভাবে আমার দিকে কাঠের রলাটা নেড়েছিল, ওঃ...'

এদিকে সেপাই কস্তিনের পেটে এর মধ্যেই কিছু তরল পদার্থ পড়েছে। সে সমানে চেঁচাচ্ছে:

'তাড়িয়ে দাও ওকে! নাস্তিক! কাঠগড়ায় তোলো...'

কিন্তু বেশির ভাগ লোকই চুপচাপ, একভাবে লক্ষ্য করছে শুধু রমাস্‌কে, সান্দগ্ধভাবে শুনে চলেছে ওর কথা:

'একটা বাড়ি উড়িয়ে দিতে হলে প্রচুর বারুদ চাই। হয়তো আধমণ খানেক। তোমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছ না কেন শুনি?...'

একজন বলে উঠল:

'মোড়ল কোথায়?'

'পুলিশকে খবর দাও!'

চাষীরা অনিচ্ছার সঙ্গে ধীরে ধীরে সরে পড়ল যে যার মতো ওরা নিরাশ হয়েছে বলেই মনে হল।

বাড়ির ভেতরে গেলাম আমরা। আক্সিনিয়া চা ঢালল। এর আগে কোনোদিন আমি তাকে এত প্রসন্ন আর সদয় হতে দেখিনি। রমাসের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকাতে তাকাতে সে বলল:

'আপনি কোনোদিন কোনোরকম নালিশ জানান না, তাই ওরাও যা খুশি ফান্দ খাটায় আপনার ওপর।'

আমি খখলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যা ঘটল তাতে কি আপনার একটুও রাগ হয়নি?'

'যে কোনো আজে-বাজে সামান্য ব্যাপারে রাগ করার কি আমার সময় আছে রে ভাই।'

আমি মনে মনে ভাবলাম: যদি সব মানুষই এমনি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যেতে পারত!

কিন্তু ততোক্ষণে ও বলতে আরম্ভ করেছে, যে ক-দিন বাদেই সে একবার কাজানে ঘুরে আসবে ঠিক করেছে, আর জিজ্ঞাসা করেছে কী কী বই ও আমার জন্য কাজান থেকে আনতে পারে।

একেক সময় আমার মনে হয় এ মানুষটার প্রাণ যেখানেই থাক না কেন, ওর ভেতরে ঘড়ির মতো দম দেওয়া কোনো কলকব্জা নিশ্চয়ই আছে যা ওকে সারা জীবন ধরে চালিয়ে নিয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। খখলের ওপর আমার আসক্তি আছে, ওকে খুব শ্রদ্ধাও করি, কিন্তু এ-ও চাই যে একদিন অন্তত ও রেগে উঠুক। আমার ওপর কিংবা অন্য যে-কোনো লোকের ওপর খেপে উঠে ও চেঁচাক, পা দাপাক। কিন্তু ও যে কখনো রাগের মাথায় কিছু করবে বা করতে পারে এমন

মনে হয় না। কারুর বোকামি বা বদমায়েশিতে বিরক্ত হলে ও শুধু ওর ধূসর চোখদুটো হচকে ছোট ছোট করে আনে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আর দুয়েকটা অপ্রীতিকর মন্তব্য ছাড়ে—মন্তব্যগুলো সব সময়ই হয় সহজ-সরল আর সংক্ষিপ্ত, অথচ নিষ্ঠুর।

একবার সুস্‌লভকে ও বলল:

'আচ্ছা অমন ভণ্ডামি করো কেন বলো তো? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!'

বুড়ো চাষীর ফ্যাকাশে গাল আর কপালটা আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠল। এমন কি ধবধবে সাদা দাড়িটাও যেন একটু গোলাপী হয়ে গেল গোড়ার কাছটায়।

'এতে কিন্তু মোটের ওপর কোনো লাভ হচ্ছে না তোমার। লোকের কাছে মানও খোয়াচ্ছ।'

সুস্‌লভ মাথা নিচু করে থাকে:

'তা বটে। এতে কোনো লাভ নেই।'

পরে ইজতকে ও বলেছিল:

'দেখেছ তো, এই হল নেতা! এমনি ধরনের মানুষকে যদি আমরা সরকারের কাজের জন্য পেতাম...'

...সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার করে রমাস্‌ আমায় বোঝাচ্ছিল—ও কাজানে থাকলে আমি কী ভাবে কাজ চালাব। আমার মনে হল যেন এর মধ্যেই ও সকালের সেই বিস্ফোরণের কথা, ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টার কথা একেবারে ভুলে গেছে—লোকে যেমন মশার কামড়ের কথা ভুলে যায়, তেমনি।

পান্‌কভ ঘরে এল। উনোনটা পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল:

'ভয় পেয়েছিলে?'

'কিসের?'

'এবার লড়াই শুরু হল!'

'আমাদের এখানে একটু চা খেয়ে যাও।'

'গিন্নী যে ঘরে অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'মাছ ধরছিলাম। ইজতের সঙ্গে।'

চলে গেল সে। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় চিন্তিতভাবে আবারও বলল কথাটা:

'এবার লড়াই শুরু হল।'

খখলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে বলাই পান্‌কভের দস্তুর—ভাবখানা যেন দরকারী বা জটিল যে-কোনো বিষয় নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে বহু আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে আছে রমাস্‌ যখন ইভান গ্রজ্‌নির আমলের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিল, ইজত্‌ বলল:

'বিরক্তিজনক মানুষ ছিল ওই জারটা।'

'কশাই, কশাই', জুড়ে দিল কুকুশ্‌কিন। কিন্তু পান্‌কভ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল:

'লোকটা খুব বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। বড়ো বড়ো রাজাদের খতম করেছিল বটে, কিন্তু তাদের জায়গায় একদল খুদে জমিদার সৃষ্টি করল—লাভের মধ্যে তো এই? তাছাড়া বাইরে থেকেও কিছু কিছু লোক এনেছিল—সবাই বিদেশী। এর কোনো মানে হয় না। ছোট জমিদারগুলো বরং বড়ো জমিদারদের তুলনায় বেশি পাজি। মাছ তো আর নেকড়ে

নয় যে বন্দুক দিয়ে মারবে। কিন্তু নেকড়ের চেয়েও বেশি নাকাল করে তারা।’

এক গামলা কাদা নিয়ে হাজির হল কুকুশ্কিন। উনোনের গর্তের মুখে ফের ইটগুলো সাজাতে লাগল সে। বলল:

‘গাধাগুলো কী ভেবেছে বলো তো? নিজেদের উকুন বেছে শেষ করতে পারছে না, এদিকে মানুষ খুন করার বেলায় সব উঠে পড়ে লাগা। খুব বেশি মাল কিন্তু ঘরে জমা কোরো না, আন্তোনিচ। বরং যাতায়াতটা বাড়িয়ে দাও, অল্প-অল্প করে মাল আনো। তুমি টের পাবার আগেই হয়তো দেখবে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে বসেছে ওরা। গোলমাল তো নিশ্চয়ই হবে, বিশেষ করে যখন ও বন্দোবস্তটা তোমরা পাকা করেই ফেলছ!’

‘ও বন্দোবস্তটা’ মানে ফল-চাষীদের সমবায়-সমিতি—গাঁয়ের ধনীদের যেটা পরম চক্ষুশূল। পান্‌কভ, সুস্‌লভ এবং আরো দু-তিনজন চালাক-চতুর চাষীদের সাহায্য নিয়ে এর মধ্যেই খখল সংগঠনটা প্রায় পাকাপাকি করে এনেছে। বেশির ভাগ চাষীরই এখন রমাসের দিকে সুনজর পড়েছে, দোকানের খদ্দেরের সংখ্যাও এখন বেড়ে গেছে বেশ চোখে পড়ার মতো। এমন কি বারিনভ মিগুনের মতো যারা ‘কোনো কম্মের নয়’ তারাও এসে যতোটা পারে হাত লাগাচ্ছে খখলের কাজে।

মিগুনের ওপর আমার আকর্ষণ ছিল খুব। ওর চমৎকার করুণ গান আমার অন্তরে সাড়া জাগাত। গান গাইবার সময় মিগুন চোখদুটো বুজত, ওর বিকৃত-স্নায়ু মুখের কোঁচকানো বন্ধ হয়ে যেত। ওর জীবনটাই ছিল নিশাচরের জীবন। আকাশে যখন চাঁদ নেই, পুরু পুরু মেঘের স্তূপে যখন সারা আকাশ ছেয়ে রয়েছে, তখন শুরু হত

ওর জীবনযাত্রা। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের সময় আমার কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলত:

'ভল্‌গায় বেড়াতে এসো।'

ভল্‌গার পাড়ে গিয়ে হয়তো দেখি স্টেরলেট মাছ ধরার জন্য তৈরি হচ্ছে মিগুন—বে-আইনি সাজ-সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে নিচ্ছে সে। ডিঙির পিছনকার গলুইয়ের দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসেছে, কালো জলের মধ্যে দুলছে ওর কাল্‌চেপানা বাঁকা পাদুটো। খুব চাপা গলায় সে বলে:

'জমিদার মহাজনরা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যাভার করে—বেশ তো, চুলোয় যাক্! মেনে নিলাম কোনোরকমে। হাজার হলেও তেনারা হলেন কেউকেটা লোক। তেনারা যা জানেন আমি কোনোকালেও তা জানিনে। কিন্তু—চাষীরা, যারা তোমার আমার মতোই মানুষ—তারা যখন জুলুমবাজি করে তখন কেমন করে সওয়া যায়? আমাদের ভেতর ফারাকটা কোথায় শুনি? তারা না-হয় রুব্‌ল গুণতি করে, আমি না-হয় গুণি কোপেক—ব্যস্ এই তো!'

মিগুনের মুখের পেশী ব্যথায় কোঁচ্‌কাতে থাকে, ওর জখমী ভুরু কাঁপে। চট্‌পট্ কাজ করে চলে ওর আঙুলগুলো। বড়শিগুলো সোজা করে, উকো ঘষে ডগাগুলো চোখা করে নেয়। দরাজ গলায় আস্তে আস্তে ও বলে চলে:

'আমায় ওরা চোর বলে। ঠিক কথাই। চুরি তো আমি করিই। কিন্তু আর সবাই যে ডাকাতি করে বেঁচে আছে, তার কী? একজন আরেকজনকে যতোটা পারে চুষে খাচ্ছে না? এইভাবেই তো চলেছে জীবনটা। ভগবান্ তো আর আমাদের ভালোবাসেন না, শয়তানও তাই ঝোপ বুঝে কোপ মারে।'

কালো নদী ধীরে ধীরে চলেছে আমাদের পাশ দিয়ে; কালো মেঘ গুঁড়ি মেরে চলেছে মাথার ওপর। এত অন্ধকার যে নদীর ওপার দেখতে পাই না। পারের বালির ওপর সাবধানে কল্‌কল্‌ করে গড়িয়ে আসছে ঢেউগুলো। আমার পাদুটো এমনভাবে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় ওই তটহীন, ধাবমান অন্ধকারের গর্ভে।

'মানুষকে তো বাঁচতে হবে, তাই না?' প্রশ্ন করে মিগুন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

খাড়া পাড়ের ধারে একটা কুকুর করুণভাবে আর্তনাদ করছে। আমি যেন স্বপ্নের ঝোঁকে নিজেকে প্রশ্ন করে বসি:

'মিগুনের মতো কোন মানুষকে বাঁচতে হয় যদি? কিন্তু—কেন, কী জন্যে?'

নদীর এদিকটা ভয়ানক নিস্তব্ধ, গাঢ় অন্ধকার আর কেমন যেন ভুতুড়ে। অথচ এ উষ্ণ অন্ধকারের যেন আর শেষ নেই।

'খখলকে ওরা মারবে। তোমাকেও মারবে', মিগুন বিড়্‌বিড়িয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ খুব চাপা গলায় গান গেয়ে ওঠে ও:

কতো সোহাগ করে বলেছিলে মা—
মা মণি আমার:
ওরে আমার বাছা, আমার ইয়াশা,
শান্ত জীবন যাপন করে যা···

গাইতে গাইতে ওর চোখের পাতা নেমে আসে। গলার স্বরটা আগের চেয়েও ভরা, আগের চেয়েও ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। সাজ-

সরঞ্জামের দড়ি ঠিক করতে গিয়ে এবার ওর আঙুলগুলো যেন একটু আস্তে চলে।

ঘরের পানে ফিরে এলাম কই?
অশান্ত যে রইল অশান্তই…

একটা যেন অদ্ভুত অনুভূতি জাগে আমার প্রাণে: সারা পৃথিবীটা যেন ধ্বসে যাচ্ছে আঁধার-কালো জলের ভারি ভারি ধাক্কায়, আমি যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছি, মাটির ওপর থেকে হড়কে গিয়ে ডুবে যাচ্ছি অন্ধকারের গর্ভে, সূর্য যেখানে অতলে তলিয়ে গেছে।

যেমন আচম্কা গানটা ধরেছিল তেমনি হঠাৎ মাঝখানে থেমে পড়ে মিগুন নীরবে ডাঙা থেকে ঠেলে দেয় ডিঙি, লাফিয়ে ওঠে, অদৃশ্য হয়ে যায় প্রায় নিঃশব্দে কালো অন্ধকারের বুকে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি:

'এ ধরনের মানুষগুলো বেঁচে আছে কেন?'

আমার আরেক বন্ধু বারিনভ। চালচুলোহীন, দাম্ভিক আর কড়ে। গল্পবাজ লোক, ভবঘুরে স্বভাবটা। একসময় মস্কোতে ছিল। দারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে মস্কো শহরের কথা বলে সে:

'শয়তানের খাসমহল ওই শহরটা। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা! গির্জে আছে চোদ্দ হাজার ছ-টা, আর শহরের লোকগুলো সব বাটপাড়, প্রত্যেকটা লোক! খুজ্লীওয়ালা ঘোড়ার মতো চুলকোনা আছে সক্কলের— হলপ করে বলতে পারি। সারা শহরের ব্যবসাদার, সেপাই, বাসিন্দা— প্রত্যেকে খালি চুল্কে চুল্কে বেড়াচ্ছে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা—ওদের সেই জারের কামানটা রয়েছে, সত্যিই প্রকাণ্ড সেটা। বিদ্রোহীদের

ঠাণ্ডা করবার জন্য মহামহিম সম্রাট পিওতর নিজে ওটা বানিয়েছিলেন। একজন স্ত্রীলোক ছিল—এক মহিলা, সে নাকি প্রেমের ব্যাপারে খেপে উঠে বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে। সম্রাট তার সঙ্গে সাত-সাতটি বছর সমানে কাটিয়ে শেষে তিনটে শিশুসমেত তাকে বিদেয় করে দেন। তাইতে মেজাজ গরম হয়ে সে বিদ্রোহ করে বসে। তারপর তো ভাই বুঝলে—সেই কামানখানা একবার যেই দাগলেন সম্রাট, সঙ্গে সঙ্গে ন-হাজার তিনশো আটজন লোক কুপোকাৎ! মায় সম্রাট নিজে পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ ফিলারেতকে উনি বললেন, 'না। প্রলোভনের হাত থেকে বাঁচতে হলে এই শয়তানি যন্তরটাকে বেচাল করে দিতে হবে!' তাই কামানটাকে অকেজো করেই দেওয়া হল…

যখন ওকে বলি এসবই ডাহা বাজে কথা, ও তখন চটে যায়:

'হা, ভগবান! তোমার মেজাজটা তো দেখছি ভয়ানক! অতো বড়ো এক পণ্ডিতের মুখে এসব ব্যাপার শুনলাম অথচ তুমি কিনা বলছ? …'

কিয়েভেও গিয়েছিল সে 'সাধুসন্তদের' দর্শন করতে। সে অভিজ্ঞতাটার বর্ণনা ও এইভাবে দেয়:

'শহরটা—এই অনেকটা আমাদের এই গাঁয়ের মতোই। এইরকমই খাড়া পাড়ির ধারে, নদীও আছে একটা, তবে নদীর নামটা আমার মনে পড়ছে না। ভল্গার পাশে সে নেহাৎই একটা এঁদো নালা! শহরটা হল খিচুড়ি, বুঝলে। সমস্ত রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে উঠে গেছে চড়াইয়ের দিকে। বাসিন্দারা সবাই উক্রাইনীয়। তবে মিখাইলো আন্তোনোভিচের মতো নয়। ওরা সব অন্য জাতের: আধা-পোলীয়, আধা-তাতার। কথা তো বলে না, শুধু

বকর্‌-বকর্‌ করে। ইল্লতের দল, চুল আঁচড়ায় না কখনো। খালি ব্যাঙ খায়। একেকটা ব্যাঙও সেখানে পাঁচ ছ-সেরী। বলদ দিয়ে ওরা গাড়ি টানায়, লাঙলও চষায়। চমৎকার বলদ কিন্তু ওদের—সবচেয়ে ছোটগুলোও আমাদের এখানকারগুলোর চেয়ে চারগুণ বড়ো। ওজনে একেকটা চল্লিশ মণ করে। সাতান্ন হাজার সন্ন্যাসী আর দুশো তিয়াত্তর জন আর্চবিশপ আছে সেখানে…। এখন কী বলবে চাঁদ? আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। আর তুমি—তুমি কখনো গেছ সেখানে জীবনে? যাওনি তো! তাহলে এবার? আমি ভাই খাঁটি কথার মানুষ। সেইটেই হল আসল জিনিস কিনা…'

অঙ্ক ভালোবাসে বারিনভ। আমার কাছ থেকে যোগ আর গুণ শিখে নিয়েছে। ভাগ অঙ্কটা অবশ্য ওর দু-চক্ষের বিষ। বালির ওপর ছড়ির ডগা দিয়ে লিখে লিখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গুণ করে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে। ভুল-টুলের তোয়াক্কা রাখে না একেবারেই। তারপর যখন ফলটা মেলে তখন শিশুর মতো বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে অঙ্কের লম্বা সারিটার দিকে। বলে ওঠে:

'দেখেছ ব্যাপারটা? এত বড়ো অঙ্ক মুখে-মুখেও বলতে পারবে না!'

কদাকার উস্‌কো-খুস্‌কো জর্জরিত চেহারা বারিনভের, কিন্তু ওর মুখখানা সুন্দরই বলা চলে—চক্‌চকে কোঁকড়া দাড়ি, আর শিশুর মতো হাসিতে ঝল্‌মলে ওর নীল চোখজোড়া। কুকুশ্‌কিন আর ওর মধ্যে চরিত্রের খানিকটা মিল রয়েছে। আর সম্ভবত এই মিলটুকুর জন্যই ওরা একজন আরেকজনের ছায়াও মাড়ায় না।

দুবার কাস্পীয় সাগরে গেছে বারিনভ মাছ ধরতে। কাস্পীয় সাগরের কথা বলতে গিয়ে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে:

'সমুদ্দুর, বুঝলে ভাই—এমন জিনিসটি দুনিয়ায় আর হয় না! সমুদ্দুরের কাছে মানুষ তো মশামাছির সামিল! তাকিয়ে থাক সমুদ্দুরের দিকে—দেখবে তুমি কোথায়! আর সেখানকার জীবনও বড়ো আরামের। সমুদ্দুরের ধারে সব রকমের মানুষ এসে জোটে। এমন কি একজন বড়ো পাদ্রিও ছিল। লোক খারাপ নয়! আমাদের আর সকলের মতোই গায়ে-গতরে খাটত। তারপর একজন রাঁধুনী মেয়েও ছিল—কোন্ এক উকীল সাহেবের রক্ষিতা। তাতে তার কতো খুশি হবার কথা, তাই না? কিন্তু তবু সে সমুদ্দুরের মায়া কাটিয়ে দূরে থাকতে পারেনি।—উকীল সাহেব গো, তুমি বড়ো ভালো মানুষ তা মানি, তবু কিন্তু বিদায় নিতে হচ্ছে!—কারণ একটিবার যে-লোক সমুদ্দুর দেখেছে সে আবার ফিরে আসতে চাইবেই। এত অপার জায়গা সেখানে—ঠিক আকাশের মতো—ভীড় ঠেলাঠেলি নেই। আমিও ফিরে যাব ওখানে, গিয়ে থাকব। আমার চারদিকে লোক ভিড় করে থাকবে সে আমি পছন্দ করি না—এই আমার এক মুশ্‌কিল। আমার উচিত ছিল কোনো আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যেসী হয়ে থাকা। তবে একটাও ভালো আশ্রমের খোঁজ পেলাম না…'

ঘর-ছাড়া কুকুরের মতো গাঁয়ে টহল দিয়ে বেড়াত বারিনভ। চাষীরা ঘেন্নাপিত্তি করলেও ওর গল্পগুলো কিন্তু সানন্দে শুনত, ঠিক যেমন মিগুনের গান শুনত ওরা।

'খুব চালাকি করে মিছে কথা বলে তো! মজার লোক!'

পান্‌কভের মতো অমন সন্দিগ্ধ-মনা সংসারী লোকও অনেক সময় ওর বানানো গল্প শুনে মুগ্ধ হয়। একদিন খখলকে বলছিল পান্‌কভ:

'বারিনভের মতে কেতাবে নাকি সম্রাট ইভান গ্রজ্‌নির সম্বন্ধে সব

কথা লেখা হয়নি। অনেককিছু নাকি চাপা দেয়া হয়েছে। বারিনভ বলে গ্রজ্‌নি সব সময় মানুষের বেশে থাকতেন না। মাঝে মাঝে উনি ঈগল হয়ে যেতেন। সেই জন্যেই নাকি তাঁর সম্মানে আমাদের টাকাপয়সার ওপর ঈগলের ছাপ মারা হয়।'

জীবনে কতোবার যে দেখেছি—যা-কিছু অসাধারণ, গাঁজাখুরি, যা-াকছু সরাসরি এমন কি কতকটা আনাড়িভাবে মন-গড়া—তাতেই যেন লোকের বেশি আগ্রহ, জীবনের বাস্তব সত্যের সুষ্ঠু কথা শোনার তাদের ঝোঁক কম।

কিন্তু খখলকে যখন একথাটা বললাম ও শুধু হাসল, বলল:

'ও ঠিক হয়ে যাবে। আসল কথাটা হল মানুষকে চিন্তা করতে শিখতে হবে। তখন তারা নিজেরাই নিজেদের রাস্তা ধরে এগোবে সত্যের দিকে। আর এই গল্প-বানানো মানুষ ুটো—বারিনভ আর কুকুশ্‌কিন—এদের একটু বুঝতে চেষ্টা করা উচিত আপনার। এরা হল শিল্পী, বুঝলেন তো। উদ্ভাবক। খ্রীষ্ট নিজেও বোধহয় এমনি ধারার মানুষই ছিলেন। আর একথা তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে খ্রীষ্টের কয়েকটা উদ্ভাবন নেহাৎ মন্দ ছিল না...'

একটা ব্যাপারে আমার খুব তাজ্জব লাগত—এরা সবাই ভগবান নিয়ে আলোচনা করে কতো কম, এবং করলেও কতো অনিচ্ছার সঙ্গে করে। শুধু বুড়ো সুস্‌লভই মাঝে মাঝে স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে মন্তব্য করে:

'সবই ভগবানের ইচ্ছে।'

এ কথাগুলোর ভেতর সর্বদাই একটা নৈরাশ্যের ভাব লক্ষ্য করি আমি। এদের সঙ্গে মেলামেশা করে খুবই আনন্দ পেয়েছি। সান্ধ্য আড্ডার

আলোচনায় বসে এদের কাছ থেকে শিখেছিও বিস্তর। রমাস্ যে সমস্যা-গুলোকে সামনে তুলে ধরত তার প্রত্যেকটাই যেন মনে হত প্রকাণ্ড মহীরুহের মতো, শেকড় চালিয়ে দিয়েছে জীবনের পরম সারবস্তুটির দিকে—সেখানে সেই মর্মকেন্দ্রে গিয়ে তা জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে আরেক মহীরুহের শেকড়, সে বৃক্ষও হয়তো একটু রকম বিশাল, প্রত্যেকটা শাখাই যেন সজীব ভাব-মুকুলে সমৃদ্ধ, হৃদয়গ্রাহী ভাষার সতেজ সবুজ পল্লবভারে অবনত। নানা বইয়ের অমৃতরসের আনন্দ আস্বাদ পেতে পেতে আমি এখন অনুভব করতে শুরু করেছি যে আমার নিশ্চিত উন্নতি ঘটেছে। অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমি আজকাল কথা বলি। খখল তো একাধিকবার মুখ টিপে হেসে আমার তারিফ করেছে:

'মাক্সিমিচ, আপনি কিন্তু ভালোই এগোচ্ছেন!'

এই ক'টা কথার জন্য আমি যে ওর কাছে কতো কৃতজ্ঞ!

পান্‌কভ মাঝে মাঝে তার বউকে নিয়ে আসত। নম্রমুখী ছোটখাট মানুষ, শহুরে ধরনের পোশাক পরে। নীল নীল চোখ-জোড়ায় বুদ্ধির দীপ্তি। ঘরের এক কোণে চুপ্‌টি করে বসে, প্রথমটায় সলজ্জ নীরবতায় ঠোঁটদুটো চেপে রাখে, কিন্তু একটু বাদেই মুখখানা হাঁ হয়ে যায়, লাজুক বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে যায় চোখদুটো, তারপর হয়তো কোনো তীক্ষ্ণ ধারালো টিপ্পনী শুনে লাজুকভাবে হেসে ফেলে আর হাতের আড়ালে মুখ ঢাকে। রমাসের দিকে চোখ টিপে পান্‌কভ তখন বলে:

'দেখেছ, ঠিক বুঝে নিয়েছে!'

কেউ কেউ খখলের সঙ্গে দেখা করতে আসত খুব সাবধানে। খখল তাদের নিয়ে যেত আমার চিলের ছাতের ঘরে। সেখানে ওদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত সে।

ওদের জন্য খাবার আর পানীয় দিয়ে আসত আক্সিনিয়া। সেখানেই ঘুমোত সবাই। ওরা যে আছে সে খবর আক্সিনিয়া আর আমিই রাখতাম। এদিকে আক্সিনিয়া ছিল কুকুরের মতো রমাসের অনুগত—ওকে একরকম পূজোই করত বলা চলে। রাত হলে ইজত্ আর পান্‌কভ এইসব অতিথিদের নৌকোয় করে এগিয়ে দিয়ে আসত কোনো চলন্ত স্টিমবোটে কিংবা লবীশ্‌কির ঘাটে। খাড়ির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম মোচার খোলার মতো আবছা নৌকোটা নদীর কালো অথবা জ্যোছনা-রূপোলি জল কেটে ভেসে চলেছে, নৌকোর লণ্ঠনটা দুলছে স্টিমবোটের ক্যাপ্টেনের নজর আকর্ষণ করবার জন্য। আর এ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার মনে হত আমি যেন একটা বিরাট গোপনীয় কর্মোদ্যোগের শরিক।

শহর থেকে আসত মারিয়া দেরেন্‌কভা, কিন্তু তার চোখের ভেতর সেই জিনিসটার সন্ধান আর পেলাম না যা আমায় আগে সব সময় বিব্রত করত। এখন ওর চোখজোড়া দেখলে মনে হয় নিজের চেহারাটা সুন্দর বলে জানে এমনি এক আপখুশি মেয়ের চোখ, দাড়িওয়ালা বিরাট-বপু এক পুরুষ সঙ্গী ওকে তোয়াজ করে চলেছে এই আনন্দে মশগুল একটি মেয়ের চোখ। লোকটি অন্যের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে ঠিক একইরকম একটানা সুরে কথা বলে মারিয়ার সঙ্গেও—একটু যেন বিদ্রূপের ছোঁয়া দিয়ে। কিন্তু মারিয়া কাছে থাকলে তার দাড়িতে হাত বুলোবার মাত্রা বেড়ে যায়, চোখদুটোও যেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর মারিয়ার নিজের কথা বলতে গেলে ওর বাঁশির মতো সরু গলায় যেন ফূর্তি ঝরে পড়ে। হাল্‌কা নীল পোশাক পরে মারিয়া, পাঁশুটে চুলে বাঁধে হাল্‌কা নীল ফিতে। ছেলেমানুষি হাতজোড়া ওর

অদ্ভুতরকম চঞ্চল, যেন একটা কিছু চেপে ধরবে বলে সবদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সব সময় নিজের মনেই কী একটা সুর ভাঁজে আর ছোট্ট একটা রুমাল দিয়ে উত্তেজিত লাল মুখখানার ওপর হাওয়া করতে থাকে। ওর ভেতর এমন একটা কিছু দেখতে পাই যা আমাকে নতুন এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে—অনুভূতিটা প্রতিকূলতা আর বিদ্বেষের। ওকে যতোটা কম দেখা যায় তারই চেষ্টা করি আমি।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি ইজত্ নিখোঁজ হল। লোকে বলল নিশ্চয় জলে ডুবে মারা গেছে। দু-দিন বাদে দেখা গেল এই ধারণাটাই ঠিক। নদীর প্রায় পাঁচ মাইল ভাঁটিতে ঢালু পাড়ের ওপর ভেসে উঠেছে ওর নৌকোটা। নৌকোর একটা ধারই ভেঙে গেছে, তলা ফুটো। আন্দাজ করা হল ইজত্ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর স্রোতের টানে নৌকোটা গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল গাঁয়ের প্রায় চার মাইল দূরে নোঙর-করা তিনটে বজরার ওপর।

এ ঘটনা যখন ঘটে, রমাস্ তখন কাজানে। সন্ধ্যের সময় কুকুশ্কিন এল দোকানে। গম্ভীর হয়ে একগাদা চটের বস্তার ওপর বসে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। অবশেষে সিগারেট জ্বালতে জ্বালতে সে জিজ্ঞেস করল:

'খখল কবে ফিরে আসছে?'

'বলতে পারি না।'

মুখের ওপর একখানা হাত রেখে ছড়ে-যাওয়া গালদুটো ঘষতে লাগল ও। গলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন হয় তেমনিভাবে হঠাৎ একেকবার অদ্ভুত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে ও নিচু গলায় অথচ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল।

'কী ব্যাপার?'

আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ও ঠোঁট কামড়াল। চোখদুটো লাল, চিবুকটা কাঁপছে। একটা কথাও বেরুল না ওর মুখ থেকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম আমি, বুঝতে পারছিলাম খারাপ খবর আছে। শেষ পর্যন্ত চট্ করে একবার ঘরের বাইরে তাকিয়ে ও তোৎলাতে তোৎলাতে জোর করেই বলে ফেলল কথাটা:

'নৌকো চালিয়ে ওদিকেই গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল মিগুন। ইজতের নৌকোটা দেখে এলাম। তলার ফুটোটা—কুড়ুল চালিয়ে করা হয়েছে ওটা। বুঝলে? কুড়ুল দিয়ে। ইজত্‌কে খুন করা হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই তাতে…'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে একটানা খিস্তি করে চলল কুকুশ্‌কিন, আর মাঝে মাঝে একেকবার ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল শুকনো উত্তপ্ত কান্নায়। তারপর চুপ করে গেল। ক্রুশ-প্রণাম করল অনেকবার। ওকে দেখতে এত কষ্ট হচ্ছিল যে আর সহ্য করা যায় না। সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠছে, রাগে দুঃখে যেন ফেটে পড়ছে। কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না, কারণ ও জানে না কি ভাবে কাঁদবে। আবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল সে, তারপর লাফ দিয়ে উঠেই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

পরদিন সন্ধ্যেয় একদল বাচ্চাছেলে নদীতে স্নান করতে গিয়ে ইজত্‌কে পেল। গাঁ থেকে খানিকটা উজানের দিকে একটা ভাঙা বজরা পড়েছিল—অর্ধেকটা কাঁকর-ভরা ডাঙার ওপর, অর্ধেকটা জলে, গলুইয়ের নিচে ভাঙা হালের একটা টুকরোর সঙ্গে জড়িয়ে ঝুলছিল ইজতের দীর্ঘ দেহটা, মাটির দিকে মুখখানা ফিরিয়ে। মাথার খুলিটা ফাটা, ফাঁকা—জলে ঘিলু ধুয়ে গেছে। পেছন থেকে কুড়ুলের ঘা মারা হয়েছিল,

তাই মাথার পেছন দিকটা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। স্রোতের টানে ইজতের দেহটা নড়ছে, এমনভাবে ডাঙার দিকে পাদুটো ঠেলে উঠছে আর হাতজোড়া দুলছে যে মনে হয় বুঝি জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ও।

প্রায় জনা-কুড়ি কিংবা তারও বেশি চাষী জড়ো হয়েছে নদীর ধারে। সবাই গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। এরা হল গাঁয়ের যারা অপেক্ষাকৃত ধনী। গরীব চাষীরা খামারের কাজ সেরে এখনও ফেরোনি। মোড়ল ধড়ীবাজ আর ভীতু ধরনের লোক। হাতের ছড়ি নাচিয়ে তিনি খুব মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছেন। অনবরত খালি বাতাস শুঁকছেন আর গোলাপী কোর্তার হাতায় মুছছেন নাকটা। গাঁট্টাগোঁট্টা দোকানদার কুজমিন পাদুটো অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা তার ঠেলে বেরিয়ে আছে। সে কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখছে একবার আমাকে, একবার কুকুশ্‌কিনকে। ভুরুজোড়া ভয়ঙ্কর কুঁচকে আছে লোকটার, কিন্তু বর্ণহীন চোখদুটো ছল্‌ছল্‌ করছে আর বসন্তের দাগওয়ালা মুখটাও যেন মনে হল একটু ম্রিয়মাণ আর উদভ্রান্ত।

মোড়ল সাহেবের পা জোড়া ধনুকের মতো। নদীর পাড়ে ব্যস্তসমস্তভাবে পায়চারি করছেন আর খালি ঘ্যানঘ্যান্‌ করছেন। 'ওঃ, কাজটা খুব খারাপ হয়েছে তো দেখছি! জঘন্য ব্যাপার!'

নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর বসেছিল মোড়ল সাহেবের ছেলের বউ—মোটাসোটা মানুষ। নদীর জলের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে আর কাঁপা কাঁপা হাতে ক্রুশ-প্রণাম করছে। ঠোঁটদুটো কাঁপছে, নিচের পুরু আর লাল ঠোঁটটা বিশ্রীরকম ঝুলে পড়েছে, অনেকটা কুকুরের

মতো, আর ভেড়ীর মতো কুৎসিত হলদে হলদে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। নদীর ঢালু পাড় বেয়ে ছেলেপিলের দল নেমে এল হোঁচট খেতে খেতে। হুড়মুড় করে ছুটে এল মেয়েরা — ওদের দেখাচ্ছিল ঠিক জ্বলজ্বলে রঙের ছোপের মতো। তারপর খেতখামার থেকে চাষীরা আসতে লাগল তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে। সর্বাঙ্গ ওদের ধুলোয় ঢাকা। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা মৃদু সচকিত গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল:

'একটা আপদ ছিল লোকটা।'

'কেন?'

'ওই কুকুশ্‌কিনটা — ও একটা আপদই বটে…'

'লোকটা শুধু শুধু খুন হয়ে গেল…'

'ইজত্‌ কখনো কারুর ক্ষতি করেনি…'

'কখনো কারুর ক্ষতি করেনি?' মারমুখী হয়ে জনতার ভিড়ের দিকে ফিরে কুকুশ্‌কিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্ষতি করেনি, তাহলে ওকে খুন করলে কেন তোমরা? অ্যাঁ? কেন ওকে মারলে, বেজন্মার দল? অ্যাঁ?'

হঠাৎ একজন মেয়েমানুষ উন্মাদের মতো চিৎকার করে হেসে উঠল। তার সে পাগল-হাসি যেন চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল চাষীদের ভিড়ের ওপর। ওরা একজন আরেকজনের দিকে ফিরে চিৎকার, গালাগাল, তর্জন শুরু করে দিল। দোকানদারের দিকে ছুটে গিয়ে কুকুশ্‌কিন তার বসন্তের দাগ-ভরা গালটার ওপর সশব্দে একটা ঘুষি মেরে বসল।

'এই নে, জানোয়ার!'

ঘুষিয়েই রাস্তা সাফ করে নিল কুকুশ্‌কিন — ধাক্কাধাক্কি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে একটু যেন ফুর্তির সঙ্গেই চিৎকার করে আমায় বলল:

'বেরিয়ে এস। লড়াই শুরু হবে এখুনি।'

একজন ওকে এর মধ্যেই মেরে বসেছিল। ঠোঁট কেটে গেছে, থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ছে। ওর মুখখানা কিন্তু খুশিতে ঝল্‌মল করছে…

'কুজমিনকে কেমন একখানা দিলাম দেখলে তো!'

বারিনভ ছুটে এল আমাদের দিকে। পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে সে দেখছিল ভিড়টাকে। সেটা এখন জড়ো হয়েছে বজরাটার পাশে। গোলমালের ওপর ছাপিয়ে উঠেছে মোড়ল সাহেবের সরু ক্যান্‌কেনে গলা:

'বেশ তো, তাহলে প্রমাণ দাও না। কী জিনিস আমি চেপে যাবার চেষ্টা করছি? প্রমাণ করো।'

ঢালু পাড় বেয়ে উঠবার সময় বারিনভ বিড়বিড়িয়ে বলল, 'এ জায়গা ছেড়ে এখন সরে পড়াই ভালো।'

সন্ধ্যের হাওয়াটা যেমন গুমোট তেমনি অস্বস্তিকর—গরমে নিশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিল। নীলচে ঘন মেঘের ভেতর টকটকে লাল সূর্যটা ডুবছে। আমাদের আশেপাশের ঝোপঝাড়গুলোর পাতার ওপর সূর্যাস্তের লাল আভা এসে পড়েছে। কোথায় যেন গুরু-গুরু মেঘের ডাক শোনা গেল।

চোখের সামনে তখনো যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ইজতের মৃতদেহটা দুলছে, জলের সঙ্গে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, আর স্রোতের টানে শূন্য খুলির ওপর ওর চুলের গোছাটা যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে পড়ছে ইজতের নিচু গলায় বলা সুন্দর কথাগুলো:

'সকলের ভেতরেই শিশুর মতো গুণ কিছু আছে। আর ঠিক ওই জায়গাটা থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে—মানুষের অন্তরে যে শিশুটি আছে সেইখান থেকে। এই ধরো না খখলের কথাই—মনে হবে লোকটা লোহা দিয়ে তৈরি। অথচ ওর মনটা কিন্তু কোলের শিশুর মতো।'

আমার পাশে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল কুকুশ্‌কিন। রুক্ষ গলায় সে বলল:

'এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটা লোককে সরাবে ওরা…। ওপর থেকে ঈশ্বর দেখুন—কি মূখ্যুর কাজ এরা করেছে!'

এসব ঘটনার তিন-চারদিন বাদে খখল ফিরে এল। অনেক রাত করে এসেছে। কী একটা কারণে যেন ভীষণ খুশি দেখাচ্ছে ওকে। সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি স্নেহের সুর ওর গলায়। ওকে ঘরের ভেতর আনতেই আমার পিঠ চাপড়ে বলল:

'আপনি ঘুমোচ্ছেন কম, মাক্সিমিচ।'

'ইজত খুন হয়েছে।'

'কী-ই?'

ওর চোয়ালের পেশী-গ্রন্থিগুলো মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। এমনভাবে দাড়িটা কেঁপে ওঠে মনে হয় যেন ওর বুকের ওপর দিয়ে একটা ঢেউ খেলে গেল। টুপি খুলতে ভুলে গিয়েছিল। কামরার মাঝখানে থেমে পড়ে সজোরে মাথাটা ঝাঁকায় সে। চোখদুটো আধ-বোজা করে থাকে।

'এই ব্যাপার! কারা করল কাজটা জানা যায়নি তো? হ্যাঁ, তা তো হবেই।'

ধীরে ধীরে জানলার কাছে গিয়ে ও বসে। পাদুটো ক্লান্তভাবে মেলে দেয় সামনের দিকে।

'বরাবর ওকে সাবধান করেছি…। কর্তাদের কেউ ছিল নাকি আশপাশে?'

'হ্যাঁ। কাল এসেছিল। এলাকার বড় দারোগা।'

'ও, তা হল কী পরিণামে?' প্রশ্ন করে ও নিজেই জবাবটা জুড়ে দেয়, 'কিছুই না, জানা কথা।'

বললাম, 'থানার দারোগা এসে কুজমিনের বাড়িতে উঠেছিল, বরাবরই যা করে। তারপর কুকুশ্‌কিনকে হাজত-বাসের হুকুম দিয়ে গেছে দোকানদারকে মেরেছিল বলে।'

'ও। তা এর ওপর আর কথা বলবে কে বল?'

সামোভার গরম করবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম আমি।

চা খেতে খেতে রমাস্‌ বলল:

'কী ভাবে যে এই লোকগুলো সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে ভালো মানুষগুলোকে খুন করে—সত্যিই বড়ো করুণ ব্যাপারটা। দেখলে মনে হয় যেন—মানুষ যতো সৎ হবে এরাও তাকে ততো ভয় করবে। এদের কাছে সৎ লোকের কোনো দাম নেই—পথের কাঁটার মতো যেন। আমার মনে আছে ওরা যখন আমায় সাইবেরিয়ায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এক কয়েদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওর মুখেই শুনেছিলাম যে ও একজন চোর। সবশুদ্ধু পাঁচজন ছিল, এক সঙ্গে কাজ করত—রীতিমতো দঙ্গল একটা। তা, একদিন নাকি এদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করেছিল—এসো ভাই, এসব ছেড়ে দিই। লাভটাই বা কী হচ্ছে আমাদের? আমাদের জীবনযাত্রা ভালো নয় কি? এই কথা বলেছিল বলে ওরা তাকে মাতাল আর ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে মারে। গল্পটা বলার পর এই কয়েদীটি কিন্তু ওরই হাতে খুন-হওয়া সেই লোকটির দারুণ তারিফ করতে লাগল। বলল—ওর পরে আরও তিন জনকে সাবাড় করেছি। মনে একটু আপশোসও হয় না। কিন্তু আমাদের সেই বন্ধুটির কথা ভাবলে এখনো বড়ো কষ্ট হয়। বন্ধু হিসাবেও বড়ো চমৎকার ছিল সে। যেমন চালাক,

ফূর্তিবাজ, তেমনি দিল-খোলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে মেরেছিলে কেন? ধরিয়ে দেবে বলে ভয় পেয়েছিলে?" এ কথায় কিন্তু সত্যিসত্যি চটে গেল লোকটা। বলল, "আমাদের বন্ধু? কখ্খনো ধরিয়ে দিত না, কোনো কারণেই না, হাজার টাকা দিলেও না। তবে, হ্যাঁ—দলের ভেতর ওকে নিয়ে আমাদের কেমন যেন আর সুবিধে মনে হচ্ছিল না। আমরা হলাম একদল পাপী, আর ও যেন ঋষি প্রকৃতির মানুষ। ঠিক যেন খাপ খাচ্ছিল না ব্যাপারটা।"'

উঠে দাঁড়িয়ে খখল ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল। দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেছে পাইপটা, হাতদুটো পেছনে—পায়ের গোড়ালি অবধি ঝুলওয়ালা তাতারদেশী জোব্বা পরেছে, প্রকাণ্ড এক সাদা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে ওকে। মেঝের ওপর ওর খালি পাদুটো থপ্ থপ্ করে ভোঁতা আওয়াজ তুলছে। চিন্তিতভাবে নিচু গলায় ও বলে চলল:

'জীবনে অনেকবার এই ব্যাপারটা দেখলাম—ঋষি মানুষদের সম্পর্কে এমনি ধরনের ভয়, এমনিভাবে সেরা-সেরা মানুষগুলোকে শেষ করে দেয়া। ঋষি মানুষের সঙ্গে লোকের ব্যবহার হল দু-ধরনের: যখন আর কোনো রকমেই টোপ গেলাতে পারবে না, তখন হয় তারা যেন-তেন-প্রকারেণ তাকে হটাবে, আর নয়তো তার প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা চাউনি অন্ধের মতো অনুসরণ করবে, কুকুরের মতো তার সামনে বুকে হেঁটে যাবে অবশ্য কালেভদ্রে। কিন্তু তার কাছ থেকে শেখা বা তার জীবনযাত্রাকে অনুকরণ করা—এ সবের তারা ধার ধারে না। কী ভাবে সেটা করবে

তাই তাদের জানা নেই। কিংবা হয়তো সেরকম ইচ্ছেই তাদের নেই, কি বল?'

টেবিল থেকে চায়ের গেলাসটা তুলে নিল খখল। চাটা এর মধ্যে জুড়িয়ে গেছে। ও বলে চলল:

'সেটা অবশ্য খুবই সম্ভব। তা ছাড়া আপনি যদি ভেবে দেখেন, দেখবেন: এখানে তো মানুষ প্রাণপণ খেটেখুটে যা হোক একটা জীবন গড়ে তুলেছে নিজেদের জন্য। এতেই তারা অভ্যস্ত। এখন ধরুন এদের ভেতর একটিমাত্র প্রাণী হয়তো বিদ্রোহ করল, বলল এদের জীবনটা যেভাবে চলেছে সেটা ঠিক নয়। ঠিক নয় মানে? আমাদের যা কিছু সেরা জিনিস তাই দিয়েই তো গড়েছি এই জীবনটা। চুলোয় যাও তুমি! তারা তখন আঘাত হানে সেই শিক্ষক, সেই ঋষি মানুষদের ওপর। মর তবে! আমাদের জ্বালিও না! কিন্তু তবু—যারা বলে—তোমাদের পথটা ঠিক নয়—সত্য তো তাদেরই পক্ষে। তাদেরই দিকে রয়েছে সত্য। তাই জীবন যদি আরো মহত্তর লক্ষ্যের দিকে এগিয়েই থাকে, তা এগিয়েছে এদেরই চেষ্টায়।'

বইয়ের তাকগুলো দেখিয়ে ও ফের বলল:

'বিশেষ করে এদেরই চেষ্টায়। আমি যদি একটা বই লিখতে পারতাম। আমার যে হাতই আসে না। আমার চিন্তা কিন্তু বড়ো বেশি ভারাক্রান্ত আর এলোমেলো।'

টেবিলের পাশে বসে হাতের ভেতর মাথা গুঁজে রইল খখল।

'ইজত্‌কে হারিয়ে আমাদের যে কী ক্ষতিই হল…'

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল:

'তাহলে, এবার শুয়ে পড়তে হয়, কি বল।'

চিলেকোঠায় গিয়ে আমি জানলার পাশে বসলাম। খেত-মাঠের ওপারে গরমকালের বিজলি চমকাচ্ছে, আকাশের অর্ধেকটায় ছড়িয়ে পড়ছে তার আভা, স্বচ্ছ লালচে আলো যতোবার চম্‌কে উঠছে চাঁদটাও যেন ততোবার ভয় পেয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। বিষণ্ণ এই ঐকতানটা যদি না থাকত তাহলে বোধহয় মনে হত এক মরুদ্বীপে বসে আছি। বহুদূরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। জানলার ভেতর দিয়ে সবেগে গুমোট গরম ঠেলে আসছে।

আমার মনে পড়ল ইজতের কথা। ওকে যেন দেখতে পাচ্ছি নদীর পাড়ে ওসিয়ার ঝোপের নিচে। ওর নীল মুখখানা আকাশের দিকে ফেরানো হলেও কাঁচের মতো ঝক্‌ঝকে চোখগুলোর কঠিন দৃষ্টি অন্তর্মুখী। সোনালী দাড়িতে জট ধরেছে, মুখখানা যেন সবিস্ময়ে হাঁ করে আছে।

'মাক্সিমিচ, আসল জিনিসটা হল দয়া, সৌহার্দ! এইজন্যই তো ঈস্টার পরবটাকে আমি এত ভালবাসি: ঈস্টার হল সব পরবের সেরা—সবচেয়ে বেশী সৌহার্দপূর্ণ পরব।'

অপরাহ্ন-সূর্যের খরতাপে ইজতের নীল পাজামা শুকিয়ে গেছে। ভল্‌গার জলে পরিষ্কার ধোয়া ওর নীল পাজোড়ার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে পাজামাটা। মুখের ওপর মাছি লেগে আছে, ভন্‌ভন্‌ করছে, আর ওর লাশ থেকে ভ্যাপসা, গা-গুলোনো দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

সিঁড়িতে শোনা গেল ভারি পায়ের আওয়াজ। রমাস্‌ ঢুকল। নিচু দরজাটার ভেতর দিয়ে আসতে গিয়ে মাথাটা নিচু করল সে। আমার খাটে বসে হাত দিয়ে নিজের দাড়িটা চেপে ধরল।

‘একটা কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম: আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি…’

‘মেয়েমানুষের পক্ষে জীবনটা ততো স্বচ্ছন্দ হবে না এখানে…’

একাগ্রভাবে ও আমায় লক্ষ্য করতে লাগল, যেন জানতে চাচ্ছে এরপর আমি আরো কী মন্তব্য করি। কিন্তু আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। বিজলির ঝল্‌কানি এসে একটা ভুতুড়ে আলোয় ভরে তুলল কামরাটা।

‘মাশা দেরেনকভাকে বিয়ে করব আমি…’

হাসিটা আর চাপতে পারলাম না। আগে কোনোদিন মনেও হয়নি যে এই মেয়েটিকে কেউ মাশা বলে ডাকতে পারে। মজার ব্যাপার! যতোদূর জানি ওকে ওর বাপ কিংবা ভাইরাও কোনোদিন মাশা নামে ডাকেনি।

‘মিটমিটিয়ে হাসছেন যে?’

‘কিছু না।’

‘ওর পক্ষে আমি বেশি বুড়ো হয়ে যাব মনে হচ্ছে?’

‘না, না।’

‘ও আমায় বলেছে আপনি নাকি ওর প্রেমে পড়েছিলেন।’

‘সেটা হয়তো সত্যি কথাই।’

‘আর এখন? কাটিয়ে উঠেছেন তো?’

‘হ্যাঁ মনে হয় সব চুকে গেছে।’

দাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চাপা গলায় ও বলল:

‘আপনার বয়েসে এসব খেয়াল তো বিচিত্র নয়। তবে আমার এ বয়েসে নিছক কল্পনা নয় এ জিনিস। মনপ্রাণ যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আর অন্যকিছু ভাবার অবসর থাকে না।’

তারপর একবার কাষ্ঠ-হাসি হাসতেই ওর সুন্দর দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠে। ও বলে চলে:

'আক্‌ৎসিয়াম যুদ্ধে অক্‌টেভিয়াসের কাছে হেরে গেল এণ্টনি, তার কারণ সে নিজের নৌবহর ছেড়ে সেনাপতির কর্তব্যে অবহেলা করে নিজের জাহাজ নিয়ে ছুটেছিল ক্লিওপেট্রার পেছনে—ক্লিওপেট্রা তখন ভয়ে জাহাজ নিয়ে পালাচ্ছিল। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ প্রেমে পড়লে মানুষের কী হতে পারে!'

উঠে দাঁড়িয়ে, কাঁধটা পেছনের দিকে মুড়িয়ে ও ফের বলল—যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজটা করতে যাচ্ছে এমনিভাবে:

'যাক্ এখন—বিয়ে তো করতেই চলেছি!'

'কবে?'

'সামনের হেমন্তে। আপেলের ব্যাপারটা যখন মিটে যাবে।'

দরজার কাছে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ও—যতোটা নিচু করা দরকার তার চেয়েও একটু যেন বেশি। বিছানায় শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, হেমন্তের সময় এখান থেকে চলে যাওয়াটাই আমার পক্ষে সবচাইতে ভালো হবে। এণ্টনির সম্পর্কে ওসব কথা কেন বলল ও? আমার ভালো লাগল না ব্যাপারটা।

মরশুমের প্রথম আপেল তোলার সময় আসে। ফসল ফলেছে অপর্যাপ্ত, গাছের ডালগুলো প্রায় মাটি ছোঁয় আর কি! ফলবাগিচায় একটা ঝাঁঝালো সুবাস ছড়িয়ে আছে—ছেলেপিলের দল সেখানে হৈ-হল্লা করে গোলাপী, হলদে পাড়া আর পোকা-ধরা ফলগুলো জড়ো করছে।

আগস্টের গোড়ার দিকে কাজান থেকে ফিরে এল রমাস্। সঙ্গে নিয়ে এল এক নৌকো সওদা। আরেক নৌকোয় বোঝাই খালি ঝুড়ি। হপ্তাদিনের সকাল। প্রায় আটটা বাজে। খখল সবে স্নান সেরে কাপড়জামা বদলে চা খেতে বসেছে। বেশ ফূর্তির সঙ্গেই বলছে:

'রাত্রে নদীতে এত আরাম লাগে যে কী বলব...'

এমন সময় হঠাৎ বাতাস শুঁকতে শুঁকতে কথার মাঝখানেই ও অস্বস্তিভরে জিজ্ঞেস করল:

'একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন না?'

ঠিক সেই সময় আক্সিনিয়াও উঠোন থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল:

'আগুন!'

ছুটে বের হলাম বাইরে। চালাঘরে আগুন লেগেছে—যেদিকটা শব্জিবাগানের সামনে পড়ে সেই দিকটাতে। এই চালাটার ভেতরেই আমাদের কেরোসিন, আলকাতরা আর তেলের গোটা ভাঁড়ার। একমুহূর্ত আমরা হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম—দেখলাম কী গভীর তৎপরতার সঙ্গে আগুনের লেলিহান হলদে জিভ দেয়ালটাকে গ্রাস করে ছাদের দিকে উঠছে, কড়া রোদের ভেতর আগুনের শিখাগুলোকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এক বালতি জল আনল আক্সিনিয়া। জলটা আগুনের দিকে ছুঁড়ে দিল খখল, তারপর বালতি ফেলে দিয়ে বলে উঠল:

কোনো ফল হবে না এতে। মাক্সিমিচ, পিপেগুলো বের করে আনবেন। আক্সিনিয়া, তুমি দোকানে যাও তো।'

চট্‌পট্ একটা আলকাতরার পিপে টেনে বের করে আনলাম চালাঘর থেকে। উঠোনের ভেতর দিয়ে সেটাকে টেনে এনে ফেললাম

রাস্তায়। তারপরে ধরলাম একটা কেরোসিনের পিপে, কিন্তু যখন সেটাকে গড়িয়ে বের করতে গিয়েছি দেখি ছিপিটা নেই, কেরোসিন গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর। ছিপি কোথায় গেল তাই দেখছি, এদিকে আগুনও তখন চুপচাপ বসে নেই। আগুনের শিখা সন্ধানী আঙুলের মতো তক্তার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ঠেলে আসছে। ছাদটা মট্‌মট্‌ করে উঠল, আমার কানের ভেতর বাজতে লাগল একটা সর্ব্যঙ্গ গুঞ্জন। আধা-খালি পিপেটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি গাঁয়ের সবদিক থেকে ছুটে আসছে মানুষ—মেয়ে, শিশু চেঁচাচ্ছে, আর্তনাদ করছে। খখল আর আক্সিনিয়া দোকান থেকে মালপত্র বের করে খানাটায় নামিয়ে দিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল আগাগোড়া কালো পোশাক-পরা ধূসর চুলওয়ালা একটি বুড়ি। হাতের মুঠি নাড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ সরু গলায় চেঁচাচ্ছিল:

'আ-রে হতভাগা শয়তানের দল…'

চালাঘরে ফিরে আসতেই দেখি ঘন ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা, ভেতরে কী যেন পট্‌পট্‌ করছে, গুরগুরিয়ে উঠছে। চাল থেকে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে সিঁদুর-রঙা ফিতেগুলো, একটা জ্বলন্ত খাঁচার কাঠামো ছাড়া দেওয়ালটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধোঁয়ায় দম আটকে যাচ্ছিল, চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থায় কোনো রকমে একটা পিপে গড়িয়ে নিয়ে এলাম দরজা অবধি। কিন্তু দরজার মুখে পিপেটা আটকে গেল, আর নড়ানো যায় না। ছাদ থেকে আগুনের ফুল্‌কি ঝরে পড়ছে আমার গায়ে, মুখ হাত সব জ্বলে যাচ্ছে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করি। খখল ছুটে আসে, আমাকে টেনে নিয়ে যায় উঠোনে।

'পালান! এখুনি ফেটে পড়বে! …'

ও ছুটে যায় বাড়ির ভেতর। আমিও পেছন পেছন দৌড়োই। হুড়মুড় করে ঢুকি চিলেকোঠার ভেতর, সেখানে আমার অনেক বই ছিল! জানলা দিয়ে বইগুলো বাইরে ছুঁড়ে দিতে নজরে পড়ে একটা টুপির ঝুড়ি। একই রাস্তায় ওটাকেও পাচার করার চেষ্টা করি। কিন্তু জানলাটা বড়ো সরু। একটা আট-সেরী বাটখারা তুলে নিয়ে জানলার চৌকাঠটা ভাঙতে চেষ্টা করি। তারপরেই—বুম্ করে একটা ভোঁতা আওয়াজ। কী যেন সশব্দে ছল্‌কে পড়ে ছাদের ওপর। আমি বুঝলাম, কেরোসিনের পিপেটা ফেটেছে। ছাদে আগুন ধরে যায়, একটা অলক্ষুণে আওয়াজ ওঠে পট্‌পট্ করে। আমার ঘরের জানলার ভেতর দিয়ে লক্‌লক্ করে এগিয়ে আসে একটা লাল শিখা, ঘরের ভেতরটায় উঁকি দিয়ে যায়। তাপটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সিঁড়ির দিকে ছুটে যাই, কিন্তু আমার দিকে ছুটে আসে ঘন ধোঁয়ার মেঘ, সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপে কিলবিল করে ওঠে লাল সাপগুলো। নিচের দরজার মুখে একটা মট্‌মট্ শব্দ ওঠে, যেন লোহার দাঁত দিয়ে কাঠ চিবানো হচ্ছে। আমার মাথা ঘুলিয়ে যায়। ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে আমার দম আটকে আসতে থাকে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি—ক'মুহূর্ত জানি না, মনে হয় যেন কতো যুগ! লাল দাড়িওয়ালা হলদে-সবুজ একখানা মুখ যেন সিঁড়ির ওপরের জানলাটার ভেতর দিয়ে একটা অদ্ভুত ভেংচি কেটে সরে গেল। পর মুহূর্তে আগুনের রক্ত-লাল কয়েকটা শিখা ছাদের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে ঢুকল ভেতরে।

মনে পড়ছে, আমার যেন তখন মনে হচ্ছিল মাথার চুলগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে, ও ছাড়া আর কোনো আওয়াজ আমার কানে আসছিল না। আমি আকুল হয়ে ভাবছিলাম এই বুঝি আমার শেষ।

সীসের মতো ভারি হয়ে গেছে পাজোড়া। যন্ত্রণায় চোখদুটো জ্বলে যাচ্ছে; তবু চেষ্টা করছি দু-হাতে সে-দুটোকে আগলে রাখতে।

কিন্তু আত্মরক্ষার সহজাত সর্বজ্ঞ প্রবৃত্তি আমাকে শিখিয়ে দিল বাঁচবার একমাত্র সম্ভাব্য উপায়টা। হাতের কাছে নরম জিনিস যা কিছু পেলাম—তোষক, বালিশ, একগাদা গাছের বাকল—সব জড়িয়ে নিলাম দু-হাতের মধ্যে, মাথা ঘাড়ের ওপর কোনোরকমে চাপিয়ে নিলাম রমাসের ভেড়ার চামড়ার কোটটা, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম জানলা দিয়ে।

যখন চোখ খুললাম, দেখি খানাটার এক কিনারায় পড়ে আছি; রমাস্‌ আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচাচ্ছে:

'ঠিক আছেন তো?'

উঠে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমাদের বাড়িটার দিকে—ধ্বসে পড়ছে। টকটকে লাল আগুনের ফিতেগুলো উড়ছে গোটা বাড়িটা ঘিরে, সামনের কালো মাটি চেটে-চেটে খাচ্ছে সিঁদুর-রঙের কুকুর-জিভ। জানলার ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ছাদের ওপর দুলছে বেড়ে-ওঠা আগুনের হলদে ফুল।

'কী? ঠিক আছেন তো?' আবার চেঁচাল খখল। ওর ঝুলকালি-মাখা মুখে দরদর করে ঘাম ঝরছে, মনে হচ্ছে যেন কান্না হয়ে ঝরে পড়ছে নোংরা জল। উদ্বেগে চোখের পাতা কাঁপছে। দাড়িতে এক-আধ-টুকরো বাকল জড়িয়ে গেছে। একটা বিপুল, প্রাণময় আনন্দের জোয়ার যেন আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল—একটা সতেজ ভাবাবেগ যেন আচ্ছন্ন করল আমাকে। এতক্ষণে টের পেলাম আমার বাঁ পায়ে একটা ফোস্কা ধরার মতো যন্ত্রণা। মাটিতে বসে পড়ে খখলকে বললাম:

'পায়ের গিঁট ভেঙে গেছে!'

আমার হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে হঠাৎ ও প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিল একটা। দারুণ যন্ত্রণায় সারা শরীরটা মুচড়ে উঠল। তারপরেই কয়েক মিনিট বাদে ফের লেগে গেলাম উদ্ধার-করা জিনিসগুলো আমাদের স্নানঘরে টেনে নিয়ে যাবার কাজে। একটু একটু খোঁড়াচ্ছিলাম বটে তবে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল তখন। খোশমেজাজের সঙ্গে রমাস্ দাঁতে পাইপ চেপে বলতে লাগল:

'যখন পিপে ফেটে ছাদের ওপর কেরোসিন গিয়ে পড়ল আমি তো ভেবেছিলাম আপনাকে আর ফিরে পাব না। ঠিক একটা থামের মতো সাঙ্ঘাতিক উঁচুতে ছিটকে উঠেছিল আগুনটা। তারপর মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতার মতো হয়ে গেল আর গোটা বাড়িটায় একসঙ্গে আগুন ধরে গেল। আমি তো এদিকে ভাবলাম— এবার বিদায়, মাক্সিমিচ!'

আগের মতোই আবার শান্ত হয়ে গেল খখল, ধীরে সুস্থে সাজিয়ে রাখতে লাগল উদ্ধার-করা জিনিসপত্র। একটু বাদে আক্সিনিয়াকে বলল:

'দাঁড়িয়ে এই জিনিসগুলো পাহারা দাও। আমি ওদিকে গিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করি…'

আক্সিনিয়ার চেহারাটাও ওরই মতো ঝুলকালি-মাখা, উস্‌কো-খুস্‌কো। খানার ওধারে ধোঁয়ার মধ্যে উড়ছে সাদা টুকরো-টুকরো কাগজ। রমাস্ বলল, 'এঃ, বইগুলো গেল! কী দুঃখের কথা! আমার এত আদরের বইগুলো…'

চারটে বাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছে এর মধ্যে। বাতাসের জোর ছিল না তাই পুড়তে সময় নিচ্ছে: ধীরে সুস্থে ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে

পড়ছে আগুন। সর্পিল শুঁড়গুলো যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই এগিয়ে গিয়ে ধরছে ছাদ, ধরছে কঞ্চির বেড়াগুলো। জ্বলন্ত চিরুণী দিয়ে শুকনো চালের খড়গুলোকে যেন কেউ আঁচড়াচ্ছে; বেড়ার ওপরে নিচে আঁকাবাঁকা আগুনে আঙুলগুলো ওঠানামা করছে, বাজনার তারের মতো নাড়ছে বুনোট-করা বেড়ার ফেঁকড়িগুলো। ধোঁয়ায় ভরা বাতাসের ভেতর আগুনের শিখার গুন্‌গুনানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—ভয়ঙ্কর, দাঁতখিঁচোনো বিদ্বেষে ভরা সে গুঞ্জন—আর সেই সঙ্গে চড়চড় করে ফাটছে জ্বলন্ত কাঠ, অনেকটা মৃদু আর প্রায় কোমলভাবে। ধোঁয়ার মেঘ থেকে সোনালী ফুল্‌কি ঝরে পড়ল রাস্তায়, উঠোনে। পাগলের মতো দৌড়োচ্ছে লোকগুলো, সবাই যার যার বাড়ি আর সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত; আর একটানা করুণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে:

'জ-অ-অ-ল!'

জল অনেক দূরে—খাড়ির নিচে, ভল্‌গায়। রমাস্‌ তাড়াতাড়ি গাঁয়ের লোকদের একজায়গায় জড়ো করল, কাউকে জামার হাতা ধরে, কাউকে কলার ধরে টেনে। দুটো দলে তাদের ভাগ করে একেকটা দলকে আগুনের একেকটা পাশে পাঠিয়ে দিল বেড়া আর বার-দালানগুলো টেনে নামাবার জন্য। সুবোধ ছেলের মতো রমাসের হুকুম তামিল করল ওরা। এবার শুরু হল আগুনের বিরুদ্ধে আগের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমানের মতো লড়াই—আগুন তখন নির্ভয় তৎপরতার সঙ্গে গোটা রাস্তাটার পর পর সমস্ত বাড়িগুলোকেই গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এমনভাবে রয়ে সয়ে লড়তে লাগল ওরা যেন এটা ওদের নিজেদের ব্যাপার নয়, মনে হল যেন লড়াইয়ে জিতবে তেমন আশা ওদের নেই।

আমার কিন্তু তখন দারুণ খোশমেজাজ! মনে হচ্ছিল এর আগে জীবনে কখনো নিজেকে এত শক্তিমান ভাবিনি। রাস্তার শেষ মাথায় দেখলাম একটা ছোট জটলা। ওরা গাঁয়ের পয়সাওয়ালা লোক। কুজমিন আর মোড়লকেই ওদের ভেতর বেশি করে নজরে পড়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা চেঁচাচ্ছে, হাত নাড়ছে, লাঠি দোলাচ্ছে; নিষ্ক্রিয় দর্শক, আগুন নেভাবার সামান্য চেষ্টাও ওদের নেই। মাঠ থেকে ঘোড়ায় চেপে আসছিল চাষী-মানুষ—ঘোড়ার লাফিয়ে চলার তালে তালে কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকছিল ওদের কনুইগুলো। মেয়েরা সমানে আর্তনাদ করছে। ছেলেছোকরারা এদিক-ওদিক ছুটছে।

আরেক বাড়ির উঠোনে বার-দালানে আগুন লেগেছে। ছিটে বেড়ার তৈরি মোটা বেতি-লাগানো গোয়ালঘরের দেয়ালটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ধ্বসিয়ে দেওয়া দরকার। এর মধ্যেই আগুনের টকটকে লাল ফিতে জড়িয়ে ধরেছিল সেটাকে। চাষীরা কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগল বেড়ার খুঁটিগুলো, কিন্তু ওদের মাথার ওপর আগুনের ফুলকি আর জ্বলন্ত কয়লা ঝরতে শুরু করেছে! জামার যে-জায়গাগুলো পুড়তে আরম্ভ করেছিল সেগুলো রগড়াতে রগড়াতে ওরা লাফিয়ে হঠে গেল।

খখল চেঁচিয়ে উঠল, 'ভীতুর মতো পালিয়ে যেও না!'

কোনো ফল হল না তাতে। কার যেন একটা টুপি কেড়ে খখল সেটা আমার মাথায় বসিয়ে দিল:

'আপনি ওপাশটায় যান। আমি এদিকটা দেখছি!'

একটা খুঁটি কুপিয়ে নামিয়ে দিলাম। তারপর আরেকটা। বেড়াটা দুলতে লাগল। আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে চড়ে বেড়ার ওপরটা আঁকড়ে ধরলাম দু-হাতে। খখল আমার পা ধরে টানতে লাগল—হুড়মুড়

করে নেমে এল গোটা বেড়াটা; নিচে প্রায় সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেলাম আমি। চাষীরা তাড়াতাড়ি বেড়াটা টেনে নিয়ে চলল রাস্তার দিকে।

রমাস্ জিজ্ঞেস করল, 'হাত পা পুড়িয়েছেন নাকি?'

আমার জন্য ওর উৎকণ্ঠা দেখে নতুন শক্তি আর উৎসাহ পাই। আমার কাছে মানুষটির দাম অনেক, তাই ওকে সব রকমে খুশি করতে চাই আমি। পাগলের মতো খাটতে শুরু করলাম, আমায় ও তারিফ করবে সেই আমার পরম আগ্রহ। তখনো আমাদের বইয়ের পাতাগুলো ধোঁয়ার মেঘের ভেতরে উড়ছিল ঠিক পায়রার মতো।

ডান দিকে আগুনটাকে দমানো গেছে, বাঁ দিকে কিন্তু আগুনের শিখা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। দশটা বাড়ি এর মধ্যেই ধরেছে। ডান দিকে যাতে লাল সাপগুলো নতুন কোনো খেলা দেখাতে না পারে তাই কয়েকজনকে সেদিকে রেখে রমাস্ ওর বাদবাকি লোকজনকে নিয়ে এগিয়ে গেল বিপদের একেবারে ঘাঁটিতে। পয়সাওয়ালা চাষীদের সেই দলটার কাছ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় শুনলাম, ওদের একজন শয়তানি করে চেঁচাচ্ছে:

'আগুন লাগিয়েছে!'

কুজমিন বলল:

'ওর স্নানঘরটা—ওখানে একবার খুঁজে দেখলে হয়!'

কথাটা আমার মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করতে থাকল।

উত্তেজনা, বিশেষ করে আনন্দের উত্তেজনা শরীরে শক্তি জুগিয়ে থাকে—এ সকলেরই জানা। প্রচণ্ড উল্লাসে আমি সমানে খেটে চললাম, কোনোরকম অবসাদই টের পেলাম না যতোক্ষণ-না শেষ পর্যন্ত একেবারে কাহিল হয়ে পড়ি। শুধু মনে আছে—কী একটা গরম জিনিসে

পিঠ ঠেকিয়ে মাটিতে বসে ছিলাম, আর রমাস্ আমার ওপর বালতির জল ঢালছিল। আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে চাষীরা বলাবলি করছিল তারিফের সুরে:

'ছোকরার শক্তি আছে!'

'হাল ছাড়বার পাত্র নয়!...'

রমাসের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে; আমার ভিজে চুলগুলো পেছন দিকে টেনে সমান করে দিতে দিতে রমাস্ বলল:

'এখন একটু জিরোন। অনেক খেটেছেন।'

কুকুশ্‌কিন আর বারিনভ—দুজনেই কয়লা-বরদারদের মতো কালো ভূত সেজেছে। ওরা আমায় খানাটার দিকে নিয়ে চলল সান্ত্বনা দিতে দিতে:

'ঠিক আছে ভাই! সব সেরে গেছে।'

'একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, এই যা।'

শুয়ে শুয়ে নিজেকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখি জনা-দশেক 'পয়সাওয়ালা চাষী' খানাটার ভেতর নেমে আসছে—আমাদেরই স্নানঘরের দিকে। মোড়ল হল ওদের সর্দার। তার পেছন-পেছন আসছে দুজন চৌকিদার—রমাসের দু-হাত ধরে তাকে টেনে আনছে ওরা। রমাসের মাথায় টুপি নেই। ওর ভিজে জামাটার একটা হাতা ছেঁড়া। দাঁতে চেপে রেখেছে পাইপটা, মুখখানা ভয়ানক, ভ্রূকুটি-ভরা। ছড়ি দুলিয়ে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিল কোস্তিন সেপাই:

'আগুনে ছুঁড়ে দাও ও বেটাকে! কাফের!'

'স্নানঘরটা খোলো!...'

'ভাঙো তালা। চাবি তো খোয়া গেছে।' রমাস্ বলল সজোরে।

লাফিয়ে উঠে আমি মাটি থেকে একখানা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম রমাসের পাশে। চৌকিদাররা সরে দাঁড়াল। ভয়ে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল মোড়ল:

'খ্রীষ্টান ভাইসব! তালা ভাঙা ঠিক নয়—কাজটা বে-আইনি হবে।'

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কুজমিন চেঁচাল:

'ওই আরেকটি! জানতে চাই ও কে।'

রমাস্ আমাকে বলল, 'একটু ঠাণ্ডা হন, মাক্সিমিচ, এরা ভেবেছে সব মালপত্র আমি স্নানঘরে সরিয়ে নিজেই দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি।'

'তোরা দুজনেই এ কাজ করেছিস।'

'ভাঙো তালা।'

'খ্রীষ্টান ভাই…'

'আমরা জবাব দেব, তুমি না।'

'জবাবদিহি আমরাই করব।'

রমাস্ ফিস্‌ফিসিয়ে বলল:

'পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ান, পেছন থেকে তাহলে মারতে পারবে না ওরা।'

তালাটা ভাঙল ওরা। স্নানঘরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল অনেকে, তারপর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এল আবার। এই ফাঁকে রমাসের হাতে আমার লাঠিটা গুঁজে দিয়ে নিজে আরেকটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলাম।

'ভেতরে তো কিছু নেই…'

'কিচ্ছু না?'

'আরে, হতভাগা শয়তানের দল!'

কে একজন গাঁইগুঁই করল:

'আমাদেরই ভুল হয়েছে...'

জবাবে অনেকগুলো গলা চেঁচিয়ে উঠল মাতালের মতো হন্যে হয়ে:

'ভুল মানে? কী বলছ!'

'আগুনে ছুঁড়ে দাও বেটাদের।'

'ঝামেলা-বাজ...'

'ভারি সমবায়-সমিতি বানিয়েছ!'

'জোচ্চোর! সব ক'টা জোচ্চোর।'

'আস্তে!' চেঁচামেচির ওপরে নিজের গলা তুলে রমাস্ বলল, 'তোমরা তো নিজের চোখেই দেখলে—স্নানঘরে কিচ্ছু নেই। আর কী চাও শুনি? সবই তো পুড়ে গেছে। যা কিছু বাঁচাতে পেরেছি তা এই এখানে জমা করা আছে। তোমরা ইচ্ছে করলে দেখতে পার। নিজের জিনিস পুড়িয়ে আমার কী লাভ হবে বলতে পার?'

'বীমার টাকা!'

আবার গোটা-দশেক গলা ভয়ানক চেঁচাতে লাগল:

'কিসের জন্য চুপ করে আছি আমরা?'

'অনেক সয়েছি...'

আমার হাঁটুদুটো কেঁপে উঠল, মুহূর্তের জন্য মনে হল সব অন্ধকার। একটা লালচে কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখলাম একসারি বুনো চেহারা, মুখের গোঁপদাড়ি-ভরা গর্তগুলো চিৎকার করতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেছে। নিজেকে আর রুখতে পারছিলাম না—রাগের চোটে মনে হচ্ছিল এখুনি কয়েক ঘা বসিয়ে দিই। আমাদের ঘিরে ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে লাগল আর নতুন একটা চিৎকার জুড়ে দিল:

'ওরে! বেটাদের হাতে লাঠি আছে!'

'লাঠি?!'

খখল বলল, 'মনে হচ্ছে আমার দাড়িটা উপড়ে নেবে।' গলার স্বরে বুঝলাম ও হাসছে। 'আপনিও এর ভাগ পাবেন মাক্সিমিচ, হায়। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন, বে-সামাল হবেন না।'

'ওই দেখ! ছোকরাটার হাতে আবার একটা কুড়ুল!'

সত্যিই একটা কাঠ-মিস্ত্রির কুড়ুল বাঁধা ছিল আমার বেল্টে। ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা।

রমাস্ ফিস্ফিসিয়ে বলল, 'ভয় পাচ্ছে মনে হচ্ছে। তবে সত্যিই যদি কিছু আরম্ভ করে তাহলে কুড়ুলটা ব্যবহার না করাই ভালো…'

আমার অচেনা একজন চাষী—ছোটখাটো পুঁচ্কে চেহারা, খোঁড়া মানুষ—হাস্যকরভাবে নেচে কুঁদে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল:

'নাগালের বাইরে থেকে ঢিল মারো! বুঝিয়ে দাও বেটাদের কতো ধানে কতো চাল!'

এবড়োখেবড়ো একটুকরো ইট তুলে নিয়ে লোকটা সজোরে ছুঁড়ে মারল আমার পেটে। কিন্তু এ মারটার জবাব দেবার আগেই ওপর থেকে হঠাৎ ওর কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুশ্কিন। জড়াজড়ি করে দুজনেই গড়িয়ে পড়ল খানাটার নিচে। তারপর বারিনভ, কামার এবং আরো দশ-বারোজন চাষীকে সঙ্গে নিয়ে পান্কভ ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সসম্মানে পেছু হঠল কুজমিন:

'মিখাইলো আন্তোনোভিচ্, তুমি তো বুদ্ধিশুদ্ধি রাখো। তুমি বুঝতে পারবে। আগুন লাগলে চাষীদের যে মাথার ঠিক থাকে না।'

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে পকেটে গুঁজে রমাস্ আমায় বলল,

'নদীর ধারে চলে আসুন, মাক্সিমিচ, সরাইখানায়।' হাতের লাঠিটাকে ছড়ি বানিয়ে রমাস্ ভারি পায়ে উঠতে লাগল খানার উঁচু কিনারায়। কুজমিন ওর পাশে পাশে গিয়ে কী যেন বলছিল। ওর দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়েও দেখল না রমাস্। শুধু বলল:

'গাধা! ভাগো এখান থেকে।'

যেখানে আমাদের বাড়িটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে এখন দেখলাম একগাদা পোড়াকাঠ সোনালী হয়ে ধিকি ধিকি জ্বলছে, আর সেই কাঠগুলোর ভেতর অক্ষত রয়েছে রান্নাঘরের চুল্লীটা, একটা হাল্কা নীল ধোঁয়া চিম্নি দিয়ে উঠে গরম বাতাসে মিশে যাচ্ছে। লোহার খাটের তপ্ত লাল দাঁড়গুলো মাকড়সার পায়ের মতো চারদিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। কালো কালো প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ফটকের পোড়া খুঁটিগুলো যেন তাকিয়ে রয়েছে গোটা দৃশ্যটার দিকে—খুঁটিগুলোর একটার মাথায় আবার জ্বলন্ত কাঠের লাল টুপি, মোরগের পালকের মতো শিখা দিয়ে সাজানো।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খখল বলে, 'বইগুলো সব গেল! কী দুঃখের কথা।'

ছেলেছোকরার দল বড় ধোঁয়া-ওঠা কাঠের অবশিষ্টগুলো লাঠি দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে শূয়োর ছানার মতো—উঠোন থেকে কাদা-ভরা রাস্তায়। কাদায় পড়ে ওগুলো হিসিয়ে উঠে নিভে যায় ঝাঁঝালো সাদাটে ধোঁয়া ছেড়ে। পাঁচ বছর বয়েসের একটি নীল-চোখো কটা-চুলো মানবক গরম কালো কাদাজলের একটা নালার মধ্যে বসেছিল। তোবড়ানো একটা বালতির ওপর একটুকরো কাঠ দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে ছেলেটা কান পেতে শুনছিল ধাতব সঙ্গীত। আগুনে যাদের ক্ষতি হয়েছে তারা বিষণ্ণভাবে নিজেদের ঘরের জিনিসপত্রের অবশিষ্ট

কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পোড়া আবর্জনা নিয়ে কেঁদে-কেঁদে ঝগড়াঝাঁটি আর শাপমন্যি শুরু করেছে মেয়েরা। ফলবাগিচার গাছগুলো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনের তাপ লেগে এখানে-ওখানে পাতা লালচে হয়ে গেছে তাই থরে-থরে গোলাপী আপেলের প্রাচুর্য এখন আরো পরিষ্কার নজরে পড়ছে।

নদীতে নেমে স্নান সেরে আমরা পাশের সরাইখানাটায় চুপচাপ বসে চা খেতে থাকি।

'যাই হোক, আপেলের ব্যাপারে কিন্তু পেটমোটার দল হেরে গেছে', অবশেষে বলে রমাস্।

পান্কভ আসে। চিন্তিত আর স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি নম্র মনে হচ্ছে ওকে।

খখল জিজ্ঞেস করে, 'কি, কেমন মনে হচ্ছে?'

পান্কভ কাঁধ উঁচু করে।

'বাড়িটা বীমা করা ছিল।'

সবাই চুপচাপ। অপরিচিতের মতো বসে আমরা এ ওর চোখ চেয়ে মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করি।

'এখন কি করবে ভেবেছ, মিখাইলো আন্তোনিচ?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'এখানে থাকা আর চলবে না তোমার।'

'দেখি কি করা যায়।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে', বলে পান্কভ, 'একটু বাইরে কোথাও এস, কথাবার্তাটা হয়ে যাক।'

ওরা দুজন বেরিয়ে যায়। দরজার গোড়ায় থেমে পড়ে পান্কভ আমার দিকে ফিরে তাকায়, বলে:

'ওহে খোকা—তোমার তো বেশ সাহস আছে। তুমি এখানেই থেকে যাও না। লোকে তোমাকে ভয় করবে…'

আমিও সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসে নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়-গুলোর নিচে শুয়ে পড়ি। তাকিয়ে থাকি জলের দিকে।

সূর্য পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়ছে। অথচ তবু গরম। এ গাঁয়ে যে দিনগুলো কাটিয়েছি তার পরিপূর্ণ স্মৃতি ভেসে উঠতে থাকে চোখের সামনে—নদীর বিস্তৃত পটে তেল-রঙে-আঁকা ছবির মতো। মনটা ভারি হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু বাদেই অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

'এই ওঠো!' ঘুমের ঘোরে একটা ক্ষীণ ডাক শুনতে পাই। মনে হয় কে যেন আমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, চেষ্টা করছে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে, 'মরে গেলে নাকি? ওঠো, ওঠো!'

নদীর ওপারে ঘাস-ভরা ময়দানের ওপর চাঁদটা ঝুলে পড়েছে—রক্তের মতো লাল, গাড়ির চাকার মতো প্রকাণ্ড। আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বারিনভ আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল।

'চলে এস। খখল তোমার খোঁজ করছে। বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

আমার পেছন-পেছন এসে ও বিড়বিড় করে বলে:

'এটা কিন্তু তোমার পক্ষে উচিত নয়—যেখানে শুলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লে। ধরো যদি কেউ খাড়ির ওপর উঠতে গিয়ে হোঁচট খেত আর একখানা পাথর নেমে আসত তোমার ওপর? কিংবা ইচ্ছে করেও তো কেউ ও কাজ করতে পারত? আমাদের এখানকার লোক মাঝ-পথে থামতে জানে না। ওরা ভাই মনের ভেতর রাগ পুষে রাখে। কারণ মনে রাখার মতো এদের আর আছেই বা কী?'

কে যেন ঝোপের ভেতর আস্তে আস্তে নড়াচড়া করছিল। দেখলাম ডালগুলো দুলছে।

'পেলে ওকে?' মিগুনের দরাজ গলার আওয়াজ।

'হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে', বারিনভ জবাব দেয়।

নীরবে খানিকটা এগিয়ে যাই আমরা। বারিনভ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে:

'আবার চলেছে মাছ চুরি করতে। মিগুনের কাছেও বেঁচে থাকাটা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়।'

যখন সরাইখানায় এলাম রমাস্ আমায় কড়া ধমক লাগাল।

'অতো অসাবধান হলেন কেমন করে? মার খাবার জন্য গা স্বুড়স্বুড় করছে না?'

বারিনভ চলে যাবার পর গম্ভীরভাবে নরম গলায় ও আবার বলল:

'পান্‌কভ আপনাকে সঙ্গে রাখতে চাইছে। একটা দোকান খোলার ইচ্ছে আছে ওর। ওর প্রস্তাবে রাজি হন সে উপদেশ আমি দেব না। এখন আমার নিজের ব্যাপার হল—আমার কাছে যা কিছু ছিল সবই তো ওকে বেচে দিলাম। এখন রওনা হচ্ছি ভিয়াৎকায়। একটু গুছিয়ে বসেই আপনাকে ডেকে পাঠাব। সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে কাজে নামবেন আপনি। রাজী?'

'ভেবে দেখব।'

'বেশ।'

মেঝেতে সটান শুয়ে রমাস্ একবার কি দু-বার একটু আড়মোড়া দিল, তারপর পড়ে থাকল নিশ্চল হয়ে। জানলার ধারে বসে আমি ভল্‌গার দিকে তাকিয়েছিলাম। জলের বুকে চাঁদের প্রতিবিম্ব ঠিক অগ্নি-

কাণ্ডের আভার মতো দেখাচ্ছে। অনেক দূরের পাড় ঘেঁষে একটা টাগ্‌বোট চলে গেল সজোরে প্যাডেলের ঝপ্‌ঝপ্‌ আওয়াজ তুলে। মাস্তলের ডগার তিনটে লণ্ঠন রাতের অন্ধকারে তারাগুলোকে ঘেঁষে, কখনো-বা আড়ালে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

ঘুম-ঘুম গলায় রমাস্‌ বলল, 'চাষীদের ওপর বুঝি খুব রাগ হচ্ছে? রাগ করবেন না। ওরা বোকা-শোকা মানুষ, এই যা। বিদ্বেষ জিনিসটা বোকামিরই একটা রকমের মাত্র।'

এ সব কথায় আমার সান্ত্বনা নেই—আমার মনের তিক্ততা, আঘাতের তীব্র জ্বালা এসব কথায় উপশম হবার নয়। আবার যেন দেখতে পেলাম সেই লোমশ জানোয়ারসুলভ মুখগুলো শয়তানি আর্তনাদে বিকৃত হয়ে উঠেছে:

'নাগালের বাইরে থেকে ওদের ঢিল মারো।'

যে জিনিসটা ভুলে যাওয়াই ভাল, মন থেকে তা মুছে ফেলতে আমি তখনো পর্যন্ত শিখিনি। অবশ্য এটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে এই মানুষগুলোকে যদি আলাদা-আলাদা করে ধরা যায় তাহলে এদের কেউই খুব বেশি হিংসুটে স্বভাবের নয়। কেউ কেউ তো একেবারেই নয়। আসলে এরা সবাই ভালো মানুষ জানোয়ার। এদের যে-কোনো একজনের মুখে শিশুর মতো হাসি ফুটিয়ে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, যে-কোনো লোকই শিশুসুলভ বিশ্বাস নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবে জ্ঞান আর সুখের অন্বেষণে মানুষের অভিযানের কাহিনী, মহানুভবতার আর মহান্‌ কীর্তির উপাখ্যান। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দেয় এমন সব কিছুই এদের অদ্ভুত মনের মণি-কোঠায়

সযত্নে রক্ষিত, সে সহজিয়া জীবনে নাকি নিজের খুশি-মাফিক চলাটাই হল একমাত্র আইন।

কিন্তু এই মানুষগুলোই যখন জড়ো হয় কোনো মেটে রঙের জটলায়— গ্রামের পঞ্চায়েত কিংবা নদীর ধারের সরাইখানাটায়—তখন এদের সব ভালো গুণই যায় তলিয়ে; এরা তখন পাদ্রি-পুরুতের মতো মিথ্যা আর ভণ্ডামির পোশাক পরে সামনে এসে দাঁড়ায় আর গাঁয়ের ভেতর যাদের জোর বেশি তাদের প্রতি দেখায় কুকুরের মতো হীন আনুগত্য। এ রকম সময় এদের দেখলে মানুষের ঘৃণা না জন্মে পারে না। অনেক সময় আবার তিক্ত বিদ্বেষের জ্বালায় এরা হঠাৎ হন্যে হয়ে ওঠে। নেকড়ের মতো রোঁয়া খাড়া করে, দাঁত বের করে এরা তখন একজন আরেকজনের দিকে খেঁকাতে থাকে হিংস্রভাবে, যে-কোনো সামান্য বিষয় নিয়ে হাতাহাতির জোগাড় করে—সত্যি সত্যি হাতাহাতিও করে। এই সময়গুলোতে এরা বড়ো ভয়ানক হয়ে ওঠে—এমন কি যে-গির্জায় হয়তো আগের সন্ধ্যাটিতেও খোঁয়াড়ে-ঢোকা ভেড়ার মতো নম্র বিনীতভাবে সমবেত হয়েছিল সেই গির্জাকেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে কসুর করে না। গাঁয়ের এই মানুষগুলোর মধ্যে কবি আছে, ভালো গল্প-বলিয়েও আছে। কিন্তু তাদের ভাগে কোনো খাতির জোটে না - তারা হল অপাংক্তেয়, অবহেলিত, গাঁয়ের লোকের হাসির খোরাক।

এদের ভেতর থাকা আমার কোনোরকমেই পোষাত না। পেরে উঠতাম না আমি। তাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার দিন আমি রমাস্‌কে আমার মনের সমস্ত তিক্ত অনুভূতির কথাই খুলে বললাম।

ও ধমকানি দিয়ে বলল, ‘বড়ো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন।

'তা বটে, কিন্তু—এই ধারণা যদি আমার হয়েই থাকে তো কী করা যাবে?'

'সিদ্ধান্তটা ভুল। একেবারেই ভিত্তিহীন।'

অনেকক্ষণ ধরে সহৃদয় ধৈর্যের সঙ্গে ও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে আমি ভুল করেছি, আমার ধারণাগুলো ভ্রান্ত।

'অতো চট্ করে মানুষকে নিন্দা করে বসবেন না। নিন্দাটা তো সবচেয়ে সহজ রাস্তা। সে রাস্তায় অন্ধের মতো না চলাই ঠিক। সহজে মন খারাপ করবেন না, শুধু মনে রাখবেন: সবকিছুই বদলায়। সবকিছুই ভালোর দিকে যায়। ধীরে ধীরে? হঁ্যা—ধীরে ধীরে, কিন্তু চিরদিনের মতো। নিজের চোখে সবকিছু দেখতে চেষ্টা করবেন, নিজের হাতে সবকিছু বুঝতে চেষ্টা করবেন। কোনোকিছুকেই ভয় করবেন না। তবে—চট্ করে যেন মানুষকে নিন্দাও করে বসবেন না। চলি তাহলে, বন্ধুটি আমার—পরে আবার একদিন দেখা হবে।'

পনের বছর পরে ফের আমাদের দেখা হয়েছিল—সেদ্‌লেৎসে। আর একবার দশ বছর রমাস্‌কে ইয়াকুৎস্‌ক্ অঞ্চলে নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল 'নারোদ্‌নইয়ে প্রাভো' দলের কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ।

ক্রাস্‌নোভিদোভো গ্রাম ছেড়ে রমাস্ চলে যাবার পর আবার মনটা ভারি খারাপ গেল। মনিবহারা কুকুরের বাচ্চার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম গাঁয়ের ভেতর। বারিনভের সঙ্গে মিলে ধনী-চাষীদের ঠিকে মজুর হয়ে গ্রাম এলাকায় টহল দিতে লাগলাম—ফসল মাড়াই করে, আলু তুলে, ফলবাগান সাফ করে। বারিনভের স্নানঘরে থাকতাম আমি।

একদিন বর্ষার রাতে ও আমায় বলল, 'আলেক্সেই মাক্সিমিচ, বড়ো একলা বোধ করছ! আচ্ছা, কাল দুজনে মিলে সমুদ্দুরের দিকে

পাড়ি দিলে হয় না? অ্যাঁ? কিসে ঠেকাবে, বলো? এখানকার কেউ তো আমাদের মতো মানুষ পছন্দও করে না। তারপর মদ-টদ খেয়ে কবে কী করে বসবে তাও তো বলা দুষ্কর…’

এ প্রস্তাব বারিনভ আগেও তুলেছে। ওরও মন মেজাজ খুব খারাপ। বনমানুষের মতো লম্বা হাত দু-খানা আল্‌গা করে দু-পাশে ঝুলিয়ে ও খালি হতাশভাবে এদিক-ওদিক চায়—বনের ভেতর পথ-হারানো মানুষের মতো।

জানলায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। খানার একপাশ দিয়ে সবেগে নেমে আসছে জলের ধারা, স্নানঘরের একটা কোণ তোড়ের মুখে ধ্বসে যেতে শুরু করেছে। গ্রীষ্মের শেষ ঝড়ের ফ্যাকাশে বিজ্‌লি আকাশের বুকে হাল্‌কা ঝিলিক্‌ দিয়ে যাচ্ছে। বারিনভ আবার নিচু গলায় বলল:

‘রওনা হবো নাকি? কাল?’

রওনা হলাম আমরা।

… শরতের রাতে ভল্‌গার জলে ভেসে যাওয়া—সে যে কী আনন্দের তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বজরার পাছ্‌-গলুইয়ে মাঝির কাছে বসেছিলাম আমি। লোকটা-মাথাওয়ালা একটা লোমশ দানব বিশেষ। হাল ঘোরাবার সময় পাটাতনে ভারি ভারি পা ফেলে দানবটা বিড়বিড় করে উঠছিল:

‘উ-উ-উপ্‌ … ও-র্‌র্‌-উ …’

ডাঙা দেখা যায় না—জল আলকাতরার মতো আঠালো—বজরার দু-পাশে আল্‌তো ছলাৎ ছলাৎ করে এগিয়ে চলেছে রেশমের ফিতের মতো। নদীর ওপর ঝুলে আছে শরতের কালো মেঘ। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। নদীর দুপাড় যেন মুছে দিয়েছে সে

অন্ধকার। সারা পৃথিবীটা গলে মিশে গিয়েছে ধোঁয়া আর জলের মধ্যে—বয়ে চলেছে অন্তহীন অব্যাহতভাবে পাতালের কোনো নিঃঝুম শূন্যতার রাজ্যে যেখানে সূর্য নেই, নেই চাঁদ, নেই তারা।

সামনে ভিজে অন্ধকারের মধ্যে একটা অদৃশ্য টাগ্‌বোট ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে জল ছিটিয়ে যাচ্ছিল, যেন প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা করছে সামনের দিকের নাছোড়বান্দা টান। বোটের গতিটা টের পাওয়া যাচ্ছে তার তিনটে আলো দেখে—দুটো আলো জলের ঠিক ওপরেই, তৃতীয় আলোটা অনেক উঁচুতে। মেঘের নিচে দেখা যাচ্ছে সোনালী মাছের মতো চারটে আলো দুলছে—অনেকটা কাছাকাছি। এর একটা আলো আমাদেরই বজরার মাস্তুলের ওপরকার লণ্ঠনটা।

মনে হচ্ছিল যেন একটা ঠাণ্ডা তেল-বুদ্বুদের ভেতর আটকা পড়েছি। ঢালু সমতল বেয়ে ধীরে ধীরে বুদ্বুদটা গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, আর আমিও সঙ্গে-সঙ্গে নেমে যাচ্ছি সেই বুদ্বুদের ভেতর বন্দী একটা মাছির মতো। আমার মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত গতি ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসছে, তারপর এক সময় সেই মুহূর্তটা আসবে যখন একেবারেই সব নিশ্চল হয়ে যাবে। টানাবোটের ঘড়ঘড়ানি বন্ধ হবে, চট্‌চটে আঠালো জলে প্যাডেলের আছড়ানি থামবে। সমস্ত শব্দ মিলিয়ে যাবে গাছের ঝরা পাতার মতো—মুছে যাবে খড়িমাটির লেখার মতো। নিথর নীরবতার রাজকীয় আলিঙ্গনে আমি তখন আচ্ছন্ন হয়ে যাব।

আর হালের কাছে পায়চারি করছে ওই যে প্রকাণ্ড লোকটা ছেঁড়া ভেড়া-চামড়ার কোট আর লোমশ টুপি পরে—ও লোকটাও থামবে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে চিরদিনের মতো। আর কখনো বিড়বিড় করে উঠবে না, 'অর্‌র্‌-উপ্‌। ও-উ-র্‌র্‌!' বলে।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম:

'তোমার নাম কী?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার?' ভোঁতা গলায় জবাব দিল ও।

লোকটা ভালুকের মতো থপ্থপে ধরনের। আগের সন্ধ্যায় কাজান ছেড়ে আসবার সময় অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় ওর মুখখানা দেখেছিলাম। ঘন গোঁফদাড়িভরা চোখহীন একটা মাংসপিণ্ড যেন। হালের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঠের মগে এক বোতল ভদ্কা ঢেলে জলের মতো দুঢোকে খেয়ে ফেলল, তারপর একটা আপেলও চালিয়ে দিল ভদ্কার পিছু পিছু। বজরাটা যেই নড়ে উঠে চলতে শুরু করল সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা হাল ধরে একবার লাল থালার মতো সূর্যটার দিকে তাকিয়ে নিয়েই মাথা পেছনে হেলিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল:

'ভগবান্ মঙ্গল করুন!'

নিঝ্নি-নোভ্গরদের মেলা থেকে টানাবোটে বাঁধা হয়ে আস্ত্রাখানের দিকে চলেছে পর পর চারটে বজরা। আমাদেরটা হল ওরই মধ্যে একখানা। সওদা চলেছে পারস্যে—লোহার চাদর, চিনির পিপে, আর ভারি ভারি একধরনের বাক্স। বাক্সগুলো বুটের ডগা দিয়ে ঠুকে বারিনভ একবার শুঁকল সেগুলো, তারপর কী যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল:

'বন্দুক আছে নিশ্চয়। ইঝেভ্স্ক্ কারখানা থেকে আসছে...'

বারিনভের পাঁজরায় গুঁতো মেরে মাঝি ধমক লাগাল:

'তা দিয়ে তোমার দরকার কি হে?'

'এই ভাবছিলাম আর কি...'

'মেরে বদন বিগড়ে দেব নাকি?'

যাত্রীবাহী বোটের ভাড়া দিতে পারিনি বলে আমাদের 'দয়া করে' বজরায় স্থান দেয়া হয়েছিল; বজরার বাদবাকি লোকদের সঙ্গে আমরাও অবশ্য 'পাহারাদারি' করেছি খালাসীদের মতো, কিন্তু তবু সবাই আমাদের কাঙ্গালীই ভাবত।

বারিনভ বলে, 'তুমি তো এদিকে খুব জনগণের কথা বল। জীবনটা হল সিধেসিধি ব্যাপার। যদি ওপরে রইলে তো মাথায় চড়লে। আর তা যদি না হল তো তোমারই মাথায় আর কেউ চড়ে বসল।'

রাত এত অন্ধকার যে লণ্ঠনগুলো দিয়ে আলোকিত বজরাগুলোর মাস্তুলের ডগা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম। ডগার পেছনে ধোঁয়ার মেঘ। ধোঁয়ায় তেলের গন্ধ।

মাঝিটার গোমড়া চুপচাপ ভাব দেখে ক্রমেই আমার মেজাজ খিঁচড়ে উঠছিল। সারেঙ্গের হুকুমে হালের কাছে গেলাম এই জানোয়ারটার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা জন্য আর দরকারমতো তাকে সাহায্য করার জন্য। বজরা বাঁক নেবার সময় সামনের আলোগুলো যখনই দুলে ওঠে, লোকটা তখনই নিচু গলায় বলে:

'এই! ধরো তো!'

লাফিয়ে গিয়ে আমিও ওর সঙ্গে হালে হাত লাগাই।

ও বিড়বিড় করে ওঠে, 'ব্যস্, হয়েছে।'

আবার পাটাতনে ফিরে এসে বসি। যতোবারই চেষ্টা করি ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে, প্রত্যেকবারই ওর সেই একঘেয়ে পাল্টা প্রশ্নে ঘায়েল হয়ে যাই:

'তা দিয়ে তোমার দরকার?'

কী নিয়ে সারাক্ষণ এত ভাবে ও? কামা নদীর হলদে জল যেখানে ভল্‌গার ইস্পাত-ফিতের সঙ্গে এসে মিলেছে সেই জায়গাটা পেরিয়ে যেতেই ও উত্তরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বলে:

'ইতর।'

'কে?'

কোনো জবাব নেই।

রাতের সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে বহুদূরে কোথায় যেন অনেকগুলো কুকুর আর্তনাদ করে ডেকে ওঠে—অন্ধকারে পিষ্ট না হয়ে জীবনের জীর্ণাবশেষটুকু যে এখনো বেঁচে রয়েছে তারই জানান দিচ্ছে ওরা। মনে হচ্ছিল যেন ওদের দূরত্বটা দুর্লংঘ্য, আর ওরাও অবাঞ্ছিত।

মাঝি হঠাৎ বলে ওঠে:

'যতোরাজ্যের ওঁচা কুত্তা এসে জুটেছে এখানে…'

'এখানে—মানে? কোথায়?'

'সব জায়গায়। আর যেখান থেকে আমরা এসেছি সেখানে দেখতে পেতে কুত্তার মতো কুত্তা…'

'তুমি কোথা থেকে?'

'ভোলগদা থেকে।'

এবার বেরিয়ে আসতে থাকে কথা, বস্তা ছিঁড়লে আলু যেমন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে তেমনি। সাদামাটা ভারি ভারি কথা:

'তোমার সঙ্গের ও লোকটা কে? খুড়ো? যদ্দূর বুঝতে পারছি ওটা একটা গাধা। আমার কিন্তু একজন খুড়ো আছে—বেজায় চালাক। ধূর্ত। খুড়োটির পয়সাও আছে অনেক। নৌকোঘাটের মালিক। সিম্‌বির্স্কে ব্যবসা। আর একটা সরাইখানাও আছে।'

কথাগুলো খুব আস্তে আস্তে বলে, যেন কষ্ট হচ্ছে বলতে। তারপর আবার চুপ করে তাকিয়ে থাকে, সামনে দ্যাখে টানাবোটের মাস্তুলের লণ্ঠনবাতিটা সোনালী মাকড়সার মতো অন্ধকারের জালের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। ওর চোখদুটো দেখতে পাই না আমি।

'হাল ধরো···। পড়তে তুমি? বলতে পারো আইনগুলো কে লেখে?'

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই বলে চলে একটানা:

'লোকে তো নানা রকম কথা বলে। কেউ বলে জার। কেউ বলে প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ, কিংবা সেনেট। যদি ঠিকমতো জানতুম কে ওসব লেখে, তাহলে সোজা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতুম। তাকে বলতুম: এমনই আইন আপনি বানিয়েছেন যে ইচ্ছেমতো কাউকে কিছু করার উপায় নেই—হাতটি পর্যন্ত তুলতে পারিনে। আইন হবে লোহার মতো। তালা চাবির মতো। আমার বুকে তালা দিয়ে চলে যান, ব্যস্! তাহলে অন্তত নিজের কাছে একটা জবাবদিহি থাকে, বুঝতে পারি নিজের অবস্থাটা। কিন্তু এভাবে জবাবদিহি করতে পারি না! কিচ্ছুতেই পারি না।'

এবার ও নিজের মনেই বিড়বিড় করতে থাকে—ক্রমেই স্বরটা আরো নিচে নামায়, হালের ওপর হাতের মুঠোর ঘুষি পড়ার তালে তালে আরো বেশি অসংলগ্ন হয়ে আসে ওর কথাগুলো।

টানাবোট থেকে কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলে একটা চোঙার ভেতর দিয়ে। মানুষের ভোঁতা গলার আওয়াজ কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়—কুকুরগুলোর চিৎকার আর আর্তনাদ তখন যেমন শোনাচ্ছিল ঠিক তেমনি; এখন সে আওয়াজ রাতের ঘন অন্ধকারের জঠরে তলিয়ে গেছে। টানাবোটের তিনটে আলোর তেলতেলে হলদে আলোর প্রতিবিম্ব কালো জলের বুকে ভাসছে আর

ডুবছে, অন্ধকারকে হারিয়ে দেবে সে ক্ষমতা তাদের নেই। মাথার ওপর থরে থরে কালো মেঘ—ঘন আর চট্‌চটে হয়ে ভেসে চলেছে কাদার স্রোতের মতো। ক্রমেই যেন হড়কে গড়িয়ে পড়ছি আমরা, গড়িয়ে পড়ছি আরো গভীরে, অন্ধকারের নিঃশব্দ অতলে।

গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে বলে হালের মাঝি:

'আমায় ওরা কোথায় নিয়ে চলল? আমার বুকটা যে চেপে ধরছে…'

একটা উদাসীন ভাব এসে পড়ে আমার। নির্বিকার, বিষণ্ণ আর শীতল একটা অবসাদের অনুভূতি। এখন ঘুম ছাড়া আর কিছুই চাই না।

ভোর হয় গুটি গুটি সাবধানে মেঘের বেড়া ঠেলে—সূর্যের আলোহীন ভোর, বিবর্ণ, নিস্তেজ, ধূসর রঙ বুলিয়ে দেয় নদীর জলে। নদীর পাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে—হলদে-হয়ে-আসা ঝোপঝাড়ের সারি, মরচে-ধরা লোহার মতো গুঁড়ি আর কালো-ডালওয়ালা পাইনগাছ, এক সারি গ্রাম্য কুটির, একজন চাষী দাঁড়িয়ে আছে পাথর-কুঁদে-তৈরি মূর্তির মতো। বাঁকা ডানায় শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে একটা গাঙচিল উড়ে যায় বজরার ওপর দিয়ে।

হালের মাঝির আর আমার এবার ছুটি হল। তেরপলে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। কিন্তু একটু বাদেই—অন্তত আমার মনে হল যেন একটু বাদেই—জোর চেঁচামেচি আর ভারি বুটের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তেরপলের তলা থেকে উঁকি মেরে দেখি তিনজন খালাসী কেবিনের দেয়ালের গায়ে মাঝিকে ঠেসে ধরেছে আর সবাই মিলে একসঙ্গে এলোমেলো চেঁচাচ্ছে।

'ছাড়ান দাও, পেত্রুখা।'

'ভগবান রক্ষে করুন—ঠিক হয়ে যাবে।'

'ও কাজ কোরো না।'

হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে দু-কাঁধের পেশী আঙুল দিয়ে টিপে ধরেছে মাঝি। এক পা দিয়ে পাটাতনের ওপর একটা বস্তা গোছের জিনিস চেপে রেখেছে। কোনো রকম বাধা দিল না সে—শুধু এক এক করে খালাসীদের প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর অনুনয় করে ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল:

'ছেড়ে দাও আমায়, পাপ থেকে সরে দূরে থাকি।'

লোকটার খালি পা, খালি মাথা, পরনে শুধু কামিজ আর পায়জামা। একবগ্‌গা, ঢিবির মতো কপালটার ওপর এক গোছা উস্‌কো-খুস্‌কো কালো চুল ঝুলে আছে। ইঁদুরের মতো ছোট ছোট লাল টক্‌টকে চোখজোড়া জটপাকানো চুলের গোছার তলা দিয়ে তাকিয়ে আছে, বিচলিত অনুনয়ের ভঙ্গিতে।

খালাসীরা বলল, 'ডুবে মরবে যে।'

'কে? আমি? কখ্‌খনো না! আমায় ছেড়ে দাও, ভাই। যদি না যেতে পারি তো ওকে খুনই করে বসব। যে মুহূর্তে সিম্‌বির্স্কে পৌঁছব সঙ্গে-সঙ্গে আমি…'

'ছেড়ে দাও ওসব।'

'আঃ, ভাই…'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাতদুটো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ও দু-পাশের দেয়ালে ঠেকাল। ক্রুশে টাঙানো মানুষের মতো দেখাচ্ছিল ওকে। তারপর ফের ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল:

'আমায় ছেড়ে দাও, পাপ থেকে দূরে থাকি।'

গলার স্বরটা অদ্ভুত রকমের গাঢ়, একটা মর্মবিদারী আবেদন আছে তাতে। ছড়ানো বাহুদুটো দেখাচ্ছে নৌকোর দাঁড়ের মতো লম্বা। হাত কাঁপছে তেলোদুটো সামনে বাড়িয়ে ধরে। জট-ধরা দাড়িতে-ঘেরা ওর চালুকপানা মুখখানাও কাঁপছে। ইঁদুরের মতো কানা চোখদুটো ছোট ছোট কালো ভাঁটার মতো বেরিয়ে আছে কোটরের ভেতর থেকে। মনে হচ্ছে যেন কোনো অদৃশ্য হাত ওর টুঁটি চেপে ধরেছে, গলা টিপে মারতে চেষ্টা করছে ওকে।

লোকগুলো নিঃশব্দে ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বেয়াড়া ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ও নিজের পুলিন্দাটা তুলে নিল।

বলল, 'ধন্যবাদ!'

ডেক পার হয়ে পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সে—এমন সহজ সাবলীলতা আমি ওর কাছে প্রত্যাশাই করতে পারিনি। আমিও দৌড়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই দেখি পেত্রুখা ভিজে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে পুলিন্দাখানা টুপির মতো মাথার ওপর রাখল, তারপর একটেরে রওনা হল বালুর চড়ার দিকে। নদীর পাড়ের ঝোপঝাড়গুলো তখন ওকে অভ্যর্থনা জানিয়েই বুঝি বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল আর জলে ছড়াচ্ছিল হলদে পাতা। খালাসীরা বলল:

'যাক্, শেষ অবধি তাহলে সামলে নিয়েছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা?'

'পাগল? মোটেই না। নিজের আত্মাকে বাঁচাচ্ছে…'

পেত্রুখা এবার অল্প জলের জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে। সেখানে এক মুহূর্ত বুক-জলে দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথার ওপর পুলিন্দাটা দোলাল।

খালাসীরা চেঁচিয়ে উঠল:

'বি-দা-য়!'

একজন জিজ্ঞেস করল:

'ছাড়পত্র নেই যে, কী করবে ও?'

ধনুকের মতো বাঁকা-পা আর লাল-মাথাওয়ালা একজন খালাসী বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলল:

'সিম্‌বির্স্কে ওর এক খুড়ো আছে, সে নাকি ওর যথাসর্বস্ব ঠকিয়ে কেড়ে নিয়েছে। তাই ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল খুড়োকে খুন করবে। তবে, নিজেকে বাঁচিয়ে পাপের হাত থেকে এবার রক্ষা পেয়ে গেল। লোকটা জানোয়ার বিশেষ, তবে মনটা খুব নরম। লোক ভালো…'

ভালো লোকটি ততক্ষণে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সরু বালুর চড়াটা পেরিয়ে যাচ্ছে, নদীর উজানমুখো। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

খালাসীরা দেখলাম বেশ চমৎকার লোক। আমার মতোই ওরা সবাই ভল্‌গা-পারের মানুষ। সন্ধ্যে হবার আগেই আমি ওদের সঙ্গে পুরোপুরি জমিয়ে বসলাম। পরদিন অবশ্য লক্ষ্য করলাম ওদের চাউনির মধ্যে একটা চটে-ওঠা সন্দিগ্ধ ভাব—সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করলাম বারিনভ নিশ্চয় জিভ সামলাতে পারেনি, ওদের কাছে যতোসব আজগুবি গল্প ফেঁদেছে।

'বক্‌বক্‌ করেছ বুঝি আবার?'

মাথা চুলকে অপ্রতিভভাবে চোখে একটু মেয়েলি ধরনের হাসি ফুটিয়ে ও বলেই ফেলল কথাটা:

'হ্যাঁ—তা একটু করেছি।'

'মুখ বুজে থাকতে বলিনি তোমাকে?'

'হ্যাঁ, মুখ বুজেই তো ছিলাম তবে—এমন চমৎকার গল্প এসে গেল। আমাদের ইচ্ছে ছিল তাস খেলার, এদিকে তাসজোড়া বেপাত্তা। মাঝির কাছে তাস। তাই বড়ো একঘেয়ে লাগতে লাগল। তখন শুরু করলাম গল্প…'

কয়েকটা প্রশ্ন করেই জানা গেল যে নিছক সময় কাটাবার জন্য বারিনভ একটা দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদে বসেছিল। গল্পের শেষ দিকে আমাকে আর খখলকে নাকি আদিকালের বীর বোম্বেটেদের মতো বানিয়েছে—কুড়ুল হাতে একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে আমরা নাকি যুদ্ধ করেছি।

ওর ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। ওর কাছে সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল বাস্তব জগতের বাইরে। মনে আছে একদিন কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে মাঠের একটা খানার ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম দু-জনে। দরদ আর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ও আমাকে বলেছিল:

'সত্য জিনিসটা হল তোমার নিজের কাছে, নিজের মনকে খুশি রাখবার জন্য নিজেকেই ওটা বেছে নিতে হবে। ওই দ্যাখ না: একদল ভেড়া ওই খানাটার ওধারে চরছে, একটা কুকুর আর একজন রাখালও রয়েছে সঙ্গে। বেশ। কিন্তু তাতে হল কী? তুমি আর আমি এর ভেতর থেকে এমন কী খুঁজে পাব যাতে মনটাকে খুশি রাখতে পারি? না বন্ধু, না। প্রত্যেকটা জিনিস যেমন অবস্থায় আছে তাকে সেইভাবেই দেখতে চেষ্টা কর। খারাপ মানুষ—হল সাচ্চা।

খালাসীরা চেঁচিয়ে উঠল:

'বি-দা-য়!'

একজন জিজ্ঞেস করল:

'ছাড়পত্র নেই যে, কী করবে ও?'

ধনুকের মতো বাঁকা-পা আর লাল-মাথাওয়ালা একজন খালাসী বেশ রসিয়ে রসিয়েই বলল:

'সিম্‌বির্স্কে ওর এক খুড়ো আছে, সে নাকি ওর যথাসর্বস্ব ঠকিয়ে কেড়ে নিয়েছে। তাই ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল খুড়োকে খুন করবে। তবে, নিজেকে বাঁচিয়ে পাপের হাত থেকে এবার রক্ষা পেয়ে গেল। লোকটা জানোয়ার বিশেষ, তবে মনটা খুব নরম। লোক ভালো…'

ভালো লোকটি ততক্ষণে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সরু বালুর চড়াটা পেরিয়ে যাচ্ছে, নদীর উজানমুখো। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

খালাসীরা দেখলাম বেশ চমৎকার লোক। আমার মতোই ওরা সবাই ভল্‌গা-পারের মানুষ। সন্ধ্যে হবার আগেই আমি ওদের সঙ্গে পুরোপুরি জমিয়ে বসলাম। পরদিন অবশ্য লক্ষ্য করলাম ওদের চাউনির মধ্যে একটা চটে-ওঠা সন্দিগ্ধ ভাব—সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করলাম বারিনভ নিশ্চয় জিভ সামলাতে পারেনি, ওদের কাছে যতোসব আজগুবি গল্প ফেঁদেছে।

'বক্‌বক্ করেছ বুঝি আবার?'

মাথা চুলকে অপ্রতিভভাবে চোখে একটু মেয়েলি ধরনের হাসি ফুটিয়ে ও বলেই ফেলল কথাটা:

'হ্যাঁ—তা একটু করেছি।'

'মুখ বুজে থাকতে বলিনি তোমাকে?'

'হ্যাঁ, মুখ বুজেই তো ছিলাম তবে—এমন চমৎকার গল্প এসে গেল। আমাদের ইচ্ছে ছিল তাস খেলার, এদিকে তাসজোড়া বেপাত্তা। মাঝির কাছে তাস। তাই বড়ো একঘেয়ে লাগতে লাগল। তখন শুরু করলাম গল্প...'

কয়েকটা প্রশ্ন করেই জানা গেল যে নিছক সময় কাটাবার জন্য বারিনভ একটা দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদে বসেছিল। গল্পের শেষ দিকে আমাকে আর খখলকে নাকি আদিকালের বীর বোম্বেটেদের মতো বানিয়েছে—কুড়ুল হাতে একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে আমরা নাকি যুদ্ধ করেছি।

ওর ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। ওর কাছে সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল বাস্তব জগতের বাইরে। মনে আছে একদিন কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে মাঠের একটা খানার ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম দু-জনে। দরদ আর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ও আমাকে বলেছিল:

'সত্য জিনিসটা হল তোমার নিজের কাছে, নিজের মনকে খুশি রাখবার জন্য নিজেকেই ওটা বেছে নিতে হবে। ওই দ্যাখ না: একদল ভেড়া ওই খানাটার ওধারে চরছে, একটা কুকুর আর একজন রাখালও রয়েছে সঙ্গে। বেশ। কিন্তু তাতে হল কী? তুমি আর আমি এর ভেতর থেকে এমন কী খুঁজে পাব যাতে মনটাকে খুশি রাখতে পারি? না বন্ধু, না। প্রত্যেকটা জিনিস যেমন অবস্থায় আছে তাকে সেইভাবেই দেখতে চেষ্টা কর। খারাপ মানুষ—হল সাচ্চা।

আর ভালো মানুষ! কোথায় তারা? ভালো মানুষদের এখনও সৃষ্টি হতে বাকি। এই হল ব্যাপার।'

সিম্‌বির্স্কে পৌঁছবার পর খালাসীরা আমাদের খুব বিশ্রী মেজাজ দেখিয়ে হুকুম করল বজরা ছেড়ে যেতে।

বলল, 'তোমাদের মতো লোকদের আমরা চাই না।'

নৌকোয় করে আমাদের ঘাটে পৌঁছে দিল ওরা। ডাঙায় খানিকক্ষণ বসে আমরা কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নিলাম। দু-জনের কাছে সবশুদ্ধু সাঁইত্রিশ কোপেক ছিল। একটা সরাইখানায় গিয়ে চা খেয়ে নিলাম।

'এবার কী করা যাবে?'

কোনোরকম ইতস্তত না করে বারিনভ পাল্টা জবাব দিল:

'কী করা যাবে? কেন, যেমন চলছিলাম তেমনি চলতে থাকব।'

লুকিয়ে ভাড়া 'ফাঁকি দিয়ে' একটা যাত্রীবাহী নৌকোয় চেপে সামারা পর্যন্ত গেলাম। সামারায় একটা বজরায় চাকরি নিয়ে সাতদিন পরে এলাম কাস্পীয় সাগরে। পথে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কাস্পীয় সাগরে কাজ পেলাম একটা ছোটখাটো মাছ-ধরা দলে—কাবান্‌কুল-বাইয়ের নোংরা কাল্‌মিক জেলেদের মাছ ধরার ঘাঁটিতে।

ম. গোর্কি

পৃথিবীর
পাঠ-
শালায়

ম. গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

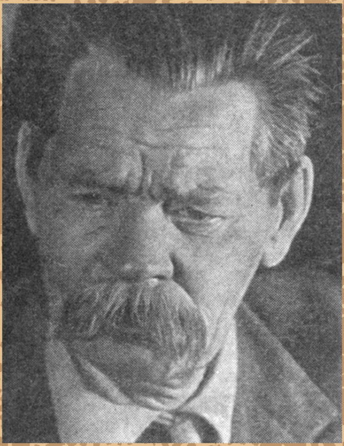

ম. গোর্কি

ম. গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

বইয়ের ঘটনাগুলি বহু আগের, গত শতকের শেষের। ১৮৮৪ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি, তখনো অখ্যাত এক ষোলো বছরের তরুণ আলেক্সেই পেশকভ, কাজানে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হবার আশায়। জার রাশিয়ায় ভলগা-তীরের এই গোলমালে ভরা মস্ত নগরটায় তাঁর কপালে ছিল হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। ছাত্রের বেঞ্চিতে বসার বদলে দারিদ্র্যের দুর্বিষহ ভাগ্য, বস্তির জীবন।

বইটিকে 'পৃথিবীর পাঠশালায়' আখ্যা দিয়ে লেখক তাঁর জীবনের দুরূহ পাঠের কথাই লিখেছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন কাজানের বিপ্লবী ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী চক্রের সঙ্গে পরিচয়ের কথা, শুনিয়েছেন জনগণের জীবন ঢেলে সাজার, তাদের সুখের জন্য সংগ্রামের অদম্য বাসনা কীভাবে সংহত হয়ে উঠল তার বিবরণ।

* * *

বইটি গোর্কির বিশ্ববিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসত্রয়ীর — 'আমার ছেলেবেলা' (১৯১৩-১৯১৪), 'পৃথিবীর পথে' (১৯১৪), 'পৃথিবীর পাঠশালায়' (১৯২৩) — শেষ খণ্ড।

এ খণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীর চার বছর পরে প্রকাশিত হয় এই তরুণ প্রতিভাবান লেখকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি 'মাকার চুদ্রা' গল্পটি। ঠিক এই সময় থেকেই লেখক আলেক্সেই পেশকভের সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'ম্যাক্সিম গোর্কি' বিশ্ব পাঠকের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) নতুন একটি সাহিত্যরীতির, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার জনক।

মাক্সিম গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

উপন্যাস

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: রথীন্দ্র সরকার
অঙ্গসজ্জা: ইউ. কপিলোভ

দ্বিতীয় সংস্করণ

М. ГОРЬКИЙ
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
ПОВЕСТЬ

На языке бенгали

তাহলে আমি কাজান শহরে চলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে — কম কথা নয়!

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকিয়েছিল নিকোলাই ইয়েভরেইনভ নামে ইস্কুলের এক ছাত্র। ইয়েভরেইনভকে দেখলেই ভাল লাগে, সে খুবই প্রিয়দর্শন তরুণ, মেয়েদের মতো কোমল তার চোখদুটো। আমার সঙ্গে একই বাড়ির চিলে-কোঠায় থেকেছে সে। প্রায়ই আমার বগলে এক-আধখানা বই দেখে দেখে আমার সম্পর্কে ওর এত আগ্রহ জন্মায় যে আলাপ-পরিচয়ও করে নেয়। তারপর দু-দিন না যেতেই সে আমায় উঠে-পড়ে বোঝাতে থাকে আমার মধ্যে নাকি 'অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনা' রয়েছে।

সজোর সুললিত ভঙ্গিতে মাথার লম্বা চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে সরিয়ে সে বলত, 'জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবার জন্যই প্রকৃতি তোমায় সৃষ্টি করেছে।'

খরগোশ হিসেবেও কেউ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সেবা করতে পারে সে-বোধ তখনও আমার জন্মায় নি, এদিকে ইয়েভরেইনভ কিন্তু আমায় জলের মতো সোজা করে বুঝিয়ে দিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি ঠিক আমার মতো ছেলেদেরই অভাব রয়েছে। পণ্ডিত মিখাইল লমনোসভের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটাও সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরল সে। ইয়েভরেইনভ বলল, কাজানে তার সঙ্গেই থেকে আমি শরৎ আর শীতের সময়টায় ইস্কুলের পাঠ একেবারে সড়গড় করে ফেলব, তারপর আমার 'দু-চারটে' পরীক্ষা দিতে হবে — 'দু-চারটে', কথাটা সে ওইভাবেই বলেছিল; বিশ্ববিদ্যালয় আমায় বৃত্তি দেবে; এবং বছর পাঁচেকের মধ্যেই আমি একজন 'বিদ্বান ব্যক্তি' হয়ে যাব। ব্যস্, জলবৎ তরলং। তা হবে না কেন, ইয়েভরেইনভের বয়েস ছিল উনিশ আর মনটাও ছিল দরাজ।

পরীক্ষায় পাশ করে ইয়েভরেইনভ চলে গেল। হপ্তা দুয়েক বাদে আমিও রওনা হলাম।

বিদায় নেবার সময় দিদিমা বলেছিলেন:

'লোকের সঙ্গে রাগারাগি করিস নে। সবসময়ই তো রাগারাগি করিস! গোঁয়ার হতে চলেছিস, আর বদমেজাজী। এগুলো পেয়েছিস তোর দাদুর কাছ থেকে। আর তোর দাদুকে দ্যাখ না, কী ছিল সে? এত বছর বেঁচে রইল, অথচ কোথায় গিয়ে শেষ হল বেচারি বুড়ো! একটা কথা কিন্তু মনে রাখিস: মানুষের পাপপুণ্যির বিচার ভগবানে করে না। ও হল শয়তানের লীলা। আচ্ছা, আয় তবে...'

তারপর ঝুলে-পড়া কাল্‌চে গালদুটোর ওপর থেকে এক-আধফোঁটা জল মুছে নিয়ে বললেন:

'আর তো দেখা হবে না। তুই এখন ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকবি, অস্থির মন তোর। আর আমি বসে ওপারের দিন গুণব।'

ইদানীং আমার আদরের দিদিমার কাছ থেকে একটু দূরে-দূরেই থাকতাম। খুব কম দেখা-সাক্ষাৎ হত, কিন্তু এখন যেন হঠাৎ একটা বেদনা অনুভব করলাম এই কথা ভেবে যে আমার এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না।

জাহাজের গলুই থেকে আমি ফিরে চেয়ে ছিলাম ঘাটসিঁড়ির কিনারায় যেখানে দিদিমা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইদিকে। ক্রুশচিহ্ন তিনি করছিলেন এবং পুরন জীর্ণ শালের খুঁটটা দিয়ে গাল আর কালো চোখদুটো মুছে নিচ্ছিলেন—তাঁর সে চোখজোড়া মানুষের প্রতি অনির্বাণ ভালোবাসায় উজ্জ্বল।

তারপর আমি এলাম এই আধা-তাতার শহরটায়, একটা ছোট্ট একতলা বাড়ির ছোট্ট কুঠরিতে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটা সরু গলির শেষপ্রান্তে একটা নিচু টিলার ওপর একলা দাঁড়িয়ে এই বাড়িটার এক দিকে খোলা জমি পড়ে রয়েছে, ঘন আগাছায় ভরা — একসময় এখানে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, দৃশ্যটা তারই সাক্ষ্য। সোমরাজ, আগ্‌রিমনি আর টক-পালঙের নিবিড় জঙ্গলের ভিতর এল্‌ডার-ঝোপে ঘেরা একটা ইঁটের পোড়োবাড়ি মাথা জাগিয়ে রয়েছে, ভগ্নস্তূপের নিচে একটা বড় খুপরি, তার মধ্যে রাস্তার কুকুরগুলো এসে আড্ডা গাড়ে, আর সেখানেই মরে। ওই খুপরিটার কথা আমার বেশ ভালোই মনে আছে: যত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পাঠ নিয়েছি তার মধ্যে ওই একটা।

মা আর দুই ছেলে নিয়ে ইয়েভরেইনভ পরিবার। যৎসামান্য পেনশনে ওরা দিন চালাত। এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনগুলি থেকেই আমি লক্ষ্য

করেছিলাম ছোটখাটো ক্লান্ত চেহারার বিধবা মানুষটি বাজার থেকে ফিরে কী করুণ অবসাদেই না সওদাগুলো রান্নাঘরের টেবিলের ওপর বিছিয়ে বসে মাথা ঘামাতেন কঠিন এক সমস্যা নিয়ে: ছোট কয়েক টুকরো রদ্দি মাংস থেকে কেমন করে তিনটি জোয়ান ছেলের উপযুক্ত ভালো খাবার তৈরি করা যেতে পারে — তাঁর নিজের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল!

খুব কম কথার মানুষ। খাটিয়ে ঘোড়ার সব শক্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলে যে বিনীত অথচ নৈরাশ্য-ভরা জিদ তাকে পেয়ে বসে তারই চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে বিধবাটির ধূসর চোখদুটোর মধ্যে। চড়াই পথে গাড়িটা আপ্রাণ টেনে নিয়ে চলে বেচারি ঘোড়া, অথচ জানে কোনোদিনই চূড়োয় গিয়ে সে পেঁছতে পারবে না, তবু বোঝাটা টেনেই চলে!

এখানে আসার তিন-চারদিন বাদে একদিন সকালে আমি রান্নাঘরে গিয়ে তাঁকে তরিতরকারি কুটতে সাহায্য করছিলাম। ছেলেরা তখনও ঘুমিয়ে। সাবধানে চাপা গলায় উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন:

'এ শহরে এসেছ কেন?'

'পড়তে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব।'

আস্তে আস্তে তাঁর ভুরুজোড়া উঁচু হয়ে কপালটার ফ্যাকাশে হলদে চামড়াটা কুঁচকে গেল। হাতের ছুরিটা পিছলে যেতেই আঙুলটা গেল কেটে। জখম জায়গাটা চুষতে চুষতে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'উঃ, হতচ্ছাড়া!..'

রুমাল দিয়ে আঙুলটা বেঁধে নেবার পর তারিফ করে বললেন:

'আলুর খোসা তো বেশ ভালোই ছাড়াতে পার।'

ও কাজটা ভালো পারতাম বলেই আমার ধারণা! জাহাজে কি কাজ করেছিলাম সে-কথা তাঁকে বললাম। উনি প্রশ্ন করলেন:

'বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পক্ষে ওটাকে যথেষ্ট প্রস্তুতি বলে মনে কর নাকি?'

সে সময়ে ঠাট্টা-তামাশা বোঝার মতো ক্ষমতা তেমন ছিল না আমার। ওঁর প্রশ্নটাকে আমি বেশ গম্ভীরভাবেই নিয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁকে বোঝালাম কোন কোন স্তর পর্যায়ক্রমে পার হবার পর বিদ্যার মন্দিরে আমি প্রবেশাধিকার পাব।

উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন:

'আ, নিকোলাই... নিকোলাই!'

ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে হাতমুখ ধুতে ঢুকল নিকোলাই — চোখে তার

একজন জিজ্ঞেস করল:

'ছাড়পত্র নেই যে, কী করবে ও?'

ধনুকের মতো বাঁকা-পা আর লাল-মাথাওয়ালা একজন খালাসী বেশ রসিয়ে রসিয়েই আমাকে বুঝিয়ে বলল:

'সিম্‌বির্স্কে ওর এক খুড়ো আছে, সে নাকি ওর যথাসর্বস্ব ঠকিয়ে কেড়ে নিয়েছে। তাই ও মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল খুড়োকে খুন করবে। তবে, নিজেকে বাঁচিয়ে পাপের হাত থেকে এবার রক্ষা পেয়ে গেল। লোকটা জানোয়ার বিশেষ, তবে মনটা খুব নরম। লোক ভালো...'

'ভালো লোক'টি ততক্ষণে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সরু বালুর চড়াটা পেরিয়ে যাচ্ছে, নদীর উজানমুখো। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

খালাসীরা দেখলাম বেশ চমৎকার লোক। আমার মতোই ওরা সবাই ভলগা-পারের মানুষ। সন্ধ্যে হবার আগেই আমি ওদের সঙ্গে পুরোপুরি জমিয়ে বসলাম। পরদিন অবশ্য লক্ষ্য করলাম ওদের চাউনির মধ্যে একটা রূঢ় সন্দিগ্ধ ভাব — সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করলাম বারিনভ নিশ্চয় জিভ সামলাতে পারে নি; স্বপ্নবিলাসীর জিভ ওদের কাছে যতোসব আজগুবি গল্প ফেঁদেছে।

'বকবক করেছ বুঝি আবার?'

মাথা চুলকে অপ্রতিভভাবে চোখে একটু মেয়েলি ধরনের হাসি ফুটিয়ে ও স্বীকারই করল:

'হ্যাঁ — তা একটু করেছি।'

'মুখ বুজে থাকতে বলি নি তোমাকে?'

'হ্যাঁ, মুখ বুজেই তো ছিলাম, তবে — এমন চমৎকার গল্প এসে গেল! আমাদের ইচ্ছে ছিল তাস খেলার, এদিকে তাসজোড়া বেপাত্তা। মাঝির কাছে তাস। তাই বড়ো একঘেয়ে লাগতে লাগল! তখন শুরু করলাম গল্প...'

কয়েকটা প্রশ্ন করেই জানা গেল যে নিছক সময় কাটাবার জন্য বারিনভ একটা দারুণ নাটকীয় গল্প ফেঁদে বসেছিল। গল্পের শেষ দিকে আমাকে আর খখলকে নাকি আদিকালের বীর বোম্বেটেদের মতো বানিয়েছে — কুড়ুল হাতে একদল গ্রামবাসীর সঙ্গে আমরা নাকি যুদ্ধ করেছি।

ওর ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। ওর কাছে সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে কেবল বাস্তব জগতের বাইরে। মনে আছে একদিন কাজের খোঁজে ঘুরে ঘুরে

মাঠের একটা খানার ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম দু-জনে। দরদ আর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ও আমাকে বলেছিল:

'সত্য জিনিসটা হল তোমার নিজের কাছে, নিজের মনকে খুশি রাখবার জন্য নিজেকেই ওটা বেছে নিতে হবে। ওই দেখো না: একপাল ভেড়া ওই খানাটার ওধারে চরছে, একটা কুকুর আর একজন রাখালও রয়েছে সঙ্গে। বেশ! কিন্তু তাতে হল কী? তুমি কিংবা আমি এর ভেতর থেকে এমন কী খুঁজে পাব যাতে মনটাকে খুশি রাখতে পারি? না বন্ধু, না। প্রত্যেকটা জিনিস যেমন অবস্থায় আছে তাকে সেইভাবেই দেখতে চেষ্টা কর। খারাপ মানুষ — হল সাচ্চা। আর ভালো মানুষ! কোথায় তারা? ভালো মানুষদের এখনও সৃষ্টি হতে বাকি! এই হল ব্যাপার!'

সিম্‌বির্স্কে পেঁছিবার পর খালাসীরা আমাদের খুব বিশ্রী মেজাজ দেখিয়ে হুকুম করল বজরা ছেড়ে যেতে।

বলল, 'তোমাদের মতো লোকদের আমরা চাই না।'

নৌকোয় করে আমাদের ঘাটে পেঁছে দিল ওরা। ডাঙায় খানিকক্ষণ বসে আমরা কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নিলাম। দু-জনের কাছে সবশুদ্ধু সাঁইত্রিশ কোপেক ছিল। একটা সরাইখানায় গিয়ে চা খেয়ে নিলাম।

'এবার কী করা যাবে?'

কোনোরকম ইতস্তত না করে বারিনভ পাল্টা জবাব দিল:

'কী করা যাবে? কেন, যেমন চলছিলাম তেমনি চলতে থাকব!'

লুকিয়ে ভাড়া 'ফাঁকি দিয়ে' একটা যাত্রীবাহী নৌকোয় চেপে সামারা পর্যন্ত গেলাম। সামারায় একটা বজরায় চাকরি নিয়ে সাত দিন পরে এলাম কাস্পীয় সাগরের কূলে। পথে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। সেখানে কাজ পেলাম একটা ছোটখাটো মাছ-ধরা দলে — কাবানকুল-বাইয়ের নোংরা কাল্‌মিক জেলেদের মাছ ধরার ঘাঁটিতে।

১৯২৩

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। আপনাদের পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

М. Горький

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Повесть

На языке бенгали

ম. গোর্কি

মাক্সিম গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

মাক্সিম গোর্কি · পৃথিবীর পাঠশালায়

মাক্সিম গোর্কি

পৃথিবীর পাঠশালায়

উপন্যাস

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: রথীন্দ্র সরকার
সম্পাদনা: অরুণ সোম
অঙ্গসজ্জা: ইয়া. মালিকভ

М. Горький

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

на языке бенгали

Maxim Gorky

MY UNIVERSITIES

In Bengali

তৃতীয় সংস্করণ

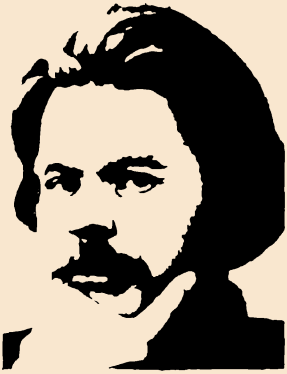

সোভিয়েত চিরায়ত সাহিত্যের লেখক মাক্সিম গোর্কি'র (১৮৬৮-১৯৩৬) ‘পৃথিবীর পাঠশালায়’ তাঁর ‘আমার ছেলেবেলা’ ও ‘পৃথিবীর পথে’ দিয়ে শুরু আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসত্রয়ীর শেষ অংশ।

এই উপন্যাসে পাঠক ভাবী সাহিত্যিক মাক্সিম গোর্কি'র জীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহের পরিচয় পাবেন।

ষোল বছরের কিশোর আলিওশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার আশায় কাজান শহরে এলো। কিন্তু এখানে, ভল্গাতীরে জারশাসিত রাশিয়ার কোলাহলমুখর এই বিশাল শহরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কেবল কারিগরের কঠিন শ্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের বদলে — দীনদুঃখীর জীবন, বস্তিবাসীর জীবন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাবী লেখক এখানেই পরিচিত হলেন কাজানের প্রাথমিক পর্বের বিপ্লবঘেঁষা বুদ্ধিজীবীচক্রগুলির সঙ্গে, দেশের জনগণের জীবন নতুন করে গড়ে তোলার, তাদের কল্যাণের জন্য সংগ্রামের বাসনা তাঁর মধ্যে জন্ম নিল, দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করল তাঁর অন্তঃকরণে।

‘রাদুগা’ প্রকাশন
মস্কো